শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের

কথা প্রসঙ্গ

প্রথম খণ্ড

শ্রুতি লেখন
শ্রীমতী সরলাবালা মিত্র

বঙ্গানুবাদ
শ্রী শ্রীবাস চন্দ্র দত্ত

প্রকাশক :
প্রেম প্রবাহ প্রকাশন
প্রেম মন্দির আশ্রম
রিষড়া, হুগলী - ৭১২ ২৪৮
দূরভাষ- (০৩৩) ২৬৭২ ২১২১

প্রথম সংস্করণ :
পৌষ শুক্লা চতুর্দ্দশী, ১লা মাঘ ১৪২০

মুদ্রণ :
ক্রিয়েশন
২৬/এ, এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কোন্নগর, হুগলী

© গ্রন্থসত্ত্ব ঃ
প্রেম মন্দির আশ্রম

বিনিময় : ৬০ টাকা

বিষয় বিন্যাস

• প্রথম পর্ব	ঃ	ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তার প্রমাণ, সুষুপ্তি ও সমাধির মধ্যে তারতম্য, ঈশ্বর কল্পবৃক্ষ, সৎসঙ্গের প্রভাব।	৯
• দ্বিতীয় পর্ব	ঃ	সাধু সজ্জনদের নিন্দায় লাভবান হয় কে?	২২
• তৃতীয় পর্ব	ঃ	দান কর আর নাম কর, ডায়েরী লিখ্ দেও, মুক্তিলাভের জন্য চাই বিচার।	২৪
• চতুর্থ পর্ব	ঃ	দাতা বড় না গ্রহীতা, কর্মফল, আত্মার অবস্থা।	২৯
• পঞ্চম পর্ব	ঃ	মুক্তি ও তার প্রকারভেদ, গুরুই মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন।	৩৫
• ষষ্ঠ পর্ব	ঃ	ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ, ঈশ্বর জীব অভেদ।	৩৯
• সপ্তম পর্ব	ঃ	প্রকৃত শিষ্য কে? প্রকৃত গুরুকে? রাজা ও মহারাজা-এ দু'এর পার্থক্য।	৪৪
• অষ্টম পর্ব	ঃ	জীবনের যা কিছু চাওয়া ও কাজকর্ম ঈশ্বরকেন্দ্রিক হওয়া দরকার।	৫০
• নবম পর্ব	ঃ	সব সাধনার মূলে শরীরের সাধন।	৫২
• দশম পর্ব	ঃ	মনুষ্যজীবনই শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর আছেন অন্তরে, চঞ্চল মনকে স্থির করার উপায়।	৫৭
• একাদশ পর্ব	ঃ	তিনটি পথ — জ্ঞান ভক্তি কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় প্রেম-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব।	৬৩

• দ্বাদশ পর্ব ঃ ম্যানেজার হয়ে যাও মালিক হলো না, আনন্দ ও পুরুষকার, চার রকম সাধক, তিন প্রকার কৃপা। ৭৫

• ত্রয়োদশ পর্ব ঃ মূর্তিপুজোর যৌক্তিকতা, ভক্তি কিভাবে লাভ করা যায়? ৮৬

• চতুর্দ্দশ পর্ব ঃ তাল্‌মে ভঙ্গ্‌ না পায়, সৎসঙ্গ ও সাধুসঙ্গের ফল, দয়া ধর্মের মূল, অভিমান নরকের মূল। ৯৩

• পঞ্চদশ পর্ব ঃ বদ্ধ কে ও মুক্ত কে? জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য, ত্রিতাপ জ্বালায় তাপিত নয় কে? ভক্তি তত্ত্ব বড় মিষ্টি। ১০১

• ষোড়শ পর্ব ঃ চিত্ত ও মনের তফাৎ, অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়া। ১০৭

• সপ্তদশ পর্ব ঃ সর্বশাস্ত্রের সার স্বরোদয় শাস্ত্র, ন'টি গোপনীয় বিষয়, উত্তম অধিকারী হলে বস্তু লাভ হয়। ১০৯

• অষ্টাদশ পর্ব ঃ সংস্কার বড় না সঙ্গ বড়, ক্ষুদ্র স্রোত মহৎ স্রোতে মেলাও। ১১৯

• ঊনবিশং পর্ব ঃ যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে, ধর্মের গতি সূক্ষ্ম। ১২৯

• বিংশ পর্ব ঃ জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি এই তিনটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি? ১৩৮

• একবিংশ পর্ব ঃ অদ্বৈতে মিষ্টতা নেই মিষ্টতা আছে দ্বৈতে, দ্বৈতবাদ সিদ্ধ করা সহজ। ১৪১

• দ্বাবিংশ পর্ব ঃ তীব্র মুক্তির আকাংক্ষা জাগলে সদ্‌গুরুর দর্শন মেলে, সাধারণ মানুষ বন্ধনেই সুখ পায়—তা ভ্রান্ত। ১৪৬

• ত্রয়োবিংশতি পর্ব ঃ কে বড় প্রারব্ধ না পুরুষকার? ১৪৯

ভূমিকা

ধর্মজীবন যাপন ও অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে শাস্ত্রবাক্য ও আপ্তবাক্য প্রামাণিক হিসাবে গৃহীত হয়। শাস্ত্রবাক্য হল বেদ, উপনিষদ্ বা গীতাদি গ্রন্থ এবং আপ্তবাক্য হল ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণের উপদেশাবলী। গীতামুখে তাই শ্রীভগবান বলেছেন—কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ 'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্য ব্যবস্থিতৌ' (গীতা ১৩/২৪)। শাস্ত্রবাক্য ও আপ্তবাক্যকে সমান মর্যাদাই দেওয়া হয়। ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণ যা উপদেশ করেন সেগুলি অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত হয়। কারণ, সাধনালব্ধ উপলব্ধি এবং ধ্রুবাস্মৃতি থেকে তাঁদের বাণী বা উপদেশগুলি নিসৃত হয়।

পূজ্য বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ মাত্র ন'বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। বালক বয়স থেকে পৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত নর্মদার তীরে এবং হিমালয়ে যেমন কঠোর তপস্যায় মগ্ন থেকেছেন তেমনি আবার হিমালয় থেকে রামেশ্বরম পর্য্যন্ত আসমুদ্রহিমাচল পদব্রজে পরিভ্রমণ করেছেন। প্রায় ৬৫ বছর বয়সে তিনি স্থায়ীভাবে দেওঘরের বৈদ্যনাথ ধামে সচল বৈদ্যনাথরূপে অবস্থান করেন। সেই সময় শিষ্যভক্তদের সঙ্গে নানা প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে যেসব উপদেশ প্রদান করেছিলেন সেগুলিই তাঁর শিষ্যা সরলাবালা দেবী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তিকালে, সেই লিপিবদ্ধ অমূল্য সম্পদ 'শ্রী বালানন্দ কথা প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় দেওঘর শ্রী বালানন্দ আশ্রম থেকে। শ্রী বালানন্দ মহারাজের উপদেশগুলি বাংলা হরফেও হিন্দিভাষায় লিপিবদ্ধ করা আছে মূল 'শ্রী বালানন্দ কথা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। তার ফলে বাংলা ভাষাভাষী ভক্তগণের কাছে গ্রন্থটি প্রায় অধরা রয়ে গেছে। বাংলাভাষী ভক্তদের কল্যাণার্থে উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক এবং আমার গুরুভ্রাতা শ্রী শ্রীবাস চন্দ্র দত্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রেম মন্দির আশ্রম থেকে প্রকাশিত 'প্রেম প্রবাহ' পত্রিকায় বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে গ্রন্থটি প্রকাশ করছেন। বাংলাভাষী ভক্ত শিষ্যদের বিশেষ আগ্রহে 'শ্রী বালানন্দ কথা প্রসঙ্গ' গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডটি পরবর্তিকালে প্রকাশিত হবে। শ্রী বালানন্দ মহারাজের উপদেশের বৈশিষ্ট্য হল – তিনি সহজ সরল ভাষায় বিভিন্ন উদাহরণ এবং গল্পের মাধ্যমে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, স্বরোদয় শাস্ত্র প্রভৃতি এবং জীবনের বহু সমস্যার যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক সমাধান করে দিয়েছেন। তার মধ্যে যেমন অনেক স্থানে সংস্কৃত শ্লোক আছে তেমনি আছে তুলসী দাস, কবীরদাস প্রভৃতির

মধুর হিন্দি দোহা। গ্রন্থটি পড়লে পাঠকের মনে হবে – তিনি যেন বালানন্দ মহারাজের সামনে বসেই সৎসঙ্গ করছেন।

ভাবতে অবাক লাগে, যিনি ন'বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে তপস্যায় রত হয়েছেন, যাঁর তথাকথিত শিক্ষা বলতে কিছুই ছিল না তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে কি করে শাস্ত্রের গভীর তত্ত্বের এখন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা উৎসারিত হতো।

জ্ঞান শ্রেষ্ঠ না ভক্তি শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে বিচার চলে আসছে আবহমান কাল থেকে। এ বিষয়ে ভক্তদের ধারণা পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য যখন জ্ঞান ও ভক্তি নিয়ে আলোচনা চলতো তখন তিনি আলোচনাকে সরস ও যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য কখনও জ্ঞানের পক্ষ নিতেন আবার কখনও নিতেন ভক্তির পক্ষ। পরে বুঝিয়ে দিতেন – 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। আবার যখন রাজযোগ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তখন বালানন্দ মহারাজ 'পাতঞ্জল যোগদর্শন' থেকে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি – এই অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয় সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যখন বেদান্ত দর্শন নিয়ে আলোচনা হয়েছে তখন মহারাজজী সহজ সরল উদাহরণ দিয়ে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ কাকে বলে এবং স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরই বা কাকে বলে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। আর আশ্চর্যের বিষয় হল – দর্শন শাস্ত্রের এই সব কঠিন তত্ত্বের ওপর আলোচনা হয়েছে পণ্ডিত তারামোহন শাস্ত্রী বা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডঃ নলিনী নাথ ব্রহ্ম প্রভৃতি বিদগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে। তাঁরা মহারাজের পাণ্ডিত্য ও কঠিন বিষয়কে সহজভাবে বোঝাবার পদ্ধতি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন।

'শ্রী বালানন্দ কথা প্রসঙ্গ' গ্রন্থটি সকলের কাছে সমাদৃত হলে অনুবাদকের পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে হয়।

শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

তারিখ – ০১/০১/২০১৪

অনুবাদকের নিবেদন

দেওঘরের সচল বৈদ্যনাথ ও ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মা মদীয় পরম গুরুদেব পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ জীবন-সায়াহ্নে পরিব্রাজন ব্রত স্থগিত রেখে প্রথমে দেওঘরের তপোবন পাহাড়ে এবং পরবর্তী কালে করণীবাদ আশ্রমে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। সে সময়ে তিনি অগণিত ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে সৎ-প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্য দিয়ে যেসব অমৃতময় উপদেশাবলী, বাণী ও তত্ত্বকথা পরিবেশন করেছিলেন, তাঁরই কৃপাধন্য শিষ্যা অল্প শিক্ষিতা গুরু গতপ্রাণা ভক্তিমতী প্রয়াতা সরলাবালা মিত্র গুরুকৃপা বলে গুরুমহারাজের সেই সব উপদেশবলী, সৎ প্রসঙ্গ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে 'শ্রীবালানন্দ কথা-প্রসঙ্গ' নামে একটি গ্রন্থ তিন খণ্ডে প্রকাশ করে গেছেন। এটি ভক্ত সমাজে খুবই সমাদৃত হয়েছে। শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ উপদেশ দিতেন সরল হিন্দিতে। শ্রীমতী সরলাবালা মিত্র তাঁর শ্রীগুরু মহারাজের মুখের সৎ কথাগুলি বাংলা হরফ ও হিন্দি ভাষায় অবিকল বজায় রেখেছেন তাঁর 'শ্রীবালানন্দ কথা-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। গ্রন্থটি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করে আমি মুগ্ধ হই এবং অনুপ্রেরণা লাভ করি। তাই বাংলা ভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে সহজ সরল বাংলায় উক্ত গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ করতে শুভ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছি। মূল গ্রন্থটির ভাব যাতে বজায় থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছি। 'শ্রীবালানন্দ কথা প্রসঙ্গে'র এই বঙ্গানুবাদ বইটি অধ্যাত্মরসপিপাসু ভক্তজনের কাছে সমাদর লাভ করলে আমার শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি। আপাতত মূল গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হল।

'কথা-প্রসঙ্গে'র এই বঙ্গানুবাদ গ্রন্থটির রচনার ব্যাপারে প্রথম থেকেই অপরিমেয় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন মদীয় জ্যৈষ্ঠ গুরুভ্রাতা রিষড়াস্থিত প্রেম মন্দির আশ্রমের অধ্যক্ষ সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। তাঁর সর্বতোভাবে সক্রিয় সহযোগিতা ও অমূল্য উপদেশ ব্যতীত গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

গ্রন্থটির প্রুফ দেখে সহায়তা করেছেন আশ্রমের একনিষ্ঠ সেবক শ্রী অমরেশ মালিক। এঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কোন্নগরস্থিত 'ত্রিনেশন' প্রেসের কর্ণধার শ্রী অঞ্জন মণ্ডল ও প্রেসের কর্মী শ্রী কুন্তল দাশগুপ্ত ছাপার ব্যাপারে ঐকান্তিক সহযোগিতা করেছেন। নতুবা এ গ্রন্থ এত শীঘ্র প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। এঁদের উপর শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আশীর্বাদ বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা।

তারিখ ঃ ০১/০১/২০১৪ শ্রী শ্রীবাস চন্দ্র দত্ত

শ্রীবালানন্দ কথা প্রসঙ্গ

প্রথম পর্ব

স্থান ঃ তপোবন পাহাড় (দেওঘর)
১৩২০ বঙ্গাব্দ বৈশাখ মাস
সময় ঃ প্রাতঃ কাল
সরলাবালা মিত্রের পূজনীয় পিতৃদেব শরৎচন্দ্র সিংহ
ও
শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও তার প্রমাণ ঃ কাশী থেকে আগত এক অহংকারী পণ্ডিত, প্রকৃত পণ্ডিত কে ঃ ঈশ্বর কেমন বস্তু ঃ মোক্ষ বা মুক্তির আস্বাদ কেমন ঃ সুষুপ্তি ও সমাধির মধ্যে তারতম্য ঃ ঈশ্বর কল্পবৃক্ষ ঃ ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, তিনি বহুরূপী ঃ সৎসঙ্গের প্রভাব ঃ মধুর বাক্য ও বাক্য প্রয়োগের কৌশল]

পিতা ঃ মহারাজ, নাস্তিকরা বলে থাকে "ঈশ্বর নাস্তি" অর্থাৎ ঈশ্বর বলে কিছু নেই, আর আস্তিকরা বলে — "ঈশ্বর অস্তি" অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন। তাহলে ঈশ্বর যে আছেন তা কী উপায়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই সিংগী, তুমিই বল — বিশ্বজগতে যা কিছু কার্য দেখা যাচ্ছে তার কারণ নিশ্চয় আছে, তা নয় কী? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এই যে এত সব সৃষ্টি দেখে আসছি, এসব দেখে বুঝতে পারা যায় যে, নিশ্চয় কেউ এগুলি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তা কেউ না কেউ আছেন, তাই তো?

পিতা ঃ মহারাজ, সৃষ্টিকর্তার কার্য তো দেখে আসছি, কিন্তু সৃষ্টিকর্তাকে তো কখনও দেখিনি। যে বস্তু চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি না তার অস্তিত্ব স্বীকার করি কী করে?

শ্রীশ্রী গুরু ঃ ভাই, তুমি বৃটিশ রাজের নাম শুনে আসছ। তুমি তো তাকে দেখনি, তাহলে তার অস্তিত্ব স্বীকার করছ কেন?

পিতা ঃ মহারাজ, বৃটিশ রাজকে আমি দেখিনি ঠিকই, তবে যে সব ব্যক্তি তাকে দেখেছে, তারা বৃটিশ রাজের কথা বলাবলি করছে। তাছাড়া বই ও খবরের কাগজ পড়েও বৃটিশরাজ সম্পর্কে নানা কথা জানতে পারা যাচ্ছে।

শ্রীগুরু ঃ ঈশ্বর সম্পর্কেও ঋষিগণ শাস্ত্রে নানান বিষয় বর্ণনা করে গেছেন।

যেমন, তিনি কোথায় থাকেন, কেমন তাঁর রূপ, কী কী নামে তিনি পরিচিত ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে গেছেন। তাহলে তুমি ঈশ্বরকে কেন স্বীকার করছ না? কোথায় ইংরেজ রাজ বিলেতে রয়েছে তা তুমি স্বীকার করে নিচ্ছ, আর ঈশ্বর তোমার খুব কাছে রয়েছেন, তাঁকে তুমি কেন স্বীকার করবে না? কোথায় রাজা বিলেতে বসে আছেন, এখানে(ভারতে) তাঁর রাজত্ব সুচারুরূপে চলছে। দুনিয়ার সব রাজারই একই রকমের হালচাল। রাজার রাজত্ব কেমন সুন্দরভাবে চলছে তা দেখেই রাজার অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়। দেখ ভাই, সব বস্তু প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না। কোন কোন বস্তু অনুভবসিদ্ধ। সব বস্তু চাক্ষুষ দেখে তবেই তার অস্তিত্ব মেনে নেবে তা ঠিক নয়। এক টুকরো মিছরি জলে ফেলে দিলে কিছুক্ষণ পর তা আর দেখা যায় না। তখন ওই জল একটু মুখে দিলে মিছরির অস্তিত্ব অনুভব হয়। মিছরির ডেলাটি জলে দেখা যায় না। তখন ওই জল একটু মুখে দিলে মিছরির অস্তিত্ব অনুভব হয়। মিছরির ডেলাটি জলে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু মিছরি এই জলেই আছে। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ঈশ্বরকে বিচার বিবেক বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করতে হয়। দেখ, ঘড়া দেখলেই বুঝে নিতে হবে কুমোরও আছে। তা না হলে ঘড়া কে নির্মাণ করল? কার্য দেখলেই বোঝা যায় যে এর কোন কর্তা আছে । ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি স্বীকার না কর তাহলে এই সংসার রচনা করল কে? তুমি বলবে সৃষ্টি আছে, সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ নেই। এই সংসার হল স্বভাবজাত, প্রাকৃতিক নিয়মেই উৎপন্ন হয়েছে। তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মকেই ঈশ্বর বলে মেনে নাও। এতে কোন ক্ষতি নেই। দেখ সিংগী, তুমি তোমার পিতাকে নিজে চোখে দেখনি। ছবি দেখিয়ে মা-ই তোমাকে বলে দিয়েছেন— ইনিই তোমার পিতা। মায়ের কথায় বিশ্বাস করেই ছবিতে যিনি রয়েছেন তাকে তুমি পিতা বলে মেনে নিচ্ছ। এখন তুমি যদি মাকে বল মা, আমি তো বাবাকে চাক্ষুষ দেখিনি তাহলে কেন তাঁকে পিতা বলে স্বীকার করব? একথা শুনে সংসারে যাঁরা বসবাস করছেন তাঁরা সবাই তোমাকে দেখে বলবে যে তুমি নিশ্চয় একজন পাগল। মায়ের কথায় বিশ্বাস করেই ছবিতে দেখানো ব্যক্তিকে নিজ পিতা বলতেই হবে। জগৎ-পিতা ঈশ্বরও ঠিক এরকম। এখানে গুরুই মাতা। গুরু বলে দিয়েছেন— এটি হল রামমূর্তি, এটি কৃষ্ণমূর্তি অথবা এটি হল শঙ্কর মূর্তি, তোমার জগৎপিতা হল ঈশ্বর — গুরুদেবের এসব কথা মানতে হবে। ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ জ্ঞাননেত্রে বা ভাবনেত্রে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছেন। তুমি এই চক্ষু ইন্দ্রিয় দিয়ে ঈশ্বরকে দেখতে

পাবে না। আগে তোমায় এই চক্ষু বন্ধ করতে হবে। তারপর তোমার যে তৃতীয় চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞাননেত্র বা ভাবনেত্র আছে তা উন্মীলন করতে হবে। তবেই তুমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হবে। গীতাতেও ভগবানের এরকমই কথা আছে ঃ-

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।। গী ১১/৮

অর্থাৎ হে অর্জুন, তুমি নিজের স্থূল চক্ষু দ্বারা আমার বিশ্বরূপ দর্শন করতে সমর্থ হবে না। এজন্য আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি। তা দিয়ে তুমি আমার অসামান্য অঘটনঘটনসামর্থরূপ যোগশক্তি দর্শন কর।

এরূপ সৎসঙ্গ যখন চলছিল, এমন সময় খবর এল যে কাশীধাম থেকে এক পণ্ডিত এসেছেন এবং তিনি বলছেন, "আমি স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করব"। পণ্ডিতজী আসছেন শুনে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ সৎসঙ্গ বন্ধ করে দিয়ে সাংসারিক একথা সেকথা বলতে লাগলেন। আর একটি রূপোর গেলাস বের করে তাতে জল খেতে লাগলেন। পণ্ডিত সেখানে এসে দূরে দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ গুরুমহারাজকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। তারপর মহারাজজীর সঙ্গে কোন কথাবার্তা না বলে এমনকি তাঁকে প্রণাম না করেই চলে গেলেন।

এতক্ষণ এসব দেখে পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন –

পিতা ঃ মহারাজ, আপনি সাধারণত কমণ্ডুলে জলপান করে থাকেন। এই পণ্ডিত আসছে শুনে রূপোর গেলাস বের করে তা দিয়ে জল পান করলেন। আর এতক্ষণ যে সৎসঙ্গ চলছিল তা বন্ধ করে দিয়ে আপনি সাংসারিক প্রসঙ্গে চলে গেলেন। এর কারণ কি মহারাজ? আমার খুব ধোঁয়াশা লাগছে। আপনার এরূপ আচরণের তাৎপর্য আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রী গুরু ঃ ভাই সিংগী, আমি তোমাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প বলছি। গল্পটি শুনলে তোমার ধোঁয়াশা দূর হয়ে যাবে। গল্পটি হল- এক জঙ্গলে দুজন সাধু সাধন ভজন করতো। তারা অন্য কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলতো না। তবে কোন মুমুক্ষু ব্যক্তি এসে পড়লে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলত। ধনী ব্যক্তি এলে তারা একেবারে চুপ হয়ে যেত। একদিন ওই দুজন সাধু সাধন ভজন শেষ হলে দুজনে মিলে ঈশ্বর - প্রসঙ্গ আলোচনা করতে লাগল। এমন সময় তারা দেখল – প্রচুর সাজ - সরঞ্জাম নিয়ে এক রাজা সাধু দর্শন করতে আসছেন। দূর থেকেই রাজাকে দেখে তাদের মনে

হল এই রাজা বড়ই তমোগুণ সম্পন্ন আর খুবই অহংকারী। ইনি মোটেই মুমুক্ষু নন। তাহলে ওনার সাথে কথাবার্তা বলে কেন অমূল্য সময় নষ্ট করব? একথা মনে হতেই তারা ভাবতে লাগল, এই রাজাকে কী করে ভাগিয়ে দেয়া যায়। রাজা একটু দূরে থাকতেই সাধু দুজন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দিল। একজন সাধু চেঁচিয়ে অন্যজনকে বলতে লাগল - তুমি তো অনেক ভাত খেয়ে নিয়েছ, আমার ভাগে কম পড়েছে। অন্যজন বলল - তুমি আমাকে কম ভাত দিয়ে নিজে বেশি ভাত খেয়েছ। এভাবে তারা দুজনে পরস্পর ঝগড়া করতে লাগল। রাজা দেখলেন - আরে, আমি এত কষ্ট করে সাধু দর্শন করতে এলাম। এরা কীরকম সাধু? সাধু নয়, এরা পেটুক। এদের কী দর্শন করব? তাই রাজা দূর থেকেই বিদায় নিল। রাজা চলে যেতেই দুই সাধু হাসাহাসি করতে লাগল। এরপর আবার তারা ঈশ্বর প্রসঙ্গ আলোচনা করতে লাগল।

দেখ ভাই সিংগী, কাশীধাম থেকে যে পণ্ডিত একটু আগে এখানে এসেছিল উনি তো প্রকৃত পণ্ডিত নন। তিনি অনেক শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন, কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম ওনার ভিতরে প্রবেশ করেনি, তাই অন্তরটা অন্ধকারে ভরা। ওই পণ্ডিতের সৎসঙ্গ করার কোন ইচ্ছাই ছিল না। তাঁর মনে এই ছিল যে, এই মহারাজকে (নিজেকে দেখিয়ে) তর্কে পরাস্ত করে আচ্ছা করে অপমান করব। এই পণ্ডিত বড়ই অহঙ্কারী আর উদ্ধত। এর সাথে কথা বলে বৃথা সময় অপব্যয় করা ঠিক নয়। আমার হাতে রূপোর গেলাস দেখে পণ্ডিতের মনে হয়েছে ইনি ব্রহ্মচারী নন, ইনি একজন ভোগী সাধু, এঁর সঙ্গে কী কথাবার্তা বলবো? তাই পণ্ডিত দূর থেকেই চলে গেল। এতে আমার শান্তি হল। না হলে ওই পণ্ডিত বহু সময় নষ্ট করে দিত। দেখ, ওই ব্যক্তি প্রকৃত পণ্ডিত হলে সে বিনয়ী হতো, কখনও উদ্ধত হতো না।

"নমন্তি সফলাবৃক্ষাঃ নমন্তি সজ্জনাজনাঃ।
শুষ্কং কাষ্ঠঞ্চ মুর্খাশ্চ ন নমন্তি কদাচন।।"

অর্থাৎ যে বৃক্ষে ফল হয় সেই বৃক্ষের ডালপালা ফলভারে আর ঊর্দ্ধমুখী হয় না। বৃক্ষ তখন অধোমুখী হয় এবং নম্র হয়ে যায়। বৃক্ষে যদি ফলন না হয়, তাহলে তার ডালপালা ঊর্দ্ধমুখী হয় এবং উদ্ধত হয়ে যায়। তেমনি কোন মানুষের মধ্যে যখন সৎভাব বা সত্ত্বভাব জাগ্রত হয় তখন ওই সজ্জন মানুষ নম্র বিনয়ী হয়ে যায়। শুকনো কাঠ কখনও নম্র হয় না, তেমনি মূর্খ ব্যক্তিও কখনও নম্র হয় না। প্রকৃত পণ্ডিত যিনি

নম্র, তিনি নম্র হয়ে যান। দেখ ভাই সিংগী, এই যে পণ্ডিত যিনি এখানে এসে আপনা থেকেই চলে গেলেন, তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে কোন লাভ নেই। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ - কেন এই পণ্ডিত এখানে এলে আমি রূপোর গেলাস বের করেছি? ওহে সিংগী, এখন তুমি বলতো, আমাদের কী বিষয় নিয়ে সৎসঙ্গ চলছিল?

পিতা ঃ ঈশ্বর আছেন, কী নেই? ঈশ্বরকে পেলে মানুষের কী লাভ?

শ্রীগুরু ঃ দেখ ভাই, কোন এক জায়গায় পাঁচ-সাতটি মেয়ে হাসি-ঠাট্টা গল্পগুজব করছিল। পরম বন্ধু তারা। কিছুদিন পূর্বে এদের মধ্যে একজন মেয়ের বিয়ে হয়েছে। তাই তাকে অন্যান্য বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "হ্যাঁরে ভাই, স্বামী কেমন জিনিস বল্‌না?" সদ্য বিবাহিতা মেয়েটি ওদের কথা শুনে হাসতে লাগল, তারপর বলল, "স্বামী কেমন জিনিস তা আমি মুখে বলে বোঝাতে পারব না ভাই। তোদের যখন বিয়ে হয়ে যাবে তখন তোরাও বুঝবি স্বামী কী জিনিস।" ঠিক তেমনি, জগৎ - স্বামী ঈশ্বরকে কেউ যখন লাভ করে তখন ঈশ্বর কেমন বস্তু তা সে মুখে বলে বোঝাতে পারে না। তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে, "ভাই, তাঁর কথা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। তোমরা নিজেরা যখন ভাগবানকে লাভ করবে তখন বুঝতে পারবে ঈশ্বর কেমন বস্তু। ঈশ্বর হল অনির্বচনীয়। তিনি বাক্য ও মনের অতীত। ভাষায় তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। ঈশ্বরকে লাভ করলে তবেই জীব মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করে। সেই মোক্ষের আস্বাদ কেমন? সাধক তার সমাধির মধ্যে আর সাধারণ মানুষ সুষুপ্তির (গভীর নিদ্রা) মধ্যে মোক্ষের স্বাদ কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে। কীভাবে? যেমন, একটা ঘড়াতে মধু ভর্তি করে রাখা হয়েছে, সেই ঘড়ায় একটা তৃণ বা খড় ডুবিয়ে সেই খড় জিভে ঠেকালে মধুর রসাস্বাদ পাওয়া যায়। তেমনি সমাধিতে আর সুষুপ্তিতে মোক্ষ বা মুক্তির একটা আভাস পাওয়া যায়। সাধকের সমাধি আর সাধারণ মানুষের সুষুপ্তির মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। সমাধিতে সাধকের বাইরের কোন বোধ থাকে না, নিজের শরীর, মন, প্রাণ, কোন কিছুরই বোধ থাকে না, কেবল চৈতন্যসত্তা বর্ত্তমান থাকে। সেই এক চৈতন্যসত্তাই জানিয়ে দেয় যে সমাধি অবস্থায় আমি এক আনন্দময় সত্তায় ডুবে ছিলাম। তেমনি সাধারণ মানুষের সুষুপ্তিকালেও বাইরের কোনো বোধ থাকে না, তবে ঐ চৈতন্যসত্তাই সাক্ষীরূপে বিরাজ করে। ঘুম ভাঙার পর তাই মানুষ বলে থাকে — বড় আরামে ঘুমিয়েছি, বড়ই শান্তিতে ছিলাম। সমাধিতে

আর সুষুপ্তিতে সেই একই চৈতন্যসত্তা বিরাজ করে। তবে এই দুই-এর মধ্যে তারতম্য এই যে, সমাধি হয় প্রকাশে আর সুষুপ্তি হয় অন্ধকারে। ঈশ্বরকে লাভ করার যে কী আনন্দ তা অন্য কোন ভাবে বোঝানো যায় না। সমাধি ও সুষুপ্তিতে তা অতি সামান্যভাবে বোঝা যায় মাত্র। নিদ্রায় যে কত শান্তি তা সাধারণ মানুষ ভালভাবেই বোঝে। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর দেহ যখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন দু-চার ঘণ্টা ঘুমতে পারলে সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, তখন মানুষ নতুন শক্তি, নতুন উদ্যমে আবার পরিশ্রম করবার জন্য প্রস্তুত হয়। দেখ, দু-চার ঘণ্টার নিদ্রাতেই মানুষের কেমন শান্তি মেলে এবং দেহ মনে নতুন উৎসাহ জেগে ওঠে। ঘুমের মধ্যে কিছুটা অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায় বলেই ঘুম মানুষের কাছে এত প্রিয়। একবার ঘুম এসে গেলে সে আর কিছু চায় না, কোথায় রইল স্ত্রী-পুত্র-মিত্র-পরিজন? নিজের শরীরটাই বা কোথায় পড়ে রইল - এ সব চিন্তাও তখন তার মাথায় আসে না। বিছানা জুটল তো ভাল, না জুটলেও যেখানে হোক শুয়ে পড়লেই হল। তারপর যখন ঘুম ভাঙল তখন সে আবার ঘুমতেই চায়। একবার চোখ খোলে আবার চোখ বোঁজে, তবু সে ঘুম ছেড়ে উঠতে চায় না। আবার ঘুমের আরামের মধ্যে ফিরে যেতে চায়। সুষুপ্তি অবস্থা ছাড়তে চায় না কারণ, ঘুমের মধ্যেই সে পরম শান্তির সন্ধান পেয়েছে। এখন কথা হোল সমাধি আর সুষুপ্তি যাতে এত আনন্দ তা থেকে মানুষের উত্থান হয় কেন? মানুষ সব সময় সমাধি আর সুষুপ্তিতে মগ্ন থাকে না কেন? কেন তা থেকে বেরিয়ে আসে? এর উত্তর হল— মানুষ নিজের ইচ্ছায় তা করে না, কর্মসূত্র জোর করে তাকে নামিয়ে আনে। সমাধির অবস্থা তো সাধারণ মানুষ বুঝবে না, তবে নিদ্রা অবস্থার সুখ সব মানুষই উপলব্ধি করে থাকে। সংসারে ঘুমের মতো সুখ আর নেই। নিদ্রা হয় কেন? নিদ্রা হয় যখন শরীর নিরোগ থাকে। তাই সংসারের প্রথম সুখ হলো নীরোগ শরীর। আর দ্বিতীয় সুখ হোল নিদ্রা। রোগী আর পাগলের চোখে ঘুম থাকে না। ঘুমের মধ্যে মানুষ কিছুটা অমৃতের আস্বাদ পায়। একথা ডাক্তাররাও মানেন। দেখ, কোন রোগী ঘুমিয়ে আছে, তখন তার ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে। ডাক্তার বলবেন, এখন ওকে ওষুধ দিয়ো না, ওকে ঘুমোতে দাও। এখন ওষুধ খাওয়ালে রোগীর যে উপকার হবে, তার চেয়ে হাজার গুণ উপকার হবে সে যদি ঘুমোতে পারে। সাধারণ মানুষকে মোক্ষের সুখ বোঝাতে গেলে তাই সুষুপ্তির সুখ ছাড়া আর অন্য কোন দৃষ্টান্ত দেয়া চলে না। তবে মনে রাখবে দৃষ্টান্ত ও

প্রদত্ত পদার্থ এক বস্তু নয়। আসল বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য অতি সামান্য, তবু যে জিনিসের কণামাত্র প্রকাশেই এত সুখ, এত শান্তি তার পরিপূর্ণতায় যে কত আনন্দ, কত সুখ ও শান্তি হতে পারে, তা উপলব্ধি করতে হবে। যে উপলব্ধি করতে পারবে, সে-ই কেবল মোক্ষ বা মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে পারবে, অন্যের পক্ষে তা বুঝতে পারা সম্ভবপর নয়। যেমন ধর, কোন এক ব্যক্তি কখনও মিষ্টি খায় নি। একদিন সে অপর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল — ভাই, চিনির স্বাদ কী রকম? উত্তরে ওই ব্যক্তি বলল — চিনি মিষ্টি।

– মিষ্টি কী রকম?

– মিষ্টি হল মধুর?

– মধুর কী? তা কী রকম ভাবে বোঝাব? এক কাজ কর, তুমি কিছুটা মিষ্টি খেয়ে নাও, তাহলে মিষ্টির স্বাদ কী রকম তা উপলব্ধি করতে পারবে। শুধু বর্ণনা দিয়ে চিনির মিষ্টত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে না।

ভাই সিংগী, ঈশ্বরও ঠিক এরকম। বর্ণনা শুনে তাঁকে জানা যায় না। তুমি নিজে তাঁকে উপলব্ধি কর, তবেই ঈশ্বর কী বস্তু তা জানতে পারবে। ঈশ্বরকে পেলে সাধকের যে আনন্দ লাভ হয় তা সে তখন অনুভব করতে পারবে। যে সব মহাপুরুষ ঈশ্বরকে পেয়েছেন, তাঁরা উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করে গেছেন যে ঈশ্বর আছেন এবং ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের কথা তুমি ছেড়ে দাও। এই কলিযুগেই বুদ্ধ, চৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষগণ ঈশ্বর যে আছেন তা কত প্রচার করে গেছেন। চার্বাক আর নাস্তিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাদের তুমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব যত যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দাও না কেন, তারা তোমার যুক্তি খণ্ডন করে দেবে। 'যস্য ভাবনা যাদৃশী সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' যার যেমন ভাবনা তার সে রকম সিদ্ধি লাভ হয়। নাস্তিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তাদের মতে - ঈশ্বর বলে কিছু নেই। কিন্তু যাদের মনোভাব হল — ঈশ্বর আছেন, তাদের কাছে ঈশ্বর অবশ্যই আছেন। সুতরাং যার যে রকম ভাব হবে তার সেরকমই লাভ হবে।

দেখ ভাই সিংগী, ঈশ্বর হলেন কল্পবৃক্ষ। এই কল্পবৃক্ষের তলায় বসে যা তুমি কল্পনা করবে, যা চিন্তা করবে, সেরকমই ফল লাভ করবে। এ বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ একটি গল্প আছে। তুমি শুনলে এই ভাব তোমার পক্ষে সহজে বোধগম্য হবে।

এক পথিক রাস্তা দিয়ে চলেছে। তখন গরমের দিন। কিছু দূর যাবার পর পথিক

ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সামনেই সে একটি বৃক্ষ দেখতে পেল। সে তখন বৃক্ষতলে গিয়ে বসে পড়ল। ঐ বৃক্ষটি ছিল কল্পবৃক্ষ। পথিক সে কথা জানত না। সে যখন বৃক্ষের ছায়ায় বসে আছে, তখন তার মনে এই ভাবের উদয় হলো যে, তার জল তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল পেলে তেষ্টা মেটাতাম। এরকম ভাবনার সাথে সাথে পিছন ফিরে সে দেখল এক ঘড়া ঠাণ্ডা জল হাজির। তখন তার মনে হলো জল তো পেলাম, এখন কিছু খাবার পেলে ভাল হয়, খিদে পেয়েছে, শুধু জল খেলেই তো খিদে মিটবে না। এরকম ভাবার সঙ্গে সঙ্গে একটি থালা ভর্তি প্রচুর খাবার তার সামনে হাজির। তখন পথিকটি খাবার আর জল খেয়ে তৃপ্তি পেল। শরীরে সে বেশ আরাম বোধ করল। এখন তার মনে হলো - জল পেলাম, খাবার পেলাম, একটা বিছানা পেলে ভাল হতো, শরীর ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম নিলে আবার হাঁটতে পারব। এরকম ভাবার সাথে সাথে একটি ভাল বিছানা হাজির হলো। বিছানায় শুয়ে পথিক ভাবতে লাগল — যখন আমি প্রথম এই বৃক্ষের তলায় আসি, তখন এখানে কিছুই ছিল না। কোথা থেকে এসব জল, খাদ্যদ্রব্য, বিছানা এল! এ তো বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! তবে কী এই গাছে ভূত আছে? যেই ওই পথিকের মনে ভূত - ভাবনার উদয় হলো, তখন ঝট্-করে একটি ভূত তার সামনে এসে দাঁড়াল। ভূত দেখে সে খুব ভয় পেল। তার মনে হলো, তবে কী ভূতটা আমাকে খেয়ে ফেলবে? ব্যাস, যেই না ভাবা অমনি ভূতটা তাকে খেয়ে ফেলল।

দেখ ভাই সিংগী, তুমি তো কল্পবৃক্ষের তলায় বসে আছো। কল্পবৃক্ষের নিচে বসে তুমি যা সঙ্কল্প করবে তা-ই ফলীভূত হবে। তুমি যদি ভূতের ভাবনা কর, তবে ভূতই মিলবে। আর তুমি যদি ভগবানের ভাবনা কর, তবে তুমি ভগবানকেই লাভ করবে। ভাবকে শুদ্ধ করতে হবে। ঈশ্বর আছেন — এই ভাব যার হৃদয়ে আছে তার কাছে ঈশ্বর আছেন। যার হৃদয়ে এই ভাব আছে যে ঈশ্বর নেই, তার কাছে ঈশ্বর নেই। এই যে কল্পবৃক্ষের গল্প বলা হল, এ থেকে সিদ্ধান্ত বাক্য হল - "যস্য ভাবনা যাদৃশী, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" এ বিষয়ে একটি পৌরাণিক উদাহরণ আছে। এটি ভক্তিভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মহাভারতে দেখা যায় যে, দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করতে লাগল তখন রাজসভায় দ্রৌপদীর নিদারুণ লজ্জাজনক অবস্থা হল। লজ্জাকাতরা দ্রৌপদী তখন জোড় হাতে ভগবান হরিকে কাতরভাবে এই বলে ডাকতে লাগল - "হে

লজ্জানিবারণকারী, হে দ্বারিকানাথ, আপনি আমার এই বিপদ সময়ে আমাকে রক্ষা করুন"। দ্রৌপদী খুবই কাঁদতে লাগল, তবু ভগবান এলেন না। তবে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করলেন। তখন দ্রৌপদী চোখ বন্ধ করে ব্যাকুলভাবে ভগবানকে 'হৃদয় বিহারী' বলে ডাকতে লাগলো। ভগবান এবার ঝট্ করে আবির্ভূত হলেন। দ্রৌপদীর খুব অভিমান হলো, বলল, "হে সখা, আমার এই বিপদকালে তোমাকে কত ডাকছি, তাহলে এত দেরি করে এলে কেন? ভগবান বললেন, "হে সখী, তুমি আমাকে 'দ্বারিকানাথ' নামে কেন ডাকছিলে? আর সেজন্যই তো দ্বারকা থেকে আমার আসতে এত দেরি হচ্ছিল। তবে যেই তুমি আমাকে 'হৃদয়বিহারী' বলে ডাকলে, তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমার হৃদয়ে উদয় হয়েছি। তুমি যদি প্রথমেই আমাকে 'দ্বারিকানাথ' না বলে 'হৃদয়বিহারী' বলে ডাকতে তাহলে আমার আসতে এত দেরি হতো না, আমি ঝট্ করে তোমার হৃদয়ে উদয় হয়ে যেতাম।"

দেখ ভাই সিংগী, এই উদাহরণে এটাই সিদ্ধান্ত হল, যে ভক্ত ভগবানকে যেভাবে ভাববে বা মনে মনে গড়ে নেবে ভগবানও সেইভাবে তার কাছে ধরা দেবেন। ভগবান হলেন নিরাকার, ভক্ত তাঁর আকার গড়ে নেয়। নিরাকার হল নীর - আকার অর্থাৎ জলের আকার। জলের নিজস্ব কোন আকার নেই। জলকে যে পাত্রে রাখবে জল সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে। যেমন গোলাকৃতি পুকুরের জলকে গোল দেখায়, চৌকো পুকুরের জলকে চৌকো দেখাবে। আধার অনুসারে জলের আকৃতির পরিবর্তন হয়। নীর - আকার স্বরূপ ঈশ্বরও এই জলের মতো ভক্তের হৃদয়ে বাস করেন। ভক্তের হৃদয় যেভাবে ভাবিত হবে ভগবানও তার হৃদয়ে সেই রূপে ধরা দেবেন। ভাই সিংগী, তুমি তো ভগবানের ভক্ত আছ। তুমি তোমার ইচ্ছা অনুসারে ভগবানকে গড়ে নাও। নাস্তিকের ভাব ছেড়ে দিলে তবেই শান্তি হবে। দেখ ভাই, তুমি সব লোককে ভক্ত হিসেবে, ভাল লোক হিসেবে গড়ে তুলবে, তা তো ভাই হবে না। তুমি নিজে আগে ভাল হয়ে যাও। তুমি যদি সারা পৃথিবী চর্মাবৃত করতে চাও তাহলে মুশকিলে পড়বে। তাই তুমি নিজের পায়ে চামড়ার জুতো পরে নাও। তাহলে তুমি যেখানেই যাবে, তোমার কাছে পৃথিবী চর্মাবৃত থাকবে। তুমি যদি আকাশকে ছাতাদ্বারা আবৃত করতে চাও, তা তো সম্ভব হবে না। তাই তুমি নিজের মাথার ওপরে ছাতা মেলে ধর। তাহলে তুমি যেখানেই যাও না কেন তোমার কাছে আকাশ ছত্রাবৃতই থাকবে। দেখ ভাই সিংগী, তুমি নিজে আস্তিক হও, ঈশ্বরপরায়ণ

হও - এটাই ঠিক। তুমি নিজে আস্তিক হয়ে গেলে তোমার কাছে ঈশ্বর আছেন। তুমি যদি ভগবানকে সাকার ভাব, তাহলে তোমার কাছে তিনি সাকার হয়ে যাবেন। আর যদি তাঁকে নিরাকার ভাব তাহলে তিনি নিরাকার হয়ে যাবেন। এ বিষয়ে আর একটি উদাহরণ স্বরূপ গল্প আছে — কোন এক গাছের ডালে বসে একটি পাখী ডাকছে। ওই গাছটির পাশ দিয়ে একটি রাস্তা আছে। ওই রাস্তা দিয়ে দুই পথিক যাচ্ছে। একজন মুসলমান, আর একজন বৈষ্ণব। এমন সময় দুজনের মধ্যে বিবাদ লাগল। মুসলমান পথিক বলল - পাখী বলছে - "সুভান তেরি কুদ্‌রৎ" (তোমার ভাগ্য শুভ হোক) বৈষ্ণব বলল - না পাখী বলছে - "রাম, লক্ষ্মণ, দশরথ।" সেই সময় আর একজন তৃতীয় পথিক এল। সে একজন মালী। সে বলল, তোমরা বিবাদ কোরো না। ওই পাখীটি যা বলছে তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি। পাখীটি বলছে - "পিঁয়াজ, লশুন, আদরক।" (পিঁয়াজ, রসুন ও আদা)। তখন তিন পথিক নিজেদের মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি শুরু করে দিল। এমন সময় চতুর্থ পথিক এসে গেল। সে ছিল একজন পালোয়ান। সে বলল- আরে না না, তোমরা পাখীর কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পার নি। আমি ঠিক বুঝেছি। পাখী বলছে - "দণ্ড, মুদ্‌গর, কসরৎ।" (লাঠি, মুগুর, কৌশল)। দেখ ভাই, চার জন লোক পাখীর ডাক চার রকমভাবে শুনল। যে মুসলমান সে তার ভাব অনুসারে শুনল "সুভান তেরি কুদরৎ"। যে বৈষ্ণব সে শুনল "রাম লক্ষ্মণ, দশরথ"। মালী তার ভাবানুযায়ী শুনল, "পিঁয়াজ, লশুন, আদরক"। আর যে পালোয়ান সে শুনল, "দণ্ড, মুদগর, কসরৎ"। শোন, পাখী তো চার রকম কথা বলে নি, সে একরকম কথাই বলেছে। যার যে রকম মনের ভাব সে সেরকমই শুনছে। ভগবান সাকার না নিরাকার, সগুণ না নির্গুণ, রাম না রহিম তা কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না। যে সাধকের যে রকম ভাব হবে, ভগবান তার কাছে সেই রূপ ধারণ করে নেন। এ ব্যাপারে আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এক গাছে রয়েছে একটি গিরগিটি। তার মাঝে মাঝে রঙ্ বদল হচ্ছে, কখন তাকে হলদে দেখাচ্ছে, কখন নীল, কখন রক্তবর্ণ আবার কখন সাদা। ক্ষণে ক্ষণে গিরগিটির রঙ বদল হচ্ছে। তাই তার নাম বহুরূপী। গাছ তলাতে গিরগিটিটি রয়েছে — যত পথিক ওই পথ দিয়ে যাচ্ছে, কেউ তাকে হলদে, কেউ নীল, কেউ লাল, কেউ বা সাদা দেখছে। সব পথিকই যে যার মতে এককাট্টা। একজন বলছে - রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম একটা হলুদ রঙের গিরগিটি পড়ে রয়েছে।" আর একজন বলল "না না ওর রঙ হলুদ নয়,

লাল।" আর একজন বলল, - "না না, ওর রঙ সাদা।" এইভাবে তারা পরস্পরের মধ্যে কথা কাটাকাটি করতে লাগল। তখন একজন পথিক বলল - আচ্ছা ভাই, ওই গাছের তলায় একজন সাধু বসে রয়েছেন। চল তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা যাক্। তখন সব পথিক ওই সাধুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল - "বাবা, এই গিরগিটির গায়ের রঙ কী? ওর গায়ের রঙ নিয়ে আমাদের মধ্যে খুব তর্ক হচ্ছে কিন্তু কোন মীমাংসা হচ্ছে না। কেউ বলছে - গিরগিটির রঙ হলদে, কেউ বলছে লাল, কেউ বলছে নীল, আবার কেউ বলছে সাদা।" সব শুনে ওই সাধু হাসতে লাগলেন, তারপর বললেন — "তোমরা কেউ বেঠিক দেখনি। সবাই ঠিকই দেখেছ। ওই গিরগিটি হল বহুরূপী। ওর রঙ ক্ষণে ক্ষণে বদল হয়। আমি তো এখানেই এই গাছের নিচেই থাকি। আমি ওই গিরগিটির সব রকম রঙই দেখে থাকি।"

দেখ ভাই সিংগী, ঈশ্বরও হলেন বহুরূপী। কেউ ঈশ্বরকে সাকার বলে থাকে, কেউ নিরাকার বলে, কেই বলে ব্রহ্ম, কেউ বলে আত্মা। কেউ সগুণ বলে, আবার কেউ নির্গুণ বলে। ঈশ্বরের বিভিন্ন ভাবকে নিয়ে মানুষের মধ্যে অনবরত লড়াই চলছে। তবে যে সাধক সর্বদা ঈশ্বরে তন্ময় হয়ে অবস্থান করছেন অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে অভেদভাবাপন্ন হয়ে গেছেন, তিনিই বুঝতে পারেন যে, ঈশ্বর সর্বরূপী সর্বব্যাপী হয়ে আছেন, তাঁকে বাদ দিয়ে কিছুই থাকতে পারে না। দেখ ভাই, যত বাদ - বিসম্বাদ রাস্তাতেই, গন্তব্য স্থানে পৌঁছলে আর কোন দ্বন্দ্ব বা ঝগড়া ঝাটি নেই। যার যেমন ভাব, সেই সাধক ঈশ্বরের সেই ভাব নিয়েই থাকে। ঈশ্বরও ওই সাধকের সেই ভাব পুরণ করে দেন। তোমাদের পুরাণে প্রহ্লাদের উদাহরণ দেয়া যায়। প্রহ্লাদের ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী বিভু। যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করল, "প্রহ্লাদ, তুমি যে বলছ — তোমার হরি সর্বব্যাপী বিভু হয়ে আছেন, তাহলে বলতো — এই স্ফটিকের স্তম্ভে তোমার হরি আছেন"? উত্তরে প্রহ্লাদ বলল, "হ্যাঁ পিতা, আমার হরি এই স্তম্ভের মধ্যে অবশ্যই আছেন। আমার হরি ছাড়া আর কোন বস্তুই নেই।" তখন হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে পদাঘাত করল, স্তম্ভ ভেঙে পড়ে গেল। আর দেখ, প্রহ্লাদের ভাব পূরণ করবার জন্য ঈশ্বর ওই স্তম্ভ থেকে নৃসিংহ রূপ পরিগ্রহ করে বেরিয়ে এলেন। এ থেকে কী বোঝা যাচ্ছে? এ থেকে বোঝা যায়, যার মধ্যে যে ভাবটি দৃঢ় হবে, ভগবান ওই সাধকের কাছে সেই রূপই পরিগ্রহ করবেন। তবে সংকল্প শুদ্ধ করতে হবে। শুদ্ধ সংকল্প সিদ্ধ হবেই।

এ দিনের সৎসঙ্গ যখন হচ্ছিল, তখন আমি (সরলাবালা) আমার পিতৃদেবের

সঙ্গে ছিলাম। আমি তখন শ্রীশ্রী গুরু মহারাজকে বলেছিলাম, "আপনার উপদেশ আমি সব বুঝলাম কিনা সে বোধ আমার নেই। তবে আমার চিত্ত যে প্রসন্ন হয়েছে ও আমি বেশ আনন্দ পেয়েছি, তা আমি বেশ বোধ করছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাচ্ছা দেখ, মিছরির সরবৎ যদি অন্ধকারে পান কর, তবে মিষ্টি লাগবে আর আলোর মধ্যে যদি পান কর, তাও মিষ্টি লাগবে। আজকের এই সৎসঙ্গে তোমার কোন অনুভূতি হোক আর না হোক, শুধুমাত্র শুনলেই তোমার মিষ্টত্ব লাগবে। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, সৎসঙ্গের তুলনা নেই। সঙ্গের এমনই প্রভাব, সঙ্গের প্রভাবে মানুষ ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারে আবার নিচে নেমেও যেতে পারে। এইজন্য সর্বদা সৎসঙ্গ করা দরকার। অসৎসঙ্গে পড়লে তোমাকে নিচে নামিয়ে দেবে। সৎসঙ্গে পড়লে তোমাকে ওপরে উঠিয়ে দেবে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তমূলক একটি গল্প আছে — এক গোবরে পোকা এক ভ্রমরকে বলল, 'তোমার আর আমার দু'জনের রঙ একই রকম অর্থাৎ কালো। ভাই, তোমাতে আমাতে বন্ধুত্ব পাতাই।' ভ্রমর বলল, "খুব ভাল কথা, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার মিত্রতা হল। কিন্তু তুমি দিনরাত এই গোবরের দুর্গন্ধের মধ্যে পড়ে আছ কেন? তোমার তো পাখা আছে। এসো, আমরা দুই বন্ধু আকাশে উড়ে বেড়াই।" বন্ধুর কথা শুনে গোবরে পোকা রাজি হয়ে গেল এবং দুই বন্ধু উড়তে উড়তে একটি পদ্মের উপর এসে বসল। সেই পদ্মের সুগন্ধে গোবরে পোকা এমন মুগ্ধ হয়ে গেল যে সে পদ্মের কোরকের মধ্যে ঢুকে গেল। আর ভ্রমর একটু পরেই আবার উড়ে অন্য জায়গায় চলে গেল। এমন সময় সূর্যদেব অস্ত গেলেন। পদ্মের দলগুলি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল, আর গোবরে পোকাও সেই সঙ্গে পদ্মফুলের মধ্যে বন্দী হয়ে রইল। পরদিন ভোর বেলায় এক ব্রাহ্মণ এলেন পুষ্করিণীতে স্নান করতে। সুন্দর একটি পদ্মফুল ফুটে রয়েছে দেখে তিনি ভাবলেন, মহাদেবের পুজোয় ফুলটি নিবেদন করবেন। এই ভেবে ফুলটি তুলে নিয়ে তিনি ঘরে গিয়ে পুজোয় বসে পদ্মটিকে মহাদেবের মাথায় স্থাপন করলেন। পদ্মের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে বন্দী গোবরে পোকারও মহাদেবের মাথায় স্থান হলো। পরদিন সকাল বেলা মহাদেবের সব নির্মাল্য ব্রাহ্মণ গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এলেন। গঙ্গার স্রোতে সেগুলো ভেসে যেতে লাগল। পদ্মের সঙ্গে গোবরে পোকাও ভেসে চলল। এদিকে ভ্রমর বন্ধুকে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখতে পেল যে তার বন্ধু গঙ্গার স্রোতে ভেসে চলেছে। তখন সে বন্ধুকে বলল, "আরে বন্ধু, তুমি শীঘ্র উড়ে এস, নইলে মারা পড়বে।" গোবরে পোকা তখন বন্ধুকে বলল, "ভাই, এখন আমাকে মরতেই

দাও।" এই বলে সে ভ্রমরকে একটি দোঁহা শোনাল ঃ

সঙ্গৎ গুণ অনেক ফল, শির মহেশকো বৈঠ্।
হে মিত্র মোয় যায় দে গঙ্গাজীকো পেট।।

অর্থাৎ "সৎ সঙ্গতে কত ফল মেলে, যেমন আমি মহাদেবের মাথায় চড়ে বসলাম। হে মিত্র, আমাকে গঙ্গায় ভেসে যেতে দাও। দেখ বন্ধু, সৎসঙ্গের কী প্রভাব! তোমার সঙ্গে ক্ষণিকের সঙ্গ করে মহাদেবের মাথায় চড়ে বসলাম, তারপরে নির্মাল্যের সঙ্গে গঙ্গা পেলাম। আর আমাকে বাঁচিও না। গঙ্গায় মারা গেলে আমার মুক্তি হবে তাই গঙ্গাতেই আমাকে মরতে দাও।" দেখ, কোথায় গোবরে পোকা গোবরের মধ্যে পড়েছিল, ভ্রমরের সঙ্গে ক্ষণিকের সৎসঙ্গ করে গোবরে পোকার কত উন্নতি হল। তার একেবারে মহাদেবের মাথায় স্থান হল, নির্মাল্যের সাথে গঙ্গা লাভ হল, ফলে তার মুক্তির পথও খুলে গেল। দেখ বাচ্ছা, ক্ষণিক সৎসঙ্গে কত ফল! সৎসঙ্গের প্রভাবে মানুষ সব কিছু পেয়ে যায়। তাই অসৎসঙ্গ নয়, সৎসঙ্গ যাতে পাওয়া যায় সব মানুষকে সেই দিকে নজর রাখতে হবে।

পিতা ঃ গুরু মহারাজ, আপনার মধুর উপদেশ শুনতে যে মানুষই আপনার কাছে আসে সে-ই একেবারে মুগ্ধ হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ- দেখ ভাই সিংগী, তুলসীদাসের একটি দোঁহা আছে -

"তুলসী মিঠো বচনকো সুখ উব্‌জে ঘন ঘোর,
বশীকরণ এক মন্ত্র হ্যায় ত্যাজ দে বাক্য কঠোর।"

হে তুলসী, তুমি মধুর কথা বল, মধুর কথা শুনলে লোকের সুখ উপচে পড়ে। বশীকরণ কোন মন্ত্র নয়, কর্কশ কথা ত্যাগ করলেই বশীকরণ মন্ত্র হয়ে যায়। দেখো ভাই সিংগী, কোন লোককে যদি মধুর কথা বলা যায়, তাহলে সেই কথা লোকটির কাছে মিষ্টি লাগে, আর ওই কথা লোকটি মেনে নেয়। দেখো ভাই, বুলি অর্থাৎ বাক্যের ওপর একটি দোঁহা আছে, —

"বুলি বোল্ অমূল্য হ্যায় যো যানে বোল্
বুলি এ্যয়সা বোলিয়ে কাঁটে আন্দার তৌল।"

এটির তাৎপর্য এই যে, মানুষের বাক্য অর্থাৎ মুখের কথা খুবই অমূল্য, তবে সেই কথা বলতে জানলে হয়। এমন ভাবে কথা বলা চাই যে দাঁড়িপাল্লার ওপর চাপিয়ে যেমন জিনিসের ওজন মাপা হয় সেরকম মেপে কথা বলতে হবে। তবেই ওই কথায় কত কাজ হয়ে যায়! দেখ ভাই, তোমাকে আমি কিছুই দিই নি। তোমার সঙ্গে

শুধু কথা বলছি। তাতেই তুমি একদম মুগ্ধ হয়ে রয়ে আছ। এজন্যই বলা হয়— শব্দ ব্রহ্ম। তবে শব্দ প্রয়োগ করার কৌশল জানা চাই। এক ব্যক্তির ফাঁসী সাব্যস্ত হয়েছে। তার জন্য ভাল একজন কইয়ে বলিয়ে ব্যারিষ্টার নিয়োগ করা হল। তিনি এমন ভাবে কথা বা বাক্য প্রয়োগ করে সওয়াল করলেন যে ওই ব্যক্তির ফাঁসীর হুকুম রদ হয়ে গেল এবং তার প্রাণ বেঁচে গেল। গুরু শিষ্যকে কী দেন? কিছুই নয়, শুধু একটি শব্দ (মন্ত্র) কানে শুনিয়ে দেন। সেই শব্দতেই শিষ্যের ভগবান লাভ হয়ে যায়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে শব্দ প্রয়োগের কৌশল জানা চাই। সব লোক এই শব্দ প্রয়োগের কৌশল জানে না। যেমন কোন মামলা যদি হেরে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি হয়, তখন একজন নামজাদা বড় ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করলে সেই ব্যারিষ্টারের কথার কুশলতায় হারা মামলায় জিত হয়ে যায়। তেমনি, ধর আমার ঈশ্বর প্রাপ্তি হচ্ছে না, তখন যদি আমার কোনো সাধু সদ্‌গুরু লাভ হয়, তাহলে তাঁর প্রভাবে, তাঁর বাণীতে আমার ঈশ্বর লাভ হয়ে যেতে পারে। দেখ, তোমরা গৃহস্থ লোক, তোমরা কথা বলার সময় সাবধান বা সতর্ক হবে। কথাটা মনে রাখবে। যে কথা একবার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, তা তো আর সময় মতো ফেরৎ আসবে না। তাই কথা বা বাক্য বুঝে সুজে বিচার করে তবেই বলবে।

এই দিনের সৎসঙ্গ শুনে আমার ধর্মপ্রাণ পিতৃদেব যে কত আনন্দ পেয়েছিলেন, তাঁর সেই সময়কার মুখ এখনও মনে পড়লে আমারও হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে।

দ্বিতীয় পর্ব

স্থান ঃ তপোবন পাহাড় ঃ ১৩২২ বঙ্গাব্দ ঃ ভাদ্র মাস ঃ সময় ঃ সকাল
পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র সিংহ
ও
শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ
[সাধু সজ্জনদের নিন্দায় লাভবান হয় কে]

পিতা ঃ মহারাজ, কোন কোন ব্যক্তি আপনার নিন্দা করছে, তা শুনে আমার মনে খুব দুঃখ হচ্ছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, যারা আমার নিন্দে করছে, তারা তো ধোপা, তাদের ধোলাই করতে দাও। দেখ ভাই সিংগী, মানুষ ভগবানকেও নিন্দে করে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

স্বয়ং পূর্ণ অবতার। অথচ দেখো, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি রাজারাও তাঁর কত নিন্দেই না করেছে। তাতে ভগবানের কোন ক্ষতি হয় নি। বরং ওই সব নিন্দুক রাজারা তাঁর কাছে পরাস্ত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি শ্লোক আছে ঃ—

"অধর্মাঃ ধর্মং নিন্দন্তি, চৌরাঃ নিন্দন্তি চন্দ্রমাং,
বেশ্যাঃ যোগীনং নিন্দন্তি, মুর্খাঃ নিন্দন্তি পণ্ডিতান্।।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অধার্মিক সে তো ধর্মের নিন্দে করবেই, যে চোর হবে, সে তো চাঁদের আলোর নিন্দে করবেই, কারণ অন্ধকার রাতে তার চুরি করার পক্ষে সুবিধে, চাঁদের আলোয় তার অসুবিধা হয়। যে বেশ্যা সে তো যোগীর অবশ্যই নিন্দে করবে, কারণ যোগী, ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে তার কোন কামনা বাসনা পূর্ণ হবে না। আর যে মূর্খ, সে তো পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তির নিন্দে করবেই, কারণ সে তো বিদ্যার গৌরব বোঝেও না, মানেও না। মূর্খের নিন্দায় পণ্ডিতের কোন ক্ষতি হয় না। নিন্দুকদের নিন্দে করতে দাও, এতে কিছু খারাপ হয় না।

শাস্ত্রে একটা আশঙ্কার প্রশ্ন উঠেছে — জ্ঞানীর যে মোক্ষ লাভ হয়, সেটা কেমন করে সম্ভব? জ্ঞানীর পাপ আর পুণ্য যায় কোথায়? পাপপুণ্য না থাকলে তাঁর শরীর থাকে কীভাবে? শরীর থাকলেই কিছু না কিছু ভাল মন্দ কাজ সেই শরীর দ্বারা ঘটে যায়। চলতে ফিরতে পায়ের চাপে কত পোকা মাকড় মরে যায়, তাতে জ্ঞানীদেরও জীব হত্যা জনিত পাপ হয়। আর ভাল কাজ বা শুভ কাজ জ্ঞানী লোক তো করেই থাকে। এতে তার পুণ্য লাভ হয়। তাহলে তার মোক্ষলাভ হবে কী করে? পাপপুণ্যের ফল তো বীজস্বরূপ। এই বীজ নষ্ট না হলে মোক্ষ বা মুক্তি হবে না। তবে এই আশঙ্কার উত্তর হল যে, জ্ঞানীর পাপ পুণ্য নিয়ে নেয় নিন্দুক আর স্তুতিকারী। যে লোক জ্ঞানীর নিন্দে করে, জ্ঞানীর সঙ্গে শত্রুতা করে, তাকে দুঃখ দিয়ে থাকে, সে তো জ্ঞানীর পাপের অংশ নিয়ে নেয়। আর যে লোক জ্ঞানীর স্তুতি বা গুণ কীর্তন করে এবং তার সেবা করে, সে জ্ঞানীর পুণ্যের অংশ নিয়ে নেয়। স্থূলভাবে দেখতে গেলে জ্ঞানীর যে নিন্দে করে, সে তো তার শত্রুর কাজ করে থাকে, তবে সূক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে যে নিন্দুক সে জ্ঞানীর পরম মিত্র, কারণ সে জ্ঞানীর পাপের অংশ নিয়ে নেয়। ভাই দেখো, এ থেকে এই বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছয় যে, ভাবকে উল্‌টে দিতে হবে —শত্রু বলে কেউ নেই, যাকে শত্রু মনে করছ, তাকেই মিত্র হিসেবে দেখো। তাহলে আর দুঃখ হবে না।

তৃতীয় পর্ব

স্থান ঃ তপোবন পাহাড় (দেওঘর)

১৩৩৬ বঙ্গাব্দ বৈশাখ। সময় ঃ প্রাতঃকাল। জোড়াবাগান – জমিদার অক্ষয় কুমার ঘোষের গৃহিনী শ্রীমতি চারুশীলা ঘোষ

ও

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[কলিযুগের ধর্ম -- দান কর আর নাম কর ঃ উলটে যাও ঃ ডায়েরী লিখ দেও ঃ মুক্তিলাভের জন্য চাই বিচার ঃ জপাৎ শুদ্ধি, জপাৎ শুদ্ধি জপাৎ শুদ্ধি বরাননে ঃ মুখমে নাম হাত মে কাম]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ -মা, "কলৌ দানৈব কেবলম্ কলৌ নামৈব কেবলম্।" কলিযুগে এটিই তপস্যা। এতেই মানুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। কলি খুবই প্রবল। এজন্য মানুষ অল্পায়ু হয়ে গেছে আর তার শক্তি অনেক ক্ষীণ হয়েছে। এখন কোন মানুষের শরীরে এমন শক্তি নেই যে সে যাগযজ্ঞ করবে, উপবাসী হয়ে তপশ্চরণ করবে। একদিন নারদ ঋষি গঙ্গায় স্নান করতে করতে বলছেন, "কলির্ধন্যঃ কলির্ধন্যঃ কলির্ধন্যঃ।" একথা শুনে আর একজন ঋষি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সব যুগের চেয়ে কলিযুগ নিকৃষ্ট। তাহলে আপনি কেন কলি যুগকে ধন্য বলে মানছেন?" তখন নারদ বললেন, "ভাই, কলিযুগকে আমি ধন্য বলে মানি এই কারণে যে, অন্যান্য যুগে অনেক তপস্যা করে মানুষ উদ্ধার পেয়েছে, অথচ এই কলিযুগে বিনা তপস্যায় কেবলমাত্র অন্নদান আর ঈশ্বরের নাম নিলেই মানুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। এই দানে আর নামে জীবের সদ্‌গতি হয়ে যায়। দেখ মা, ভগবান তোমাকে যখন দু'পয়সা দিয়েছেন, তখন তুমি দানের পরিমাণ বাড়িয়ে যাও। দেখ মা, যত তুমি দান করবে, তোমার ধন ততই যাবে বেড়ে, কমবে না। কুয়োর জল যতই তুলে নেবে ততই তা পূর্ণ হতে থাকবে, জলও পরিষ্কার থাকবে। কুয়ো থেকে জল না তুললে জল নষ্ট হয়ে যায়। সে জল লোকে খেতে পারে না। আর ওই জল তুমি যতই খরচ করতে থাকবে, ভগবান ততই তা পূর্ণ করে দেবেন। তাই দিতে হয়ে অন্নদান, আর নিতে হয় হরিনাম। মা, যদি দিতে চাও তো অন্নদান করো, আর নিতে যদি চাও তো হরির নাম নাও। ভগবান তোমাকে দু'পয়সা দিয়েছেন। কত গৃহস্থ লোক দিন ভর পরিশ্রম করে, তবেই দু'পয়সা বাইরে থেকে রোজগার করে আনে। সেই রোজগার থেকে সংসারের খরচ চালিয়ে ছেলেপুলেদের খাইয়ে পরিয়ে যেটুকু পয়সা বাঁচাতে পারে তা গুরু

সেবার জন্য এখানে দিয়ে যায়। দেখ মা, কী প্রবল তাদের ধর্মভাব। আমিও তাই দেখি-ধর্মভাব থেকে গৃহস্থেরা এই যে দু'-পয়সা দিচ্ছে, তা ভাল জমি দেখে বপন করে দিতে হবে অর্থাৎ কোন শুভ কাজে ওই টাকা খরচ করে দিতে হবে। দেখ মা, তোমাদের এই আশ্রমে অন্নদান হচ্ছে, বিদ্যাদান হচ্ছে, ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, গো সেবা হচ্ছে, দেবসেবা হচ্ছে। অতিথি-ফকির যারা এখানে আসে তাদেরও কিছু মিলে যায়। হিন্দুদের যত রকম শুভ কাজ আছে, সব এই আশ্রমে হয়ে থাকে। দেখো মা, ওষুধ দানও শ্রেষ্ঠ দান। তুমি অন্ন দিচ্ছ কিন্তু আমি খেতে পারছি না। আমি একজন রোগী। কিন্তু অন্ন আমার কাছে ভাল লাগছে না। ওষুধ খেলে আমার রোগ সেরে যাবে। তাই অনেক সময় অন্নদানের চেয়ে ওষুধ দানও আর একটি শ্রেষ্ঠ দান। বিদ্যাদানও এক শ্রেষ্ঠ দান। সংসারে সব চেয়ে দুঃখদায়ক কি জান? নিজের মূর্খতা। নিজের মূর্খতা বড়ই দুঃখের হেতু। বিদ্যাদানে মানুষের ওই দুঃখের নিবৃত্তি হবে। মা, হিন্দুদের মধ্যে যা যা ভাল কাজ আছে অর্থাৎ শুভ কাজ আছে, তার সব কিছুই এই আশ্রমে চালু আছে। তুমি যে আমাকে দু'পয়সা দিচ্ছ, তা নিয়ে আমার কী করা কর্তব্য? আমার কর্তব্য হল, ভাল উর্বর জমি দেখে সেই বীজকে বপন করে দেওয়া, যাতে পরের বছর বা পর জন্মে তার ফল তুমি ভোগ করতে পারো। এতে আমার কোন স্বার্থ বা লাভ নেই। "জিস্‌কা চুন্ উস্‌কা পুণ্, সাধু-অবধূতকা নেহী পাপ ঔর পুণ্।" যার টাকাতে শুভকার্য হয়, ফল তারই মেলে, সাধু-অবধুতদের এতে কোন পাপও নেই, পুণ্যও নেই। তবে সাধু অবধূত হল মালি। জমি চিনতে পারে কে? জমি চিনতে পারে ওই মালি। গৃহস্থের কাছে সাধুর বেশ ধরে কেউ এল আর দু'পয়সা ঠকিয়ে নিয়ে চলে গেল। আবার সত্যিকারের 'ভাল' কোন সাধু গৃহস্থের কাছে গালাগালি শুনে ফিরে যায়। সাধুবেশধারীদের মধ্যে কে যে ভাল, কে যে মন্দ, গৃহস্থ তা চিনতে পারে না, তবে গুরুজনরা আছেন যাঁরা জমির ভাল - মন্দ বোঝেন, তাঁদের হাত দিয়েই শুভকার্য করানো উচিত। কেমন ভাবে? যেমন মালি বুঝতে পারে কোন্ জমিতে কোন্ বীজ বপন করলে ভাল ফসল ফলবে। এভাবে সাধুজন ও গুরুজন বুঝতে পারেন কোন্ কাজ করলে গৃহস্থের কল্যাণ হবে, গৃহস্থের দেওয়া অর্থ তাঁরা শুভকার্যে লাগিয়ে দিয়ে থাকেন। মা, তুমি তো ঝি, আর ভগবান তোমার মনিব। তুমি যেমন তোমার কর্মচারীর কাছ থেকে জমা - খরচ বুঝে নাও, হিসাব পাই পাই করে বুঝে নাও, তোমাকেও ভগবানের কাছে জমা-খরচ বুঝিয়ে দিতে হবে। তুমি তোমার কর্মচারীকে বেতন দিয়ে থাকো, তোমাকেও তোমার মনিব

ভগবান বেতন দিয়ে থাকেন। ওই বেতন কী? তা হল অন্য আর বস্তু। আর কোন বস্তুর প্রতি তোমার অধিকার নেই। তোমার কর্মচারী তোমার যখন লোকসান করে দেয়, তখন তুমি তার বেতন কেটে নাও। তাতে তুমি তাকে দুঃখ দাও। তোমার ক্ষেত্রেও এরকম হবে, সব ধন ভগবানের, তুমি তো তাঁর কর্মচারী মাত্র। এই ভাব নিয়ে থাকো। তাহলে তোমার কোন বন্ধন থাকবে না। তোমার নিজের বলতে কিছু নেই। যখন তুমি ছিলে না, তখনও এই এস্টেট ছিল, যখন তুমি চলে যাবে, তখনও এই এস্টেট থেকে যাবে। তোমার সঙ্গে এস্টেট যাতায়াত করবে - এমন নয়। এই এস্টেট তোমার আগেও ছিল, তোমার পরেও থাকবে। তুমি 'আমার আমার করছো, এতে তোমার বন্ধন বেড়েই যাচ্ছে।' এক মনিবের কাছে দু'জন কাজ করে। একজন অন্ধকারে (অজ্ঞান, অবিদ্যা) কাজ করে আর একজন কাজ করে প্রকাশে (জ্ঞান, পরাবিদ্যা)। যে কর্মচারী 'আমার আমার' করে, ওতো অন্ধকারে (অজ্ঞান, অবিদ্যার) কাজ করে আর একজন কাজ করে প্রকাশে (জ্ঞান, পরাবিদ্যা)। যে কর্মচারী 'আমার আমার' করে, ওতো অন্ধকারে কাজ করে আর এক কর্মচারী জানে - "হে ভগবান, আমার বলে কিছু নেই, এ সব তোমারই। আমি তোমারই দাস আছি। আর তুমি আমার প্রভু। 'দাসোঽহম্' তুমি যে কাজ আমাকে দিয়ে করাচ্ছো, আমি সেই কাজ করছি। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রে নিদ্রা যাওয়া পর্যন্ত হে ভগবান, সব তোমারই কাজ। "যদ্ যদ্ কর্ম করোমি, তদ তদ্ অখিলং শম্ভো তব আরাধনম্।" যার হৃদয়ে এই ভাব রয়েছে, সে তো প্রকাশে কর্ম করছে। যে প্রকাশে কাজ করে, তার খুব আরাম বা সুখ হয়, যে অন্ধকারে কাজ করে, তার খুব দুঃখ কষ্ট হয়। অজ্ঞানী 'আমার আমার' বলে কাজ করে। জ্ঞানী ওই কাজ 'তোমার তোমার' বলে করে। যে "তোমার তোমার" বলে কোন কাজ করে, তার বন্ধন হবে না। যে 'আমার আমার' বলে কাজ করে, তাঁর বন্ধন উত্তরোত্তর বেড়েই যায়। মা, তুমি যখন ঘুম থেকে উঠবে, তখন তুমি ঈশ্বরকে স্মরণ করবে এভাবে—হে ইষ্টদেব, এখন থেকে আমি তোমার কাজে নিযুক্ত হলাম। ফের রাত্রে ঘুমুতে যাবার আগে সারাদিনে যা যা কাজ করেছ তা সব ঈশ্বরকে ডায়েরি লিখে দাও, 'ডায়েরী লিখদেও" এই বলে — যা কিছু কাজ করেছি, তা সব তোমারই কাজ, তোমার কাজ সব বুঝে নাও।" যা কিছু আমার বলে মানছ তা সব কিছু তোমার করে দাও। উল্‌টে দাও। উল্‌টে দিলে সোজা হয়ে যাবে। 'উলট্ যাও'।

মা, মুক্তি তো গাছের ফল নয় যে গুরু তোমাকে হাতে হাতে দিয়ে দেবেন, দুধও

নয় যে তোমাকে খাইয়ে দেবেন। মুক্তি হল নিজের অনুভূতির বিষয়, এরজন্য চাই সর্বদাই বিচার। বিচারই সার। বিচার করলেই সব কিছু নিশ্চয় হয়ে যাবে। কোন বস্তুই তোমার নিজের নয়। তা যদি হতো, তাহলে মৃত্যুর পরে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারতে। তা তো হবার নয়, যেখানকার ধন সেখানেই পড়ে থাকবে। মরণের পর তোমার সঙ্গে যাবে পাপ আর পুণ্য। শুভাশুভ কর্ম থেকে যে পাপ ও পুণ্য হয় তা - ই তোমার সঙ্গে যাবে। মা, 'যা দেবে হাতে ওহি যাবে সাথে'। নিজ হাতে পুণ্যকর্ম ও শুভকর্ম হিসাবে যা কিছু দান করে যাবে, তা-ই তোমার সাথে যাবে। সব সময় শুভ কাজ কর, শুভ চিন্তা কর, দান কর, 'কলৌ দানৈব কেবলম্।'

ঐ সময়ে আমি চারুমায়ীর কাছে বসে ছিলাম। আমি বললাম, "মহারাজ, চারুমার তো ধনসম্পত্তি আছে, উনি তো দান করবেন, কিন্তু আমার তো সামর্থ নেই, আমি কী করে পুণ্য কাজ, দান করব? আমার কী উপায় হবে?"

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখ বাছা সরলা, সব মানুষের একই পথ হবে, তা তো নয়। তবে সকলের গন্তব্যস্থান এক, রাস্তা ভিন্ন ভিন্ন। "কলৌ দানৈব কেবলম্ কলৌ নামৈব কেবলম্।" তোমার ধন নেই, তাই তুমি নাম কর —

"শ্বাস শ্বাসমে হরি রটো, বৃথা শ্বাস মাৎ খোও,
না জানে কিস্ শ্বাসমে আওন হোয় কি না হোয়।"

—প্রতি শ্বাসে হরিনাম কর, কে জানে যে শ্বাস বাইরে গেছে সেই শ্বাস আবার ফিরে আসবে কি আসবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই প্রতি শ্বাসেই ঈশ্বরের নাম কর। ঘড়ির কাঁটা যেমন টুক্‌টুক্ করতে থাকে, তেমনি হরিনামের কাঁটা টুক্‌টুক্ করে যাও। চলতে ফিরতে নাম করে যাও। নাম বন্ধ করবে না।

"জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিবরাননে" ঈশ্বরের নাম জপ করলেই জীবের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যাবে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে কী হবে? "তদ্ জপস্তদর্থ ভাবনম্।" জপ যখন করবে তখন যাঁর নাম জপ করছ, মনের মধ্যে তাঁর রূপের ধ্যান করবে। তাতেই নামের অর্থ বোধ হবে। যেমন ঘড়া ঘড়া বললে ওই ঘড়ার রূপ তোমার মনে উদিত হবে, তোমার মনে গ্লাসের রূপের উদয় হবে না, ঘড়ার রূপই মনে ভেসে উঠবে। সেই রকম তুমি যখন "হরি হরি" জপ করবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী রূপটি তোমার মানস পটে ভেসে উঠবে। তবেই তোমার জপ করা সিদ্ধ হবে। এতেই তোমার মুক্তি হবে। নতুবা তুমি "হরি হরি" নাম করছ চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছ, আর তোমার মনিরাম

(মন) ইষ্ট দেবতা থেকে চলে গিয়ে বাজারে খরিদ করতে লেগে গেছে। এরকম ভাবে নাম জপ ধ্যান করলে কোন কাজ হবে না। তোমাদের বাংলায় একটি কথা প্রচলিত আছে ঃ 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'-এ বিষয়ে একটি প্রচলিত গল্প আছে ঃ

একটি লোক খাটের উপর শুয়ে শুয়ে ভগবানের নাম করছে। এমন সময় তার এক বন্ধু এসে তাকে বলল-'ছি ছি তুমি শুয়ে শুয়ে ভগবানকে ডাকছো!' তখন ওই লোকটি বন্ধুকে বলল, "আমি তো শুয়ে শুয়ে ভগবানকে ডাকছি। তুমি কীভাবে ভগবানকে ডেকে থাকো?" বন্ধুটি তখন বলল - "ভাই, আমি তো ভগবানকে ডাকি না।" তখন লোকটি বলল-"ভাই, তোমার থেকে আমি ভাল আছি। তুমি তো কিছুই কর না। আমি তো তবু শুয়ে শুয়েও ভগবানের নাম করি।" কত লোক আমাকে বলে -বাবা কীভাবে জপ করব? কেউ বলে আমাকে রোজগার করতে হয়। আমার তো সময় নেই জপ করবার। কেউ বলে আমাকে ব্যবসা করতে হয়, তাই জপ করবার সময় হয়ে ওঠে না। মায়েরা কেউকেউ বলে ছেলেপিলেদের লালন পালন করতেই সব সময়টা চলে যায়। ভগবানের নাম কখন করব বলুন? আমি তখন বলি—দেখো, তোমরা যে যা কাজ করছ কর, তাতে ভগবানের নাম নেবার কোন বাধা হবে না। তুমি যদি মুখে মিছরির একটা টুক্‌রো রেখে দাও আর হাত পা দিয়ে যত রকম কাজ করতে থাকো, তাহলে একই সঙ্গে তোমার কাজ হবে, আর সেই সঙ্গে মিছরির স্বাদও তুমি গ্রহণ করতে পারবে। মুখের মধ্যে মিছরির টুক্‌রো থাকলে তোমার কাজে তো ব্যাঘাত ঘটবে না। তেমনি ভাবে তুমি মুখে নাম-রস আস্বাদন কর আর হাত পা দিয়ে সমস্ত ব্যবহারিক কাজ কর্ম কর, তাতে কোন বাধা সৃষ্টি হবে না। তবে তার জন্যে চাই অভ্যাস। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে তখন সব কিছু সহজ হয়ে যাবে। 'মুখমে নাম কর্‌না। হাত মে কাম কর্‌না।' অর্থাৎ মুখে নাম কর আর হাত দিয়ে কাজ কর। এ ব্যাপারে আর একটি উদাহরণ আছে ঃ

যে বাজিকর বাঁশিবাজির খেলা বা দড়ির খেলা দেখায়, তাকে কীভাবে অভ্যাস করতে হয়, তা লক্ষ্য কর। পায়ে তার শিং বাঁধা, তা নিয়ে বাঁশেতে বাধা দড়ির উপর দিয়ে সে হাঁটছে, মাথায় রয়েছে ঘড়া, হাতে বাঁশ, নিচে ঢোল বাজছে, সেই ঢোলের তালে তালে সে এগিয়ে চলেছে। একবার ভেবে দেখ তো? এই খেলা দেখাবার সময় বাজিকরের মনটি কোথায় থাকে? মনের গতিকে সে সবদিকে সমান ভাবে ভাগ করে দেয়। তার জন্যে কী অভ্যাসটাই না তাকে করতে হয়েছে। একদিকে

মনোনিবেশ বেশি করলে, অন্যদিকে তা কম পড়ে যাবে? ফলে সে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। বাজিকর একসঙ্গে কত কাজ করে চলেছে, কোথাও তার এতটুকু বিঘ্ন হচ্ছে না। সেই রকম সংসারের কাজেও বাজিকরের মতো অভ্যাস করতে হবে। সংসারের সবই কাজ করে যাও আর সেই সঙ্গে ভগবানকে স্মরণ করতে থাকো। তবে অভ্যাস ছাড়া এটি হবে না, বাজিকরকেও ছোটবেলা থেকে অভ্যাস করতে হয়েছে। অভ্যাস করলেই সব কিছু সহজ হয়ে যাবে। দেখ, দানই বল, যাগযজ্ঞই বল সবেতেই অর্থের প্রয়োজন। এইজন্যে সব লোক দান যাগযজ্ঞ করতে পারে না। তাই সকলের পক্ষে প্রশস্ত হল - হরিনাম করা। কলিযুগে এটাই মাহাত্ম্য। কলৌ দানৈব কেবলম্ কলৌ নামৈব কেবলম্।

আমি আর চারুমা ওই দিনের সৎসঙ্গ শুনে মনে প্রাণে বড়ই শান্তিলাভ করেছিলেম। আর আমার মনে তখন এই ভাবের উদয় হলো, "গুরোঃকৃপাহি কেবলম্"। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের মুখারবিন্দ হতে যেন অমৃত ঝরছিল। আর আমরা ত্রিতাপদগ্ধ জীব সেই অমৃত পান করে শীতল হয়েছিলাম।

চতুর্থ পর্ব

স্থান ঃ তপোবন পাহাড়
১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র মাস ঃ সময় - বৈকাল
শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ
ও
কয়েকজন কাছারীবাবুর সৎসঙ্গ
[দাতা বড়ো না গ্রহীতা বড়ো, নিজেকে পাত্র হিসেবে গড়ে তোলো, কর্মফল, আত্মার অবস্থা]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাবুরা, তোমরা কার জন্য এত পরিশ্রম করে দু-পয়সা খরচ করে এখানে এসেছ?

বাবু ঃ বাবা, আপনি একজন মহাপুরুষ। আপনাকে দর্শন করবার জন্যই এখানে এসেছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাবু, তোমরা কাকে দর্শন করবার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছ? যদি এই স্থূল শরীরের দিকে তাকাও তবে দেখবে - এ তো হাড় মাংসের শরীর। তোমাদের শরীরও ওই হাড় মাংস ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি নিজেকে দেখে নাও,

তাহলেই তো দর্শন হয়ে যাবে। আর তুমি যদি পুরুষের ভেতরটায় প্রবেশ করে দেখতে চাও, তবেই ঠিক ঠিক দেখা হবে। তা না হলে শুধু হাড় মাংস জটাজুটধারী সাধু দেখে কী হবে?

বাবু ঃ বাবা, আপনি তো ত্যাগী মহাপুরুষ। আপনাকে দর্শন করলে আমাদের কল্যাণ হবে।

শ্রীশ্রী গুরু ঃ ভাই, আমি ত্যাগী কি! ত্যাগী তো তোমরা। তোমরা এমন ত্যাগী যে তোমাদের পাশে আমার ত্যাগ কিছুই নয়। তোমরা হলে আসল ত্যাগী, আমি তো ঝুটা (ভণ্ড) ত্যাগী।

একথা শুনে কাছারি - বাবুরা অবাক হয়ে গেলেন এবং শ্রীশ্রী গুরু মহারাজের কাছে উক্ত কথার তাৎপর্য জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ আপনারা আসল বস্তু ত্যাগ করেছেন আর আমি তো ঝুটা বস্তু ত্যাগ করেছি।

একথা শুনে বাবুরা আরও আশ্চর্য হয়ে বললেন, "বাবা এ কী রকম হাস্যকর কথা আপনি বলছেন, আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

শ্রীগুরু মহারাজ এ কথা শুনে খুব হাসতে লাগলেন। ওই সময় মহারাজের হাসি বড়ই মিষ্টি ও প্রকাশ ব্যঞ্জক হয়েছিল। যাঁরা সেখানে ছিলেন তাদের সকলের মন একেবারে শীতল হয়ে গেল এবং মনের অন্ধকার দূর হয়ে গেল অর্থাৎ তমোভাব চলে গেল, যেমন সূর্যের আলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এ তো বিচারের কথা, হাসির কথা নয়। তোমরা আসল বস্তু ঈশ্বরকে ত্যাগ করেছ, আর ধন দৌলত স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি ঝুটা বস্তু নিয়ে বসে আছ। আমি তো ঝুটা বস্তু ত্যাগ করে দিয়ে আসল বস্তু ঈশ্বরকে নিয়ে মগ্ন আছি। তাহলে দেখ ভাই, তোমরা ত্যাগী, না আমি ত্যাগী। আমার চেয়ে তোমরা অনেক বেশি ত্যাগ করে আছ — এ কথা তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছ, তাই না?

গুরু মহারাজের কথা অনুধাবন করে কাছারি - বাবুরা খুব আনন্দ লাভ করলেন এবং প্রসন্ন হলেন। এরপর শ্রীগুরুদেব পুনরায় বলতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাবু, তোমরা এখানে এসেছ কিছু দেবার জন্য অথবা কিছু নেবার জন্য?

বাবুঃ বাবা, আমরা এখানে এসেছি কিছু নিয়ে যাবার জন্য। আপনি কিছু সৎ কথা ও সৎ উপদেশের কথা বলুন। তা-ই আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, বলতো — দাতা বড় না গ্রহীতা বড়?

বাবু ঃ বাবা, দাতা বড়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, গ্রহীতা বড়। ধর, আমি তোমাকে কিছু জিনিস দিলাম। তুমি যদি তা গ্রহণ না কর অথবা এখান থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করে নিয়ে গেলে, তারপর গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবার পথে ফেলে দিলে, তাহলে কী হবে?

বাবু ঃ হ্যাঁ বাবা, গ্রহীতারও কিছু গ্রহণ - করবার সামর্থ ও মানসিকতা থাকা দরকার।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ আচ্ছা, তোমরা বল তো, সাধুর কাছে তোমরা কী নিতে এসেছ?আর কী বা দিতে এসেছ?

বাবু ঃ বাবা, আপনি বলুন, আমরা জানি না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ তোমরা নিতে এসেছ ধর্ম আর অর্থ, দিতে এসেছ ভক্তি ও বিশ্বাস। তোমরা সংসারী লোক, তোমরা কেবল ধর্ম চাও না। কেউ যদি শুধু ধর্মই চায়, আমি তাকে বলব - লেংটি পরে এই পাহাড়ের ওপর বসে যাও। তাহলেই তোমার ধর্ম মিলে যাবে। কিন্তু তা তো হবে না। তোমরা বলবে - "বাবা, আমাদের বাচ্চাকাচ্চা আছে, রোজগার করতে হবে, এখানে কি করে বসে থাকব।" তোমরা সংসারী লোক। তোমরা চাও, তোমাদের সংসার কল্যাণময় হোক আর সেই সঙ্গে পরমার্থও যেন লাভ হয়, অর্থাৎ ধর্ম ও অর্থ দুটোই তোমরা চেয়ে থাক।

বাবু ঃ হ্যাঁ বাবা, আপনার একথা যথার্থ। আমরা ধর্ম, অর্থ — দুটো জিনিসই চেয়ে থাকি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, এ দুটি জিনিস নিতে হলে দুটি পাত্র চাই। এ দুটি পাত্র হল — ভক্তি আর বিশ্বাস। যখন এ দুটি পাত্র নিয়ে আসবে, তখন ধর্ম আর অর্থ— দুটোই লাভ হবে। পরমাত্মা সর্বশক্তিমান ও পরম দয়ালু। তিনি কি তোমাদের অভাব পূরণ করতে পারেন না? কী করবে বল? উনি তো দিয়েই চলেছেন। নিজেকে পাত্র হিসাবে গড়ে না তুললে নেবে কী করে? যেমন বৃষ্টির জল সর্বত্র বর্ষণ হয়ে চলেছে। কোন পাত্র থাকলে সেই জল ধরে রাখা যায়। পাত্র না থাকলে তা ধরে রাখা যায় না। জল বয়ে চলে যায়। গঙ্গার ধারা বয়ে চলেছে। গঙ্গার জল নেবার জন্য বহু লোক যাচ্ছে গঙ্গামাতার কাছে, যার ঘড়া থাকে সে ঘড়া ভর্তি করে জল নেয়, যার ঘটি থাকে সে ঘটি ভর্তি করে জল নেয়, যার কাছে কলসী থাকে সে কলসী ভর্তি করে জল নেয় আর যার কাছে কোন পাত্রই থাকে না, সে তো জল নিতেই পারে

না। মা গঙ্গা তো কাউকে জল দিতে নিষেধ করেননি। তিনি তো কৃপাময়ী। তবে যার যেমন পাত্র আছে, ওই ব্যক্তি সেই রকম পরিমাণ মতো জল নিতে সক্ষম হয়। মা গঙ্গা তো জল দিচ্ছেন। কিন্তু পাত্র না থাকলে সেই জল নেবে কী করে? এর তাৎপর্য হল - গ্রহীতা উপযুক্ত না হলে দাতা দান করতে সমর্থ হয় না। ভক্তি আর বিশ্বাস হল এ দুটি পাত্র। মায়া আর অভিমান এ দুটি পাত্রকে মলিন করে রেখেছে। এ দুটিকে ত্যাগ করতে হবে। আবর্জনা ভরা ফুটো পাত্র থাকলে ভাল জিনিস দিলে তাতে ধরবে না, পড়ে যাবে, ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

সন্ত মিলনকো যাইয়ে ত্যাজ্ মায়া অভিমান
যো যো পাঁও আগে রাখে তেঁও তেঁও যজ্ঞ সমান।।

সংযত চিত্ত সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে এবং সাধু সজ্জনদের কাছে গেলে মায়া আর অভিমানকে ত্যাগ করে যাওয়া চাই। তবেই পাত্র হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে। আর তাহলেই তাঁদের কৃপা লাভ করতে সমর্থ হবে। বাবু, আপনারা আমার কাছে এসেছেন, আমার কর্ত্তব্য হল আপনাদের সঙ্গে কিছু সৎ প্রসঙ্গ আলোচনা করা, যাতে আপনাদের কল্যাণ হয়। আপনারা উত্তম মনুষ্য দেহ পেয়েছেন, উত্তম বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন, পরমাত্মাদেব আপনাদের কিছু টাকা পয়সাও দিয়েছেন, আবার আপনাদের অনুগত কিছু লোক আছে যারা আপনাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কাজ করে চলেছে। তোমরা সব রকমের যথেষ্ট আরাম উপভোগ করছ। আর কুলি মজুররা কত দুঃখ কষ্টের মধ্যে রয়েছে। এর কারণ কী? পরমাত্মাদেব কাকেও দুঃখ দিতে চান না, সকলকেই সুখী করতে চান। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না, কারণ মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করতেই হবে। মানুষকে দেখে তার তিন জন্মের কথা বুঝতে পারা যায় যেমন (১) আছে, আছে, আছে - কিছু সুকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি আছে যারা পূর্বজন্মেও কিছু ভাল কাজ করেছেন, এ জন্মে তাই ভাল ঘরে জন্মে দান ইত্যাদি পুণ্যকাজ করছেন। তাই পরজন্মেও সুকৃতি বলে শুভ ফল ভোগ করবেন। এইভাবে তিন জন্মের কথা বুঝতে পারা যায়, (২) নেই, নেই, নেই-যাদের জীবন প্রচুর দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে তাদেরও তিন জন্মের কথা জানা যায়। বিগত জন্মে তারা শুভ কাজ করেনি, তাই এ জন্মেও সুখ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আবার যদি এ জন্মেও তারা পুণ্য কাজ না করে তাহলে পরজন্মেও ভাল ফল তারা লাভ করবে না। (৩) নেই আবার আছে- এর তাৎপর্য হল কোন গরীব মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা নেই, তবু সে এত দয়ালু যে সে

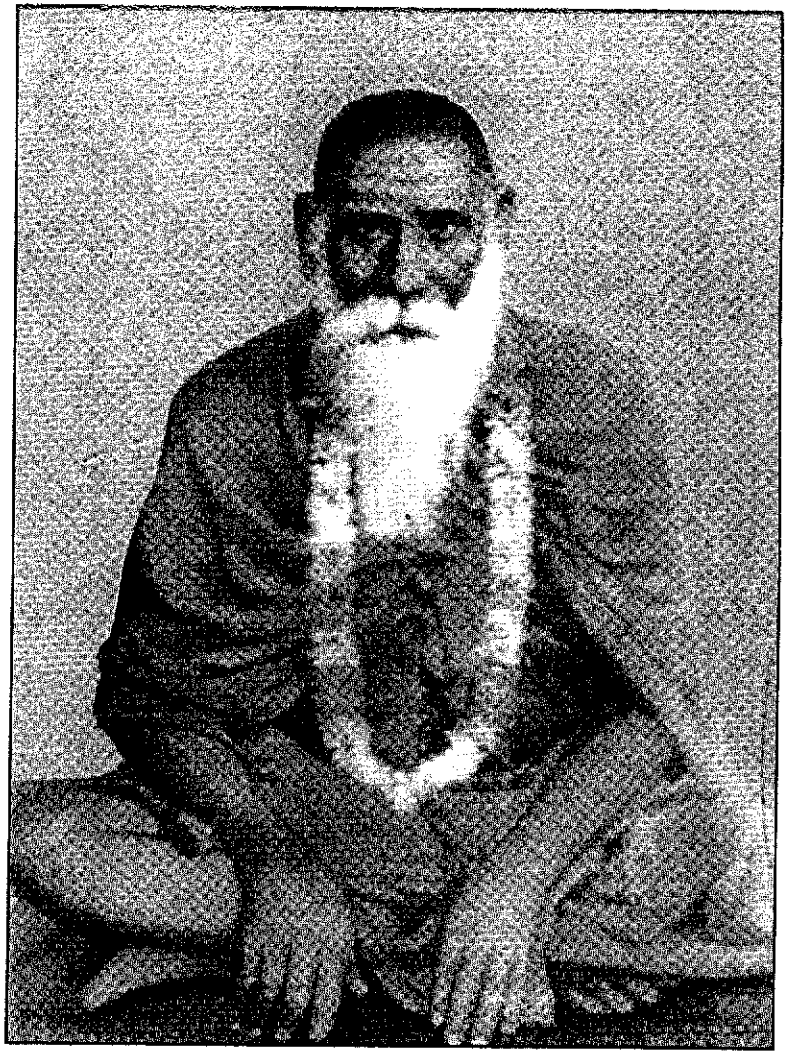

শ্রীশ্রী ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী

নিজে অভুক্ত থেকেও যা কিছু পায় দান করে দেয়। এ থেকে বুঝতে পারা যায়-পূর্বজন্মে তার কিছু সুকৃতি ছিল না, তাই এ জন্মে তার ভাল কিছু নেই, তবে এ জন্মে সে এত দয়ালু এবং দান ইত্যাদি পুণ্য কাজ করছে যে পরজন্মে ভাল ফল মিলবে। (৪) আছে আবার নেই — এ কথার সিদ্ধান্ত এই যে, কোন শ্রীমান ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার সব কিছু আছে, টাকা পয়সাও যথেষ্ট আছে। এ থেকে বুঝতে পারা যায় পূর্ব জন্মে তার সুকৃতি ছিল, দানের মতো পুণ্যকাজও কিছু কিছু করেছিল, এজন্য এ জন্মে সে ভাল সব কিছু পেয়েছে তবে এ জন্মে সে শুভ কাজ কিছু করছে না। তাই আসছে জন্মে সে শুভ ফল কিছু লাভ করবে না। বাবু, আপনারা তো বাসী খাবার খাচ্ছেন। পূর্ব জন্মে কিছু ভাল কাজ করেছিলেন। তাই এ জন্মে ভাল সব কিছু পেয়েছেন। এ জন্মে কিছু শুভ কাজ করুন, তা না হলে আসছে জন্মে না খেতে পেয়ে মরতে হবে। দেখ বাবু, চাষী প্রতি বছরেই ধান রোপন করে থাকে। সে পরের বছরের রোপনের ধান না রেখে যদি সবটাই অন্ন হিসাবে খেয়ে নেয়, তাহলে পরের বছর সে না খেয়ে মরবে। তাই উৎপন্ন ধানের একাংশ খাওয়ার জন্য রেখে আর অপরাংশ যদি রোপন করা হয়, তবেই তো পরের বছর ধানের মজুত থাকে। বাবু, আপনারা দুর্লভ মনুষ্য জীবন লাভ করেছেন। কিছু শ্রীমান ব্যক্তি আছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলছি — আপনারা এ জন্মে কিছু রোপন করুন, তা না হলে পরজন্মে না খেয়ে মরবেন। আপনারা বুদ্ধিমান, আপনাদের বেশী কিছু বলতে হবে না। আমি যা বলছি তাতেই আপনাদের কল্যাণের পথ পেয়ে যাবেন। বাবু, সৎসঙ্গ লাভ করা খুবই দুর্লভ।

সৎসঙ্গ হরিকথা তুলসী দুর্লভ দোয়।
সুত দারা লছমী পাপীকো ভি হোয়।। (তুলসীদাসের দোঁহা)

- তুলসী, পাপী লোকেদেরও স্ত্রী, পুত্র ধন সবই তো আছে, কিন্তু সৎসঙ্গ ও হরিকথা - এ দুটি বড় দুর্লভ।

গুরু বিন্ মিলে না জ্ঞান, ভাগ্য বিন্ মিলেনা সজ্জন।
যোগ বিন্ মিলেনা রাজ, বল বিন্ হটে না দুর্জন।।

- গুরু বিনা জ্ঞান লাভ হয় না। বহুৎ ভাগ্য না থাকলে সাধু সজ্জনদের সঙ্গলাভ হয় না, বহু যাগ যজ্ঞ তপস্যা না থাকলে রাজ্য লাভ হয় না, আর শরীরের বল বা শক্তি না থাকলে দুর্জন ব্যক্তি হটে যায় না।

বাবু ঃ বাবা, আমরা সংসারী মানুষ, আমাদের সৎসঙ্গ লাভ করবার কোন উপায়

নেই?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, সৎসঙ্গ লাভের যথেষ্ট উপায় আছে। ঘরে বসেই সৎসঙ্গ লাভ হবে। আপনারা বিদ্বান ব্যক্তি। আপনারা শাস্ত্র পাঠ করুন। তাহলেই ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণের সঙ্গ লাভ হবে। সৎসঙ্গ লাভের উপায় নেই তা নয়। যদি কেউ সৎসঙ্গ লাভের জন্য সচেষ্ট হয়, তবে তার উপায়ও ঠিক মিলে যাবে।

বাবু ঃ বাবা, স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর আর কারণ শরীর ছাড়া আর কী অবশিষ্ট থাকে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বেশ, প্রশ্নটি খুব ভাল। তবে প্রশ্নকর্তাকে অধিকারী হতে হবে। তারজন্য তাকে নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ করতে হবে। অধিকারী না হয়ে ধর্ম সম্পর্কিত এ রকম প্রশ্ন করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। বাবু, স্থূল সুক্ষ্ম, কারণ তিন শরীরের অতিরিক্ত যা রইল তা আত্মা। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করছে - আত্মা কি? আত্মার স্বরূপ কি? গুরুদেব উত্তরে বলছেন, 'স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ - এই তিন অবস্থার যে সাক্ষী তাকে সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ আত্মা বলে জানবে। এই আত্মা তোমার বাল্যকাল, যৌবনকাল ও বার্দ্ধক্যকাল — এই তিন অবস্থাকে সাক্ষী হয়ে দেখে যাচ্ছে। বালক অবস্থায় তোমার মনের যেমন ভাব ছিল, শরীরের গঠন যেমন ছিল, কাজে যেমন চেষ্টা ছিল, এখন যৌবন অবস্থায় তাদের কিছুই অবশিষ্ট নেই। তোমার সেই বাল্য অবস্থার সাক্ষী রয়েছে আত্মা, তার কোন পরিবর্তন হয় নি। এখন তোমার এই যৌবন অবস্থায় তোমার শরীর মন কর্মপদ্ধতি সবই বদলে গিয়েছে। সেই বাল্যকালের অবস্থায় এখন আর তুমি নেই। কিন্তু এখনো সেই আত্মাই সাক্ষী হয়ে তোমার এই যৌবন অবস্থা দেখে যাচ্ছে। দেহের পরিবর্তন হলেও আত্মার কোন পরিবর্তন হয় নি। যখন মানুষের বার্দ্ধক্য কাল উপস্থিত হয়, তখন তার শরীর শিথিল হয়ে পড়ে, দাঁত পড়ে যায়, চুলে পাক ধরে, তার কর্ম প্রচেষ্টা অন্য দিকে প্রবাহিত হয়, তখন এই অবস্থাতেও আত্মা সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকে। আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। সাক্ষী হয়ে শরীরের তিন অবস্থাকে দেখতে থাকে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সাক্ষী হল আত্মা। এ যেন দেহলী দীপ। ঘরের মাঝখানে রাখা একটি প্রদীপ। প্রদীপের আলোয় ঘরের ভিতরটা যেমন দেখা যায়, তেমন বাইরেটাও দেখতে পাওয়া যায়, আবার মাঝখানটাতেও আলো পড়ায় দেখার কোন অসুবিধা হয় না। আত্মারও তেমনি দৃষ্টি রয়েছে সর্বত্র, সে সাক্ষী এবং দ্রষ্টা। বাবু, আত্মা কোন বস্তু নয় যে আপনাকে হাতে দিয়ে দেব, আর আপনি মুঠো করে নিয়ে নেবেন। আত্মা অনুভবসিদ্ধ বস্তু। একদিন আত্মার কথা

শ্রবণ করে আপনার অনুভূতি হয়ে যাবে তা হবে না। সদা সর্বদা আত্মার কথা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করতে হবে, তবেই তার সন্ধান মিলবে।

আপনার সাথে কতক্ষণ ধরে বক্ বক্ করে চলেছি। উকিল ব্যারিষ্টারদের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে বক্ বক্ করলে কত যে ফি দিতে হত তার ইয়ত্তা নেই। বাবু, আপনি আমাকে কত ফি দেবেন বলুন? আমি যা যা কথা বলেছি তা মনে রাখবেন - এটাই আমার ফি। এখান থেকে উঠে গিয়ে নুন, তেল, কাঠের কথা আলোচনা বা চিন্তা করতে থাকলে আমার ফি মিলবে না। আমার একটি বাক্য মনে রাখতে পারলেই আমি আমার ফি পেয়ে যাব।

বাবু, আপনার কল্যাণের জন্যই এত কথা বললাম। এতে আমার কোন স্বার্থ নেই। সাধুর কর্ত্তব্য হল - যারা তার কাছে আসবে তাদের কিছু সৎ উপদেশ দেওয়া আর কিছু সৎ কথা বলা।

কাছারি বাবুরা ঐ দিনের সৎসঙ্গ শুনে খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন। আর মাথা থেকে টুপি খুলে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের খড়মের উপর মাথা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করেছিলেন। সেখানে যে যে ছিলেন তাদেরও মনে যেন এক অপূর্ব সাত্ত্বিক ভাব উপলব্ধি হয়েছিল। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের এই বিশেষত্ব যে, যে কেউ তার নিকটে যেতেন, তাঁরই মনের গতি বদলে যেতো। রজ ও তম গুণ দূর হয়ে যেতো। তাঁর সাত্ত্বিক ভাবের প্রভাবে মানুষের ত্রিতাপ দগ্ধ হৃদয় একেবারে শীতল হয়ে যেতো। অনেক লোকের মুখে এরূপ ভাবের উপলব্ধির কথা শুনেছি।

শ্রীবালানন্দ কথা প্রসঙ্গ

পঞ্চম পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম ঃ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র মাস।
শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ ও পণ্ডিত তারামোহন শাস্ত্রীর সৎসঙ্গ, সময় ঃ সকাল

[মুক্তি ও তার প্রকারভেদ ঃ এক মেষপালক, অসহায় সিংহ-শাবক ও একটি সিংহের গল্প ঃ গুরুই শিষ্যের বন্ধন থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন এবং তার স্বরূপকে চিনিয়ে দেন।]

শ্রীশ্রীগুরুঃ ভাই তারামোহন, তুমি একজন বিদ্বান ব্যক্তি, আবার পণ্ডিত ব্যক্তিও। আচ্ছা, তুমি বলতো - মুক্তি কি জিনিস? কোন ব্যক্তি মুক্ত হয়ে গেলে সে ব্যক্তি বলতে পারে না মুক্তি কি জিনিস। তুমি তো শাস্ত্র জান এবং তুমি একজন পণ্ডিত। আমাকে তুমি বলে দাও — মুক্তি কি জিনিস।

শ্রীতারামোহন ঃ মহারাজ, আমি কী করে বলব - মুক্তি কি জিনিস? আমি যে নিজেই বন্ধনে পড়ে আছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, তুমি মুক্তই আছ। জগৎ সংসার সবই মুক্ত। আমি যুক্তি দিয়ে তা বুঝিয়ে দেব। তুমি কোন ভাবেই আমার যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারবে না। আগে দেখ, মুক্তি ক'প্রকার। মুক্তি চার প্রকারের। প্রথম — সালোক্য মুক্তি। ভগবানের সঙ্গে একই লোকে বাস করার নাম সালোক্য মুক্তি। তুমি কি তাঁর সঙ্গে একই লোকে বাস করছ না? ভগবান সর্বব্যাপী আছেন, এমন কোন লোক নেই যেখানে তিনি অবস্থান করছেন না। তুমি যে লোকে বাস করছ, ভগবানও সেই লোকে আছেন। তা না হলে তাঁর সর্বব্যাপিত্বে যে দোষ পড়বে। এখন বিচার করে দেখ, তাঁর সঙ্গে সমান লোকে থাকার দরুণ তুমি মুক্ত কি না। জগৎ সংসারে সালোক্য মুক্তি তাই সকলের ভাগ্যেই ঘটেছে, তা থেকে কেউ বঞ্চিত নয়। দ্বিতীয় — সামীপ্য মুক্তি অর্থাৎ ভগবানের সমীপে বা নিকটে বাস। ভগবান কি তোমার কাছ থেকে দূরে রয়েছেন? তা তো নয়। তিনি 'হস্তামলকবৎ' অর্থাৎ হাতের মুঠোর মধ্যে আমলকি রাখার মতোই তিনি আমাদের এমন কাছে রয়েছেন যে তাঁর সঙ্গে তোমার এক চুলও ফাঁক নেই। তৃতীয় — সারূপ্য মুক্তি অর্থাৎ ভগবানের রূপ লাভ করা। ভগবান হলেন বিশ্বরূপ। বিশ্বের রূপের মধ্যে তোমার রূপ কি নেই? তোমার রূপ কি বিশ্বছাড়া?

হরিরেব জগৎ, জগদেব হরিঃ
হরিতো জগতো ন হি ভিন্ন তনুঃ।

হরিই জগৎ, জগৎ-ই হরি। হরি ও জগৎ - আলাদা তনু (দেহ) নয়।

হরিকে ছেড়ে কোথায় তুমি যাবে? তিনি যে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। চতুর্থ — সাযুজ্য মুক্তি অর্থাৎ ভগবানের সঙ্গে অভেদে অবস্থান। সাধক যখন সমাধিস্থ হয়ে যায়, তখন তাঁর মধ্যে মনের সঙ্কল্প - বিকল্প কিছুই থাকে না, শুধু থাকে এক চৈতন্যসত্তা। সেই চৈতন্যসত্তাই তিনি। সমাধি অবস্থায় সাধক তাঁর সঙ্গে অভেদে অবস্থান করে। এটাই সাযুজ্য মুক্তি। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যাদের সমাধি হয় না, তাদের পক্ষে সাযুজ্য মুক্তি কিভাবে সম্ভব? এর উত্তর হল - মানুষ যখন নিদ্রা যায়, তখন তার এই সুষুপ্তি অবস্থায় তো কিছুই থাকে না। জগৎ সংসার ডুবে যায়, কিন্তু তখনও তার চৈতন্যসত্তা পুরোপুরি লোপ পায় না। তাতেই তার সাযুজ্য মুক্তি হয়ে যায়। আচ্ছা, সাযুজ্য মুক্তিকে তুমি না-ই মানলে, কিন্তু বাকি তিন রকমের মুক্তি তো

অস্বীকার করতে পারবে না। কোন যুক্তিতেই এই তিন মুক্তিকে খণ্ডন করতে পারবে না।

শ্রীতারামোহন ঃ মহারাজ, যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে পারব না ঠিকই, তবে 'আমি মুক্ত আছি' — একথা আমি বলতে পারব না। আমি তো দেখছি যে আমি বন্ধনেই আছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, আমি তো জানি আমরা সবাই মুক্তই আছি। আমার মতকে তুমি যখন খণ্ডন করতে পারবে, তখন আমি বন্ধনকে স্বীকার করে নেব।

শ্রীতারামোহন ঃ মহারাজ, আমরা যে সবাই মুক্ত আছি তা আমাদের ধারণা হচ্ছে না, আমাদের ধারণারই অভাব। যার ধারণা হয়ে যাবে, সে তখন মুক্ত হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই তারামোহন, এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে বলবো। এই গল্পের মধ্যে দিয়ে গুরুদেব শিষ্যকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, তুমি বন্ধনে নেই, তুমি বন্ধন মুক্ত, তুমিই আত্মা।

এক মেষ পালক দূর জঙ্গলে মেষ চরাতে গেল। দূর থেকে সে দেখতে পেল এক সদ্যজাত সিংহ শাবক অসহায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তা দেখে মেষপালকের চিত্তে বড়ই দয়ার উদ্রেক হল। ওই অসহায় সিংহ - শিশুটিকে সে নিজের মেষেদের সঙ্গে নিয়ে এল এবং মেষেদের সাথেই তাকে লালন পালন করতে লাগল। কালক্রমে ওই সিংহশাবকটির মেষেদের মতোই স্বভাব হয়ে গেল। মেষের মতো চলতে লাগল, মেষের মতো মুখে আওয়াজ করতে লাগল। এভাবে সে জেনে গেল আমি মেষই। একদিন মেষ পালে এক সিংহ গর্জন করতে লাগল। ওই সিংহকে দেখে যত মেষ ছিল সবাই পালাতে লাগল। সেই সঙ্গে সিংহশাবকটিও পালাতে গেল। তখন আগন্তুক সিংহটি সিংহশাবককে বলল - ভাই, তুমি আমার স্বজাতি, তুমি কেন আমার গর্জন শুনে মেষেদের মতো ছুটে পালাতে যাচ্ছ? তখন সিংহশাবকটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল - আমি তোমার স্বজাতি নই, আমি মেষ। আমার প্রভু আমার নাম দিয়েছে - 'বড় বখেরা' (বড় মেষ)। তোমার কাছে গেলে তুমি আমাকে খেয়ে ফেলবে। আগন্তুক সিংহ তখন তাকে বলল — আমাকে দেখে কেন তুমি ভয় পাচ্ছো? তুমি সিংহই, আমার স্বজাতি। তোমার যখন বিশ্বাস হচ্ছে না, তখন তুমি আমার সঙ্গে জলাশয়ের পাশে এসো, জলের মধ্যে তুমি তোমার স্বরূপকে জানতে পারবে। তখন নিকটস্থ এক জলাশয়ের পাশে দুজনে উপস্থিত হল। আগন্তুক সিংহ তখন সিংহশাবককে বলল — জলের মধ্যে তাকিয়ে দেখ, আমার চেহারা আর তোমার চেহারা কী এক

নয়? আমার মতো তোমার মুখ আছে, আমার মতো তোমার দেশন আছে, আমার মতো তোমারও লেজ আছে। মেষের চলন বলন তুমি ছেড়ে দাও। আমার মতো প্রবল বিক্রমে গর্জন করে ওঠ। এ কথা শোনার পর সিংহশাবক গর্জন করে উঠল আর বলল, তোমার কথাই ঠিক, আমি তো বখেরা নই, আমি তো সিংহই। মেষেদের সাথে থেকে আমি মেষ হয়ে গেছি। এখন তুমি আমার প্রকৃত স্বরূপ বলে দিয়েছ। আমি মেষ ভাব থেকে উদ্ধার হয়েছি।

এই গল্পের তাৎপর্য এই যে, মানুষ ইন্দ্রিয়বশীভূত হয়ে আত্মার স্বরূপ ভুলে যায়। কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি সিংহরূপী সদ্‌গুরু লাভ করে থাকে। গুরু নিজে থেকে শিষ্যকে কিছু দেয় না। তিনি শিষ্যের ভ্রমকে দূর করে দেন এই বলে যে, তুমি ইন্দ্রিয় নও, তুমি শুদ্ধ মুক্ত আত্মাই।

ভাই তারামোহন, সদ্‌গুরু তো মুক্তির কথা বলে দেন, তিনি কিন্তু মুক্তি দিতে পারেন না। তবে তিনি শিষ্যকে স্ব-স্বরূপ বলে দিতে পারেন। প্রকৃত অধিকারী হলে তবেই তার বোধে বোধ আসবে। দেখ ভাই, তোমাকে উদাহরণ স্বরূপ যে গল্পটি বললাম তাতে দেখা যাচ্ছে – সিংহরূপী সদ্‌গুরু সিংহ - শাবকরূপী শিষ্যকে তার স্ব-স্বরূপ চিনিয়ে দিচ্ছেন।

পণ্ডিত তারামোহন শাস্ত্রী এই সৎসঙ্গ শুনে খুব আনন্দিত হলেন এবং বললেন, 'মহারাজ, আমি অনেক দেশ ঘুরেছি ও অনেক সাধুর চরণ - কমল দর্শন করেছি, কিন্তু আপনার উপদেশ বাণী এমন মধুর, এমন সহজ ও সরল উদাহরণযুক্ত, এরূপ কখনও দেখিনি। আপনার একটি উপদেশও আমাদের অনেক কল্যাণ সাধন করে। আপনার শ্রীচরণে আমাদের যেন মতি থাকে এই প্রার্থনা।' শ্রীগুরু মহারাজ তখন বললেন, "ভাই, তুমি তো বহু শাস্ত্র পাঠ করেছ তুমি আমার একজন ভক্ত, তোমার শুভ ইচ্ছা, শুভ মতি (বুদ্ধি) অবশ্যই থাকবে।" পণ্ডিত মশাই তখন ভক্তি সহকারে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শ্রীচরণতলে প্রণাম করলেন।

ষষ্ঠ পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম ঃ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ঃ ভাদ্র মাস, সময় ঃ সকাল

[ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দুভাবে ঃ অস্তি ভাব ও নাস্তি ভাব, ঈশ্বর ও জীব অভেদ, এ ধারণার উপলব্ধি গুরু কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়।]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই তারামোহন, ঈশ্বর যে আছেন, তা কীভাবে নিশ্চয় করা যায়?

তারামোহন ঃ মহারাজ, আপনি বলুন, আপনার মুখপদ্ম নিঃসৃত সৎকথা শোনবার জন্য আমি বহুদূর থেকে আসছি। মহারাজ, আপনার আশীর্বাদে আমি অনেক আশ্রমের সাধু মহারাজদের দর্শন করেছি এবং তাঁদের সঙ্গলাভ করেছি। কিন্তু আপনার প্রবচন শোনার পর আমার মনের গতি যেরকম ভাবে পরিবর্তন হয়ে থাকে, এমন পরিবর্তন অন্য কোন সাধুর কাছে গেলে হয় না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, তুমি যা বলছ তা যথার্থ বাক্য বলছ, না আমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য রোচক বাক্য বলছ?

তারামোহন ঃ না, মহারাজ, বর্তমানে পূর্ব ভারতে এমন কোন সাধু নেই যার কাছে গেলে মনের গতি বদলে যাবে। পূর্বে ছিল, বর্তমানে কেউ নেই। আমার দৃষ্টিতে তো বর্তমানে তেমন কোন সাধু চোখে পড়ে না। আপনার কাছে এলে আমার এক বিশেষ শান্তি লাভ হয়। আর আপনার কথাবার্তা শুনলে আমার হৃদয় পিপাসু হয়ে ওঠে সৎকথা শোনার জন্য। এখন আপনি বলুন — ঈশ্বর যে আছেন তা কীভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দুভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়। এক - অস্তি ভাব দিয়ে, আর এক নাস্তি ভাব দিয়ে। অস্তি ভাব হলো, ঈশ্বর আছেন আর নাস্তি ভাব হলো, ঈশ্বর বলে কিছু নেই। চৈতন্যের তিন সত্তা, যথা অস্তি, ভাতি ও প্রিয়। মায়ারও তিন সত্তা, যথা — নাম, রূপ ও ক্রিয়া। চৈতন্য সত্তার তো লোপ হয় না। তিনি অস্তি অর্থাৎ আছেন আর ভাতি অর্থাৎ প্রকাশ পাচ্ছেন। চৈতন্যসত্তার এই অস্তি আর ভাতি তোমাকে মানতেই হবে। তবে চৈতন্যের উপর আরোপিত মায়াসত্তার লোপ হয়ে যায়। একটা সোনার তাল থেকে তুমি বালা, হার, আংটি প্রভৃতি নানা রকম অলঙ্কার তোমার ইচ্ছামতো তৈরি করতে পারো। তোমাকে জিজ্ঞাসা করা

হলো - এটা কি? তুমি বলবে, এটি বালা। এটা কি? এটি হার। এটা কি? এটি আংটি ইত্যাদি। সোনার তাল থেকে তোমার ইচ্ছামতো যা কিছু তৈরি করো না কেন সব কিছুর ভেতর সেই সোনাই রয়েছে। অলঙ্কার হিসাবে তার নাম রূপ ও ক্রিয়া যতই বিভিন্ন হোক না কেন, মূলে যে সোনা সেই সোনাই থাকবে। সেই সোনার অস্তিত্ব ও ভাতিত্ব কখনই লোপ পাবে না। কোন লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ভাই, এই বালাটি কী দিয়ে তৈরি? সে বলবে এটি সোনা দিয়ে তৈরি। এটি রূপো দিয়ে তৈরি তা কখনও বলবে না। যখন সোনার তাল ছিল তখন পুরোটাই সোনার ছিল। এখন বালা হার আংটি হয়েছে। এগুলি সব সোনার, শুধু নাম ও রূপের পরিবর্তন হয়েছে। আগুনে এগুলি গলিয়ে দিলে এদের নাম রূপ ক্রিয়া লোপ পাবে। তখন বালা, হার, আংটি সব উবে যাবে, পুনরায় এগুলি সুবর্ণ গোলকে পরিণত হবে। এই অবস্থায় সোনার অস্তিত্ব লোপ পাবে না। তার মায়া সত্তা অর্থাৎ নাম, রূপ ও ক্রিয়া শুধু লোপ পাবে। ঈশ্বরের সঙ্গে মায়ার যতই খেলা চলুক না কেন, কিন্তু তার মধ্যে ভগবৎ সত্তা বা চৈতন্য সত্তা ঠিক বজায় থাকে। যে চৈতন্যসত্তা পিঁপড়ের মধ্যে রয়েছে, সেই একই চৈতন্যসত্তা হাতি, ঘোড়া, মানুষ সকলের মধ্যে রয়েছে। মাটি দিয়ে তুমি ঘড়া, কলসি ইত্যাদি যা কিছু তৈরি করো না কেন, তাদের মূল উপাদান মাটির কোন পরিবর্তন হয় না। এক তাল মাটি থেকে তৈরি মাটির ঘড়াকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলো, সেই টুকরোগুলোকে গুড়িয়ে ধুলো করে হাওয়ায় উড়িয়ে দাও, দেখবে সেই সব ধুলো মাটিতে পড়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে আবার মাটি সেই মাটিতেই পরিণত হয়েছে। মাটির অস্তিত্ব তুমি কোন ভাবেই লোপ করতে পারবে না। সৃষ্টির মধ্যেও ভগবান এই ভাবে ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করছেন, তাঁর অস্তিত্বও কোন ভাবে বিলোপ করা সম্ভব নয়।

তারামোহন ঃ মহারাজ, অস্তি ভাব দিয়ে তো ঈশ্বর যে আছেন, তা নিশ্চিত হয়েছি। এখন নাস্তি ভাব দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কীভাবে নিশ্চিত করবেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, নেতি নেতি অর্থাৎ এ নয়, এ নয় ... এভাবে বিচার করে যাও, তাহলে ঈশ্বরের সন্ধান পাবে। মানুষের দেহ পঞ্চভূত দিয়ে গঠিত। এই পঞ্চভূত হলো - ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম অর্থাৎ মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। এবার তুমি নিজেকে ভাগ করে যার যার অংশ তাকে দিয়ে দাও। মাটির ভাগ পৃথিবীকে, জলের ভাগ জলকে, আগুনের ভাগ আগুনকে, বায়ুর ভাগ বায়ুকে আর আকাশের ভাগ আকাশকে দিয়ে দাও। দেখ, এখন কী পড়ে রইল। নেতি নেতি অর্থাৎ এ নয়, এ

নয় এভাবে বিচার করতে থাকো। ঈশ্বর পৃথিবী নয়, জল নয়, তেজ নয়, বায়ু নয়, আকাশ নয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ তন্মাত্রও ঈশ্বর নয়। প্রতিটি তন্মাত্রর যে দেবতা সেই পাঁচ দেবতাকে তুমি পঞ্চ তন্মাত্র বিলিয়ে দাও। এখন কী রইল? কিছুই নয়। কে সাক্ষী দিচ্ছে যে, কিছুই নেই? সেই সাক্ষী - ই চৈতন্যসত্তা, সে-ই ঈশ্বর। তাহলে দেখ, নাস্তি ভাবেও ঈশ্বর যে আছেন, তা নিশ্চিত হওয়া গেল। ভাই তারামোহন, তুমি একজন পণ্ডিত লোক, সব শাস্ত্র গ্রন্থ তুমি অধ্যয়ন করেছো, এখন বলতো ঈশ্বর কোন্ কাজ সম্পাদন করতে পারেন না? " কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ"। ঈশ্বর সর্ব শক্তিমান। এমন কোন কাজ আছে যা তিনি করতে পারেন না বা করতে সমর্থ নন?

তারামোহন ঃ মহারাজ, এ কথা কী করে বলি যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। কী করে বলব যে ঈশ্বর এ কাজ করতে সমর্থ নন? তাহলে তো ঈশ্বরের দোষ দর্শন হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, দোষ তো তাঁর আছেই। তিনি কী সব কাজ করতে পারেন? কখনই নয়। ঈশ্বরকে যদি বলা হয়, আমি তোমার থেকে আলাদা হব, তুমি আমাকে আলাদা করে দাও। তিনি কী আমাকে তাঁর থেকে আলাদা করে দিতে সমর্থ হবেন?

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি সব কিছুই করতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর থেকে আলাদা করে দিতে পারেন না। হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে চাই না, তুমি আমাকে তোমার থেকে আলাদা করে দাও। তা কিন্তু হবে না। ঈশ্বর সর্বব্যাপী তিনি আমাকে ছাড়া যাবেন কোথায়? আমাকে আলাদা করে দেওয়ার মতো জায়গাই বা কোথায়? তিনি তো সব স্থানে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। ভগবান সব কিছু করতে পারলেও আমাকে তাঁর কাছ থেকে তফাৎ করতে পারেন না। দেখ, ভাই তারামোহন, মানুষের এ কী রকম ভুল! মানুষের ধারণা নেই যে ঈশ্বর ও তার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ভগবান আর মানুষ ওতপ্রোত ভাবে মিলেমিশে রয়েছে — এ বিশ্বাস মানুষের নেই, তার ধারণাও নেই। এর কারণ হলো বিচারের অভাব। বার বার বিচার করলেই এ সম্পর্কে ধারণা হয়ে যাবে। কতশত মানুষ ঈশ্বরকে খুঁজছে কিন্তু কোথায় যে খুঁজতে হবে, তা তারা জানে না। তারা জানে না তাঁতে আর আমাতে কোন ব্যবধান নেই। তিনি আর আমি অভেদ। এ যেন মৃগনাভির কস্তুরীর মতো। মৃগ জানে না যে তার মধ্যেই কস্তুরী রয়েছে, আর সেই কস্তুরীর গন্ধে পাগল হয়ে সে বাইরে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তারামোহন ঃ মহারাজ। আপনি যা বললেন — এই ধারণাকে আমরা কীভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হব?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, গুরু কৃপা না হলে তা সম্ভব নয়। গুরুই এর কৌশল জানেন। শাস্ত্র হলো সমুদ্র, সমুদ্রের জল লবণাক্ত, ঐ জল পান করা চলে না। ঐ জল যখন সূর্য কিরণে বাষ্পীভূত হয়ে যাবে এবং ফের বৃষ্টিরূপে ঐ জল ভুমিতে পড়বে, তখন তা স্বাদু হবে এবং মিষ্টি লাগবে ও পানের উপযোগী হবে। শাস্ত্র পড়ে যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করতে চাও, তা হলে তা হবে না। সাধু সন্তরাই শাস্ত্রের মর্মার্থ ঠিক ঠিক ধরতে পারেন। সূর্যরূপী এই সব সদ্‌গুরু মহাত্মাদের হৃদয়-আকাশে শাস্ত্রের বচনগুলি বাষ্পাকারে জমা হয়ে থাকে, তারপর মুমুক্ষুদের কল্যাণের জন্য সেই বাষ্প উপদেশের আকারে আবার যখন তাঁদের মুখ থেকে নির্গত হয়, তখনই তা মিষ্টি লাগে অর্থাৎ তখনই তা সাধারণ মানুষের ধারণার উপযোগী হয় আর তাতেই প্রাণের পিপাসা মেটে। শাস্ত্র-বাক্য এমনই জটিল যে সবার পক্ষে তা বোঝবার উপযোগী নয়। এ সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ একটি গল্প তোমাকে বলবো। ঐ গল্পের ভাবটি সহজেই তুমি বুঝে নিতে পারবে।

ধনী ঘরের এক ছেলে কুপথে গিয়ে তার বাপ - ঠাকুর্দার অগাধ ধন সম্পত্তি একেবারে নষ্ট করে দিল। শেষকালে তার খাবার জোটানো দায় হলো, দেনার দায়ে পাওনাদারদের গঞ্জনা ও অত্যাচারে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতি থেকে কীভাবে উদ্ধার পাবে - এই হল তার এক মাত্র চিন্তা। তখন সে জনে জনে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "ভাই, কী করে আমি উদ্ধার পাব, তা আমাকে তোমরা বলে দাও।" কেউ বলল - রোজগার করো, কেউ বলল ব্যবসা করো, কেউ বলল ঈশ্বরকে ডাকো, কেউ আবার যোগ - ধ্যানের পরামর্শ দিল। কিন্তু কারোর কথাই তার মনে ধরল না। একদিন তার মনে হলো আমার বাপ - ঠাকুরদা তো এত বড় ধনী ছিলেন, একবার তাঁদের খাতাপত্রগুলো ভাল করে দেখলে যদি পাওনা টাকা পাওয়া যায়, তাহলে সেই টাকা আদায় করে কিছু দিন খাওয়া - পরার কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। খাতাপত্র পরীক্ষা করতে গিয়ে সে দেখতে পেল যে, এক জায়গায় লেখা রয়েছে ঃ "অমুক জায়গায় এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেই মন্দিরের চূড়ায় বহু ধন - রত্ন গাঁথা আছে। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দিবা দ্বিপ্রহরে সেখানে খুঁড়লে সেই গুপ্তধন পাবে।" নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে সে মন্দিরের চূড়াটি ভেঙে ফেলল। কিন্তু ধন-রত্ন মিললই না, অনর্থক মন্দিরটিও

ভেঙে গেল। যুবকটি ভাবতে লাগল — আমার বাপ - ঠাকুরদা কি তবে মিথ্যাবাদী ছিলেন, নইলে খাতায় কেন লিখে রেখেছে মন্দিরের চূড়ায় ধনরত্ন আছে? এইসব ভাবতে ভাবতে দারুণ হতাশায় তার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। এমন সময় এক সাধু তার সামনে এসে দাঁড়াল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন — তুমি দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছ কেন? যুবক বলল, "সাধুবাবা, আমার বাপ - ঠাকুরদার খাতায় লেখা আছে যে এই শিবমন্দিরের চূড়ায় গুপ্তধন গাঁথা আছে। তাই আমি মন্দিরের চূড়া ভাঙলাম, কিন্তু ধনরত্ন কিছুই পেলাম না। বাবা, আমি বড়ো গরীব, অনেক দেনা করে ফেলেছি, পাওনাদারদের অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছি না। তাই আমি কাঁদছি, কী করে আমি উদ্ধার পাব তা বলে দিন।" তখন সাধু বললেন, "বাছা তুমি কেঁদো না, গুপ্তধন তুমি ঠিকই পাবে। এখনো তুমি তার সন্ধান পাওনি, তবে তোমাকে সেই ধনলাভের কৌশল শিখিয়ে দেবো। এখন তুমি এক কাজ কর, তোমাকে আমি কিছু টাকা - পয়সা দিয়ে যাচ্ছি, তা দিয়ে মন্দিরের চূড়ো যেমনটি ছিল ঠিক তেমনি ভাবে তুমি গেঁথে তোলো। সময় মতো আবার আমার দেখা পাবে।" এই বলে সাধু চলে গেলেন। ঠিক এক বছর পর কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দ্বিপ্রহরের সময় সাধু আবার এসে উপস্থিত হলেন। যুবককে তিনি বললেন, "আচ্ছা বলো তো খাতায় ঠিক কী লেখা আছে? যুবকটি বলল, "খাতায় লেখা আছে, 'শিবমন্দিরের চূড়োয় বহু ধন রত্ন গাঁথা আছে। কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দিবা দ্বিপ্রহরে সেখানে খুঁড়লে সেই গুপ্তধন পাবে।" সাধু তখন হাসতে হাসতে বললেন — "বৎস খাতায় সব কিছুই ঠিকই লেখা আছে। মাটিতে মন্দিরের চূড়োর ছায়া যেখানটায় পড়েছে সেই জায়গাটা খোঁড়ো দেখি।" সেই জায়গার মাটি খোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তধনের সন্ধান মিলে গেল। এই গল্পের তাৎপর্য হলো যে ব্যাস, বশিষ্ঠ ঋষিরাই হলেন আমাদের বাপ-ঠাকুরদা। আমাদের কল্যাণের জন্য শাস্ত্ররূপী খাতার পাতায় পাতায় তাঁরা আত্মধনের সন্ধান দিয়ে গেছেন। কিন্তু তা সব মানুষের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। একমাত্র সাধু মহাত্মারাই শাস্ত্রের যথার্থ উপলব্ধি করতে পারেন। একমাত্র ভাগ্যবান ব্যক্তি সদ্‌গুরু লাভ করে। গুরু সেই শাস্ত্রের বাক্যই বলবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই শাস্ত্রবাক্যের মর্ম উপলব্ধির কৌশলটি বলে দেবেন। শাস্ত্র হল সমুদ্র, গুরু হলেন সূর্য। সমুদ্রের জল লবণাক্ত বলে পান করা যায় না। সূর্য সমুদ্রের জল আকর্ষণ করে নেয়, তারপর সেই জল যখন বৃষ্টি হয়ে ঝরতে থাকে, তখনই তা সুস্বাদু হয় এবং তা পান করে মানুষের তৃষ্ণা মেটে। ঠিক তেমনিভাবে একমাত্র শ্রীগুরুর

মুখনিঃসৃত শাস্ত্রবাণী ভক্তশিষ্যকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়।

পণ্ডিত মহাশয় এই সৎসঙ্গ শুনে খুব প্রসন্ন হলেন ও ভক্তিভরে শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজকে প্রণাম করলেন।

সপ্তম পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম ঃ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন মাস ঃ সময়-সকাল

রাজসভাপতি শিবরাজ সিং

ও

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[আধার অনুযায়ী গুরু প্রদত্ত মন্ত্রের ফল হয় ঃ প্রকৃত শিষ্য কে, প্রকৃত গুরু কে ঃ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ ঃ অন্তর নিবৃত্তি বাহার প্রবৃত্তি ঃ রাজা ও মহারাজা-এ দু'এর পার্থক্য]

লক্ষ্মণপুর নিবাসী সূর্যবংশীয় যুবরাজ ভ্রমর দত্ত সিং নিজের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শিবরাজ সিংকে শ্রীশ্রী গুরুমহারাজের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, মহারাজজী যেন লক্ষ্মণপুরে এসে যুবরাজকে দীক্ষা দেন।

শিব ঃ মহারাজ, আপনাকে আমার সঙ্গে লক্ষ্মণপুরে যেতে হবে।

শ্রীশ্রী গুরু ঃ ভাই, আমি আর যাতায়াত করতে পারি না। এই বৃদ্ধ শরীরটা আর যাতায়াত করার অবস্থায় নেই।

শিবরাজ সিং অনেক মিনতি করার পর বললেন —

শিব ঃ মহারাজ, আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য যুবরাজ দত্ত সিং আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। দীক্ষা নেবার জন্য তিনি খুব পিপাসিত হয়ে পড়েছেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, যখন তাঁর পিপাসা পেয়েছে, তখন তাঁকেই তো জলের পাশে আসতে হবে। তৃষ্ণা পেলে তৃষ্ণাই যাবে জলের কাছে, জল কেন এগিয়ে যাবে তৃষ্ণার কাছে?

শিব ঃ যুবরাজকে এখানে আসবার জন্য আমি তাঁকে খবর পাঠাচ্ছি।

শ্রীশ্রী গুরু ঃ কোন শুভ দিন দেখে তবেই যুবরাজকে খবর পাঠিয়ো। ভাল নক্ষত্র বিচার করে তবেই তাঁর দীক্ষা হবে। দেশ কাল পাত্র ঠিক ঠিক হলে তবেই দীক্ষার সুফল ফলবে। দেশ স্থির হলো কালও স্থির হলো তারপর পাত্রও উপযুক্ত কি না তা দেখতে হবে। স্বাতী নক্ষত্রের জল যে রকম আধারে পড়ে, সেরকম ফল দিয়ে

থাকে। ভাল আধারে পড়লে ভাল ফল দিয়ে থাকে, আর খারাপ আধারে পড়লে খারাপ ফল দেয়। অন্য সব নক্ষত্রের জলের এই গুণ নেই। স্বাতী নক্ষত্রের জল যদি কলায় পড়ে তবে হবে কর্পুর, বাঁশে পড়লে হয় বংশলোচন, হাতীর মাথায় পড়লে হয় গজমোতি, গরুর শিং-এ পড়লে গোরোচণ হয়, ঝিনুকে পড়লে মুক্তো হয় আর সাপের মাথায় পড়লে ভীষণ বিষের সৃষ্টি হয়। যেমন আধার তার তেমন ফল।

মৈমনসিংহের আঠার বাড়ির জমিদার প্রমোদরঞ্জনবাবু ও তাঁর ম্যানেজার অশ্বিনীকুমার বাবু সেখানে বসেছিলেন। তাঁরা বললেন, "মহারাজ, আপনার এই স্বাতী নক্ষত্রের জলের উপদেশের মধ্যে আমাদের এক প্রশ্ন ছিল, তার মীমাংসা এখন হয়ে গেল।" তা শুনে শ্রীশ্রী গুরু মহারাজ বললেন, "কীভাবে তোমাদের প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল তা আমাকে বল।"

প্রমোদ ঃ মহারাজ, আপনার এক এটর্ণী শিষ্য আমাদের বেশ কিছু টাকা ফাঁকি দিচ্ছেন। আপনার শিষ্য বলে আমরা তাঁর বিরুদ্ধে এখনো কিছু করছি না। মনে হচ্ছে, আপনার প্রদত্ত ব্রহ্মমন্ত্র তার কর্ণে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু ভাল ফল হয় নি। গুরু মহারাজের দোহাই দিয়ে এই এটর্ণী শিষ্যটি জুয়াচুরি করছেন। এ থেকে মনে হয় যে, তার ভিতর ব্রহ্মমন্ত্র প্রবেশ করেছে বটে, তবে তাঁর আধার সর্পজাতীয়। যেমন স্বাতী নক্ষত্রের জল সাপের মাথায় পড়লে ভীষণ বিষ সৃষ্টি হয়, তেমনি এক্ষেত্রে এটর্ণী শিষ্যটির কর্ণে প্রবিষ্ট ব্রহ্মমন্ত্রের ফল বিষবৎ খারাপ হয়েছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ তুমি যে কথাটি বলেছ তা একেবারে ঠিক। আধার অনুযায়ী ফল ফলবে। এ সম্পর্কে তোমাকে একটা গল্প বলছি, যা শুনলে বুঝতে পারবে যে, আমার সব শিষ্য প্রকৃত শিষ্য নয়।

এক গুরুদেবের অনেক শিষ্য ছিল। একদিন তাঁর চিন্তা হলো —এত যে শিষ্য করলাম, এদের পাপ পুণ্যের বোঝা তো আমাকেই বহন করতে হবে। তাহলে তো আমার দুর্দশার অন্ত থাকবে না। তখন তিনি এক মহাত্মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আমার যে এত শিষ্য, এদের সকলের পাপ - পুণ্যের ভার কী আমার উপরেই পড়বে?" প্রশ্ন শুনে ওই মাহাত্মা হেসে বললেন, "এই যে এত শিষ্যের কথা বলছেন, এরা সবাই কি আপনার শিষ্য? তা হতে পারে না। এই শিষ্যদের মধ্যে প্রকৃত শিষ্য আপনি এক আধজনের বেশি পাবেন না। আপনি একবার পরীক্ষা করে দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন প্রকৃত শিষ্য কজন। তাদেরই পাপ - পুণ্যের বোঝা আপনাকে বহন করতে হবে।"

একদিন গুরুদেব শিষ্যদের ডেকে বললেন, "আমার পায়ে এক ভয়ানক বিষাক্ত ফোড়া হয়েছে, আমি আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।" এই বলে তিনি বাপরে মারে বলে চীৎকার করতে লাগলেন। তাই দেখে শিষ্যরা ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল, "গুরুদেব আপনি বলুন — কি করলে আপনার এই দারুন ফোড়া সারবে, আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করব।" গুরুদেব বললেন, "এ বিষাক্ত ফোড়া সারবার নয়, তবে কেউ যদি মুখ দিয়ে ফোড়াটা চুষে নিতে পারে, তবেই এটা সারবে। তবে যে চুষবে তার প্রাণ চলে যাবে।" একথা শুনেই শিষ্যদের মুখ শুকিয়ে গেল। তখন কেউ বলল, "বাবা, ঘরে আমার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে রয়েছে, আমি মারা গেলে ওরা না খেতে পেয়ে মরবে।" কেউ বলল "আমার স্ত্রী রয়েছে তাকে কে দেখবে?" আবার কেউ বলল, "আমি মারা গেলে আমার বৃদ্ধ মায়ের খাওয়া - পরার ব্যবস্থা কে করবে?"

গুরুদেব তাঁর গরু চরাবার জন্য এক রাখালকে রেখেছিলেন। গুরুজীর অসুখের কথা শুনে সেই রাখাল কাঁদতে কাঁদতে সকলকে বলল "আমাকে একবার গুরুদেবের কাছে যেতে দাও।" সব শিষ্যরা তাকে বকতে লাগল আর বলল, "আরে, তুই কি পাগল হলি নাকি। দেখছিস না গুরুদেব অসুস্থ, আর তুই কি না তাঁর কাছে যেতে চাস? ও সব এখন হবে না। দূর হয়ে যা এখান থেকে।" রাখাল আর কী করে, কাঁদতে কাঁদতে দূর থেকেই 'গুরুদেব গুরুদেব' বলে চীৎকার করতে লাগল। চীৎকার শুনে গুরুদেব তখন রাখালকে কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হয়েছে রে? তুই কাঁদছিস কেন?" রাখাল বলল, "আপনার যে বিষাক্ত ফোড়া হয়েছে তা আমি চুষব।" গুরুদেব বললেন, "আরে না না, ওই ফোড়া চুষলে তুই যে মারা যাবি।" রাখাল কোন কথা শুনল না, সে বলল, "আপনার জন্য আমার প্রাণ যাক তাতে ক্ষতি নেই। আপনি তো ভাল হয়ে যাবেন। এই বলে রাখাল ফোড়ার উপর থেকে কাপড় সরাতে গেল। গুরুদেব তাতে বাধা দিয়ে বললেন, "কাপড় সরাবার দরকার নেই, তুই কাপড়ের উপরেই কামড়ে ফোড়াটা চুষে নে।" গুরুদেবের কথামতো রাখাল তাই করল আর ফোড়া চুষতে চুষতে বলল, "গুরুদেব আপনার ফোড়ার পুঁজ কী মিষ্টি।" গুরুদেব তখন বললেন, "আরে, ওটাই তো বিষ, তুই যে এখনি মরবি।" আসলে গুরুদেবের তো ফোড়া হয়নি, শিষ্যদের পরীক্ষা করবার জন্য পায়ে একটা পাকা আম তিনি কাপড় দিয়ে বেঁধে রেখে ছিলেন। রাখাল সেই আমটি চুষে খেয়ে নিল। গুরুদেব তখন বুঝতে পারলেন যে, রাখালই হল তাঁর একমাত্র

প্রকৃত শিষ্য। শুধু এরই পাপ-পুণ্যের ভার বহন করতে হবে। আর এই যে সব বড় বড় শিষ্য, এরা আমার প্রকৃত শিষ্য নয়, এরা সব নামধারী শিষ্যমাত্র।

ভাই প্রমোদ, তুমি জেনে রাখ, ওই এটর্ণীবাবু আমার প্রকৃত শিষ্য নয়। গুরু কে? হিতোপদেষ্টাই গুরু। শিষ্য কে? যিনি গুরু - ভক্ত তিনিই শিষ্য। প্রকৃত গুরু কে? যিনি হিত অর্থাৎ মঙ্গলজনক উপদেশ দেন তিনিই প্রকৃত গুরু। আর প্রকৃত শিষ্য কে? যার গুরুর প্রতি ভক্তি আছে সে-ই প্রকৃত শিষ্য। দেখো, ভাই প্রমোদ, কানে মন্ত্র পড়লেই যে শিষ্য হয়ে যাবে তা কিন্তু নয়। মন্ত্র নেবার পর যে শিষ্য ভাল কাজ করবে, শুভ কাজ করবে, গুরু - ইষ্টকে ভক্তি করবে, সে-ই তো প্রকৃত শিষ্য। তা না হলে উল্লিখিত গল্প অনুযায়ী শিষ্যদের পরীক্ষা দিতে হলে তারা সব পালিয়ে যাবে। দু-একজন রাখালের মতো শিষ্য পাওয়া যাবে যে বা যারা গুরুদেবের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত। ভাই প্রমোদ, তুমি যে কোন উপায়ে এটর্ণী বাবুর কাছ থেকে টাকা আদায় করে নাও। শাস্ত্রে বলা হয়েছে-'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ?'। যে ব্যক্তি শঠ প্রবঞ্চক, তার সঙ্গে শিষ্ট অর্থাৎ মার্জিত ব্যবহার করবে না। তা না হলে তোমার পক্ষে টাকা আদায় করা মুস্কিল হয়ে যাবে। তুমি হলে সাত্ত্বিক পুরুষ। তাই তোমাকে দিয়ে রজোগুণী ও তমোগুণী কাজ হবে না। সাত্ত্বিক পুরুষের দ্বারা কখনও মন্দ কাজ হয় না। সমাজে তিন শ্রেণীর মানুষ আছে — সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। দেবশ্রেণীর মানুষ সাত্ত্বিক হয়, মনুষ্যশ্রেণীর মানুষেরা রাজসিক আর পশুশ্রেণীর মানুষেরা তামসিক হয়। পাপ পুণ্য কর্মের বিচারে এই তিন শ্রেণীর মানুষ বিভক্ত হয়েছে। যার পুণ্য অধিক পাপ কম সেই ব্যক্তির শরীর দেব শ্রেণীর, যার পাপ ও পুণ্য সমান তার শরীর মনুষ্য শ্রেণীর। যার পাপ অধিক পুণ্য কম, সেই ব্যক্তির শরীর পশু শ্রেণীর। সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে এমন সব ভয়ানক জানোয়ার আছে যারা সিংহ ব্যাঘ্র সর্পাদির চেয়েও অধিক হিংস্র। দেবশ্রেণীর মানুষেরা তাদের মতো মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে, মনুষ্য শ্রেণীর মানুষ তাদের মতো মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে আর পশুশ্রেণীর মানুষ সগোত্রের মানুষের সঙ্গে মেশে। কিন্তু দেবশ্রেণীর মানুষের পক্ষে পশুশ্রেণী মানুষের সঙ্গে মেশা সম্ভব নয়। ভাই প্রমোদ, তুমি হলে সাত্ত্বিক পুরুষ অর্থাৎ দেবশ্রেণীর মানুষ। তোমার পক্ষে মাথা গরমের কাজ (মারপিট, গালমন্দ ইত্যাদি) করা সম্ভব নয়। তবে তোমাকে বাইরে গরমভাব দেখাতে হবে। এ সম্পর্কে একটি কথা প্রচলিত আছে ঃ-

"হাকিম হোগা গরম কি, দোকানদার হোগা নরম কি, বহু-বেটী হোগী সরম

কি।"

হাকিম যদি গরম (গম্ভীর) না হয়, তাহলে তাকে কেউ মানবে না, দোকানদার যদি নরম প্রকৃতির না হয় তাহলে তার কাছে কেউ যাবে না। বউ-মেয়েরা যদি লজ্জাশীলা না হয়, তবে তাদের ঠিক মানায় না। দেখ ভাই প্রমোদ, তোমাকে কিছুটা গরম হতে হবে, তবে ভিতরে নয়, বাইরে। "অন্তর নিবৃত্তি বাহার প্রবৃত্তি" অন্তরে তুমি মনকে ইষ্টধ্যানে মগ্ন কর আর বাইরে ব্যবহারিক কাজে প্রবৃত্ত হও। এটাই ঠিক।

প্রমোদ ঃ মহারাজ, কাউকে দুঃখ দিলে আমারও খুব দুঃখ হয়। এই জন্যে আমি গরম হতে পারি না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, এ সম্পর্কে একটি গল্প বলছি শোন—এক ব্যবসায়ী অনেক লোহা কিনে রেখেছিল, কিন্তু লোহার দাম হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় সে লোহা বিক্রি করতে পারল না। ঠিক সেই সময় কোন কাজে তাকে একবার বিদেশ যেতে হল। বিদেশ যাবার আগে সে তার সমস্ত লোহা এক বন্ধুর কাছে রেখে দিয়ে বলল, "ভাই, এগুলো এখন তোমার কাছে থাক, আমি বিদেশ থেকে ফিরে এসে তোমার কাছ থেকে লোহাগুলো নিয়ে যাব।" ওই ব্যবসায়ী যখন বিদেশে সেই সময় লোহার দাম খুব বেড়ে গেল। সেই বন্ধুটি সুযোগ বুঝে সব লোহা বিক্রি করে দিল। বিদেশ থেকে ফিরে এসে ব্যবসায়ী যখন বন্ধুর কাছ থেকে লোহা ফেরৎ চাইল, তখন বন্ধু তাকে বলল, "ভাই, সে লোহা তো নেই, সব ঘুণে খেয়ে ফেলেছে।" বন্ধুর কারসাজি বুঝতে ব্যবসায়ীর আর বাকি রইল না। সে তখন রাজার কাছে গিয়ে বন্ধুর নামে নালিশ করল। রাজা তখন বন্ধুকে ডাকিয়ে বলল, "তুমি এর লোহা ফেরৎ দিচ্ছ না কেন?" বন্ধু তখন রাজাকে বলল, "ব্যবসায়ীর লোহা আমার কাছেই ছিল, কিন্তু সমস্ত লোহা ঘুণে খেয়ে ফেলেছে।" সে দেশের রাজা ছিল ভিল, বুদ্ধি ছিল তার ভোঁতা। ঘুণে লোহা খেয়েছে এটা রাজা সহজেই বিশ্বাস করে নিল। তাই রাজার বিচারে বন্ধুর কোনো শাস্তি হল না। কিছু দিন পর ব্যবসায়ী দেখতে পেল বন্ধুর বাড়ির সামনে তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে খেলা করছে। সে তখন ছেলেটিকে ধরে এনে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখল। বন্ধুটি অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ছেলেকে না পেয়ে রাজার কাছে ব্যবসায়ীর নামে নালিশ জানাল, রাজদরবারে ব্যবসায়ীর ডাক পড়ল। রাজা জিজ্ঞাসা করল, "এর ছেলেকে তুমি লুকিয়ে রেখেছ?" ব্যবসায়ী বলল, "না রাজা আমি লুকিয়ে রাখিনি, তবে আমি দেখেছি একটা চিল ছোঁ মেরে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল।" এই কথা শুনে রাজা বলল, "তা কী করে হয়?

শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী

চিল একটা ছেলেকে নিয়ে যেতে পারে আজি?"

তখন ব্যবসায়ী বলল ঃ-

"ম্যায়সে কি ত্যায়সে মিলা গুন্‌রে রাজা ভিজ,
লোহেকো ঘুণ খা গিয়া, লেড়্‌কা লে গিয়া চিল।"

অর্থাৎ ঘুণ যদি লোহা খেতে পারে, তাহলে চিলও ছেলেকে নিয়ে যেতে পারে। এর তাৎপর্য হল - শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। শঠ ব্যক্তির সঙ্গে শঠতা না করলে তাকে দাবিয়ে রাখা যাবে না, তার সাহস বেড়ে যাবে। ফলে আরও শঠতা বাড়তেই থাকবে। সুতরাং দাবিয়ে রাখার জন্য শঠের সঙ্গে শঠতা করতে হবে।

ইতিমধ্যে ম্যানেজার শিবরাজ সিং বললেন, "গুরু মহারাজ, দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন — রাজা আপনার কাছে দীক্ষা নিতে আসবেন, না আপনি দীক্ষা দিতে রাজার কাছে যাবেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ আমি কেন যাব? রাজার কাছে আমার কী কাজ? নিস্পৃহস্তৃণবৎ। যিনি নিস্পৃহ তাঁর কাছে জগৎ তৃণবৎ। সুতরাং আমার তো কোন প্রয়োজন নেই। রাজাকেই তার প্রয়োজনে আমার কাছে আসতে হবে। এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ আছে-

একটি রাজা গঙ্গা স্নানের জন্য বের হয়েছেন। তাঁর হাতী ঘোড়া, সিপাই শাস্ত্রী এগিয়ে চলেছে। রাস্তায় খুব ভীড় হয়েছে, লোক চলতে পর্যন্ত পারছে না। ওই রাস্তায় এক সাধু মহাত্মা ধুনি জ্বেলে বাঘছালের ওপর বসে আছেন। তাঁকে সিপাইরা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে? এখান থেকে হটে যাও। এই পথ দিয়ে রাজা আসছেন।" সাধু কিছু জবাব না দিয়ে বসেই রইল। তখন সিপাইরা রাজার কাছে গিয়ে বলল, "সামনে এক সাধু রাস্তার উপর বসে আছে। বলা সত্ত্বেও কিছুতেই চলে যাচ্ছে না। তাই আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারছি না।" তখন রাজা নিজেই ওই সাধুর কাছে গেলেন। সাধু রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন - তুমি কে? রাজা বললেন, "আমি এই দেশের রাজা।" তখন সাধু বললেন, "আমি একজন মহারাজ।" রাজা বললেন, "আপনি মহারাজ! আপনার টাকা পয়সা কোথায়?" সাধু বললেন, আমার কোন ব্যয় নেই, টাকা পয়সায় আমার কী কাজ?" তখন রাজা বললেন, "আপনি তো মহারাজ, তা আপনার ফৌজ কোথায়?" সাধু বললেন, "আমার তো কোন শত্রু নেই, তাই ফৌজ রেখে কি হবে?" রাজা তখন বললেন, "আপনি তো মহারাজ, আপনার রাজ্য কোথায়?" সাধু বললেন, "আমার রাজ্য চারদিক জুড়ে রয়েছে।

ওহে রাজা, তুমি একটি মাত্র দেশের রাজা, আমি যেখানে সেখানে যাই সেটাই আমার রাজ্য, তাই তো আমি মহারাজা।

দেখ ভাই শিবরাজ সিং, এই উদাহরণের কথোপকথনের মধ্য দিয়েই তোমার প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে। তোমার রাজা শুধু রাজা মাত্র, আমি কিন্তু হলাম মহারাজা। ওনার দরকার পড়লে উনি আমার কাছে আসবেন। আমার তো রাজার কাছে যাওয়ার দরকার নেই। কেনই বা আমি যাব?

এই উদাহরণ শুনে শিবরাজ সিং খুব খুশি হয়ে বললেন, "মহারাজ, আপনাকে যেতে হবে না। রাজা সাহেব আপনার চরণ কমলে স্মরণ নেবার জন্য আপনার কাছেই আসবেন।"

অষ্টম পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম ১৩৩৭বঙ্গাব্দ, ফাল্গুন মাস, সময় ঃ সকাল
বৈদ্যনাথের পাণ্ডাগণ ও শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ
[জীবনের যা কিছু চাওয়া ও কাজকর্ম সবই ঈশ্বর কেন্দ্রিক হওয়া দরকার ঃ অচল বৈদ্যনাথ ও সচল বৈদ্যনাথ]

পাণ্ডাগণ এসে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রী গুরু ঃ তোমরা দুর্গামন্দিরে কীর্তন করছো তো?

পাণ্ডা ঃ না বাবা, রোজ দিন কীর্তন হয় না? তবে সন্ধ্যের সময় আমরা যে একটা সঙ্গীত বিদ্যালয় করেছি, সেখানেই আমরা বসি।

শ্রীশ্রী গুরু ঃ সেখানে তোমরা কিসের চর্চা করে থাক?

পাণ্ডা ঃ ওখানে আমরা গান বাজনা করে থাকি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, ওখানে কিছু ঈশ্বর সম্পর্কীয় চর্চা বা আলোচনা হলে ভাল হয়। তোমরা হলে তীর্থ-গুরু। তোমরা যদি সাত্ত্বিকভাবে ভাবিত থাকো তাহলে তোমাদের কাছে যে সব যাত্রীরা আসবে তাদেরও সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হবে, তারা শান্তি পাবে।

পাণ্ডা ঃ বাবা, আমরা যে সব গান বাজনা করে থাকি তা সবই ঈশ্বরকেন্দ্রিক।

শ্রীশ্রী গুরু ঃ ভাই, যে পথে যাও না কেন ঈশ্বরকে ছেড়ে যেও না। এই সম্পর্কে একটি প্রচলিত বচন আছে -

"জীয়া যদি চাহো তো, জীবনকো রক্ষা করোরে,
ধন যদি চাহো তো, ধর্মকো বাড়াওরে,
নাচা যদি চাহো তো, নাচ গোবিন্দকি আগে,
গায়া যদি চাহো তো, রাম গুণ গাওরে,
ভাগা যদি চাহো তো, ভাগ বুরা কর্মন্‌সে,
আয়া যদি চাহো তো, রাম শরণমে আওরে।"

- এই বচনের অর্থ হলো -(১) বাঁচতে যদি চাও, তবে জীবনকে রক্ষা কর অর্থাৎ নিজের জীবনকে যদি বাঁচাতে চাও, তবে কোন জীবকে হত্যা কোরো না, তাদের রক্ষা কর। (২) ধন সম্পদ যদি চাও, তাহলে ধর্ম বৃদ্ধি কর অর্থাৎ তুমি যদি ধন চাও, তবে ধর্ম পথে চল, ধর্মভাব বৃদ্ধি কর অর্থাৎ তাহলে ধন সম্পদ আপনা থেকেই আসবে। (৩) নাচতে যদি চাও তাহলে গোবিন্দজীর সামনে নাচো অর্থাৎ তোমার যদি নাচবার সখ হয়, তাহলে গোবিন্দজীর মন্দিরে তাঁর সামনে গিয়ে নাচো। (৪) গান গাইতে যদি চাও, তাহলে রামচন্দ্রের গুণ গান কর অর্থাৎ তোমার যদি গান গাইবার সখ হয় তবে ভগবান রামচন্দ্রের গুণগান কর। (৫) পালাতে যদি চাও, তবে খারাপ কাজ থেকে পালাও অর্থাৎ মন্দ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখো। (৬) আসতে যদি চাও তাহলে রামচন্দ্রের শরণে এসো অর্থাৎ ভগবান রামচন্দ্রের শরণাগত হও।

দেখো ভাই, তোমাদের যদি গান বাজনার সখ হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গান কর, তাহলে তোমাদের মঙ্গল হবে। তোমরা যদি টপ্‌পা গান কর, তাহলে তোমাদের রাজসিক ও তামসিক ভাব দেখা দেবে। কারোর যদি নাচবার সখ থাকে, তাহলে গোবিন্দজীর মন্দিরের সামনে নাচ কর, তখন তোমার মধ্যে, সাত্ত্বিকভাবের উদয় হবে। যে ওই নাচ দেখবে সে বলে উঠবে "আহা, বেশ সুন্দর নাচছে তো, ভগবানের সামনে কেমন নাচছে। নিজের লজ্জা শরম ছেড়ে দিয়ে কেমন ভগবানকে নাচ দেখাচ্ছে।" ওই নাচ যখন থিয়েটারে গিয়ে করবে তখন একই নাচ রাজসিক ও তামসিক হয়ে যাবে। যা কিছু কর না কেন সাত্ত্বিক ভাব বৃদ্ধি করাই আসল উদ্দেশ্য। আর এটাই তাৎপর্যপূর্ণ। ভাবকে উলটে দিতে হবে। যা কিছু কাজ যখন সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে হবে তখন সেই কাজ ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যাবে। আগের তুলনায় তোমরা এখন অনেক উন্নতি করেছ। আমি যখন প্রথম বৈদ্যনাথ ধামে আসি, তখন তোমরা এতটা উন্নতি করতে পারনি। আমার আসার পর দেওঘরে

অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ওই সব বিদ্যালয় থেকে ভাল ভাল বিদ্বান ছেলে বেরিয়ে এসেছে। এখন ধীরে ধীরে দেশের উন্নতি হচ্ছে। যে ভাবেই হোক উন্নতি করতে হবে। তারজন্যে চেষ্টা করতে হবে, যত্ন করতে হবে।

ওই স্থানে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। সব শুনে তিনি বললেন, "বাবা যখন আপনি এখানে আসেন নি তখন দেওঘরের কোন উন্নতি হয় নি। কারণ, বৈদ্যনাথজী অচল ও বোবা হয়ে আছেন আর আমাদের করণীবাদ আশ্রমে যে বাবাজী বসে আছেন, তিনি সচল বৈদ্যনাথ। তাঁর মধুর উপদেশ ও বাণীতে আমাদের তথা সকল দেওঘরবাসীদের বহু কল্যাণ হয়েছে, অনেক উন্নতি হয়েছে। বাবা, আপনি তো আমাদের সকলের কাছে সচল বৈদ্যনাথ হয়ে আছেন।

এই সৎসঙ্গ শুনে পাণ্ডাগণ "ব্যোম্‌শঙ্কর" বলে প্রণাম করে চলে গেলেন।

নবম পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম ঃ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ঃ ফাল্গুন মাস ঃ সময় ঃ সকাল
লক্ষ্মণপুরের চৌহান বংশীয় যুবরাজ ভ্রমর দত্ত সিং
ও
শ্রীশ্রী গুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[সব সাধনার মূলে শরীরের সাধন ঃ তার জন্যে প্রথমে হট যোগ, তারপর রাজযোগ
আয়ত্তকরণ ঃ- আধি ও ব্যাধি]

যুবরাজ শ্রী ভ্রমর দত্ত সিং দীক্ষা নেবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কাছে এসেছিলেন। রাজা শ্রীশ্রী গুরুমহারাজকে আগে কখনও দেখেন নি, কিন্তু রাজাকে খুব ভক্তিমান বলে বোঝা গেল। রাজা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজকে দর্শন মাত্রই তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের শ্রীচরণে মস্তক রেখে প্রণাম করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ রাজাকে খুব প্রীতি করে প্রশ্ন করলেন ঃ-

শ্রীশ্রী গুরুঃ -আচ্ছা বলতো এ কথার কী তাৎপর্য?
"এক সাধে, সব সাধে, সব সাধে, সব যায়,
যো কোই সিঞ্চে পেড়্‌মে ফল ফুল উপজায়।"
এমন কী বস্তু আছে যে, তার সাধনা করলে সব সাধনা হয়ে যায়?
রাজার ম্যানেজার শিবরাজ সিং বললেন —

শিবরাজ সিং ঃ মহারাজ, আমরা জানি না, আপনি বলুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখ ভাই, প্রথম সাধন হল শরীরের। শরীর ভাল না থাকলে কিছু ভালো লাগে না। তোমার শরীরের মধ্যে কষ্ট রয়েছে এমন অবস্থায় তোমার সামনে যতই প্রিয় বস্তু দেওয়া হোক না কেন তুমি বলবে, ও সব এনো না, আমার ভাল লাগছে না। ভাল ভাল খাবারের জিনিস তোমাকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তুমি বলবে, না খাব না। তোমাকে নানারকম খাবার দেওয়া সত্ত্বেও তুমি খেতে চাইছ না। তোমার প্রিয় পুত্র রয়েছে, তাকে তুমি প্রায়ই কোলে তুলে আদর করতে থাক। সেই পুত্রকে তোমার কোলে তুলে দেওয়া হল। তুমি বললে, একে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও, একে আমার কাছে আনবে না। কেন এমন হচ্ছে? যে পুত্র এত তোমার কাছে প্রিয় তাকে এখন কেন তোমার ভাল লাগছে না? এর কারণ হল, তোমার শরীর ভাল নেই। তোমার শরীরে কষ্ট রয়েছে। ফলে তোমার কিছুই ভাল লাগছে না। তোমার দ্বারা ধর্ম কর্ম কিছুই হবে না। শরীর ভাল থাকলে তখন সব কিছু ভাল লাগবে। ধর্ম কর্ম সবই হবে। শরীরের আরোগ্যের জন্য পাঁচটি সাধন আছে। যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার। এই পাঁচটি সাধন হল হটযোগের। ধ্যান, ধারণা ও সমাধি হল রাজযোগের সাধনা। এই অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনা করলে সব সাধনা হয়ে যায়। যমের সাধনা পাঁচটি — অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। অহিংসা অর্থাৎ কোন জীবকে হিংসা কোরো না। যদি তুমি জীব হিংসা ত্যাগ কর, তাহলে তোমারও কোন জীব থেকে ভয় থাকবে না। ধ্রুব পাঁচ বছরের বালক ছিল, ভগবানকে লাভ করবার জন্য সে গভীর জঙ্গলে গেল। সিংহ, বাঘ, ভল্লুক ইত্যাদি হিংস্র জানোয়ার কেউ তাকে খেয়ে ফেলল না। প্রশ্ন হল - কেন খেল না? ধ্রুবের কায়মনোবাক্যে অহিংসার সাধন হয়ে গিয়েছিল। ধ্রুবের কোন জীবের প্রতি হিংসা ছিল না। সেজন্য কোন জানোয়ারেরও তার প্রতি হিংসা ছিল না। সত্য অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে মিথ্যাকে ত্যাগ করতে হবে, মিথ্যা ভাষণ ত্যাগ করতে হবে। মিথ্যা চিন্তাও ত্যাগ করতে হবে। তবে এ ব্যাপারে একটা কথা মনে রাখতে হবে — সত্য বাক্য বললে যেন কোন প্রাণীর অপকার না হয় পরন্তু যেন উপকার হয়। এ বিষয়ে খেয়াল থাকা দরকার। এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ আছে ঃ-

এক ব্যক্তি বাড়ির রোয়াকে রাস্তার ধারে বসে ছিল। এমন সময় সে দেখল যে, তার সামনে দিয়ে একটি গরু আর তার পিছু পিছু এক কসাই ছুটে চলেছে। কসাই কিছুটা পেছিয়ে পড়ল। এমন সময় গরুটি প্রাণ ভয়ে ঐ ব্যক্তির ঘরে ঢুকে পড়ল।

একটু পরে কসাই এসে উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল—"ভাই, এখানে কোন গরুকে আসতে দেখেছ?" ওই ব্যক্তি সত্য কথা বললে গো হত্যা হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সত্য কথা বললে পাপ হবে, পুণ্য হবে না। এজন্য বহু বিচার করে সমস্ত প্রাণীর পক্ষে হিতকর ও প্রিয়জনক সত্য বাক্য বলতে হবে, তবেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর "অস্তেয়"। অশাস্ত্রপূর্বক কারোর দ্রব্য গ্রহণ করবে না। কারোর দ্রব্যের প্রতি স্পৃহাও যেন না থাকে। অচৌর্য সাধনে 'অস্তেয়' প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর "অপরিগ্রহ"। অর্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ ও হিংসা — বিষয়ে এই পাঁচটি দোষ দর্শনপূর্বক তা গ্রহণ না করলে তবেই অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্রহ্মচর্য হল 'বীর্য সংরক্ষণ'।

এই অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ- এই পাঁচটি সাধন হলেই 'যম' সাধন সিদ্ধ হবে। এরপর 'নিয়ম'। নিয়মেরও পাঁচটি সাধন আছে। যেমন শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর - প্রণিধান। শৌচ অর্থাৎ জল মৃত্তিকাদি দ্বারা যে শুচিতা, তা হল বাহ্য শৌচ। আর চিত্ত - মল ক্ষালন হল অভ্যন্তর শুচি। এই হলেই শৌচ সাধন প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রাণ ধারণের জন্য যেটুকু পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকাই হল সন্তোষ। এতেই সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর 'তপ'। তপ হল দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা। দ্বন্দ্ব কি? ক্ষুধা - পিপাসা, শীত - উষ্ণ প্রভৃতি সহ্য করাই তপ বা তপস্যা, তার জন্য কৃচ্ছব্রত, চান্দ্রায়ন প্রভৃতি ব্রত করতে হবে। তাহলেই তপ প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর 'স্বাধ্যায়'। মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা প্রণবাদি মন্ত্র জপ, ইত্যাদি করলেই 'স্বাধ্যায়' প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর 'ঈশ্বর-প্রণিধান'। সেই পরম গুরু পরমাত্মাদেবকে সর্বকর্ম সমর্পণ করার নামই ঈশ্বর-প্রণিধান। শয্যা বা আসনে স্থির হয়ে বসে অথবা চলতে ফিরতে সব সময় সব কাজে ঈশ্বরের স্মরণ মনন করতে হবে এবং সব কাজ ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হবে। তাহলেই 'ঈশ্বর প্রণিধান' প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এরপর হল আসন। উপবেশনের আসন হবে নিশ্চল ও সুখবহ। যথা —পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিকাসন ইত্যাদি। এই প্রকার আসনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থির সুখাসন হল পদ্মাসন। বাম উরুর উপর ডান চরণ আর ডান উরুর উপর বাম চরণ রেখে পিঠ সোজা করে রাখতে হবে অর্থাৎ বুক, গ্রীবা ও মাথা উন্নত রাখতে হবে। আসন স্থির হতে হবে — কোনভাবেই যেন শরীরে অস্থৈর্যভাব না আসে। তারপর প্রাণায়াম। শ্বাসগতি এবং প্রশ্বাসগতি রোধ করাই প্রাণায়াম। অস্থির চিত্তে প্রাণায়াম অভ্যাস করা মোটেই যোগের অঙ্গ নয়। মনকে নিয়েই সাধনার শুরু। মনের সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসরূপ প্রাণ বায়ুর গতির রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শরীরস্থ বায়ু যত ধীরে ধীরে

প্রবাহিত হবে মনও তত শান্তভাব ধারণ করবে। আবার মন যত স্থির হবে শরীরস্থ বায়ুও তত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হবে। প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তবেই 'প্রাণায়াম' প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর 'প্রত্যাহার'। মন বা চিত্তকে বাহ্য বিষয় থেকে সরিয়ে এনে ধ্যেয় বস্তুতে (ইষ্টদেবতা, গুরু, অবতার ইত্যাদি) স্থাপন করাই হল প্রত্যাহার। চিত্ত বা মন তখন অন্য বিষয়ে ধাবিত হয় না। "যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার - এই পাঁচটি হল হটযোগের সাধন। আর ধারণা - ধ্যান - সমাধি—এই তিনটি হল রাজযোগের সাধন। হট্‌যোগ হল বহিরঙ্গ সাধনা, আর রাজযোগ অন্তরঙ্গ সাধনা। ষট্‌চক্রের কোন একটি স্থানে যেমন হৃদয়, আজ্ঞাচক্র (ভ্রূযুগলের মধ্যে) ইত্যাদিতে মনের গতিকে নিরুদ্ধ করতে হবে, এটিই ধারণার কাজ। আধ্যাত্মিক দেশে চিত্তবৃত্তির বদ্ধ হওয়ার নামই ধারণা। ধারণা যখন গাঢ় হবে, তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন হবে, তখন ওই ধারণাই ধ্যানে পর্যবসিত হবে। এখানে তিনটি জিনিস আছে - ধ্যান, ধ্যেয় আর ধ্যাতা। আমি যে দেবতার ধ্যান করছি তিনি হলেন ধ্যেয়, আমি হলাম ধ্যাতা। আর ধ্যেয় বস্তুর প্রতি ধ্যাতার যে অবিচ্ছিন্ন ভাব, ওই ভাবই হল ধ্যান। সাধকের যখন একদম ধ্যেয় বস্তুর প্রতি তদাকার বৃত্তি আসবে, একদম আত্মহারা হয়ে যাবে এবং ধ্যেয় স্বরূপ ছাড়া আর কোন জ্ঞান থাকবে না, তখন ধ্যান প্রতিষ্ঠিত হবে। ওই ধ্যান সাধককে সমাধিতে নিয়ে যাবে। সমাধির লক্ষণ হল -"শান্ত-দান্ত-উপরতঃ-তিতিক্ষুঃ-সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি"। এই সকল গুণ যখন যোগীর মধ্যে দেখা দেবে তখন তিনি সমাধি লাভ করবেন। এতক্ষণ আমি অষ্টাঙ্গ যোগের কথা সংক্ষেপে বললাম। এ বিষয়ে পাতঞ্জল দর্শন ও যোগ শাস্ত্রে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা আছে। এই অষ্টাঙ্গ যোগের সাধনা করলে, যত রকমের সাধনা আছে সব সাধনাই হয়ে যায়।

এবার আমাদের যে প্রশ্ন ছিল, তার উত্তর এসে গেছে -

"এক সাধে সব সাধে,সব সাধে, সব যায়,
যো কোই সিঞ্চে পেড়্‌মে ফলে ফুলে উব্‌জায়।"

এই দোঁহা থেকে সিদ্ধান্ত হল — এক শরীরের সাধনা করলেই অন্য সব সাধনা সিদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ যদি গাছের গোড়ায় জল সিঞ্চন করে, তাহলে শাখা, পল্লব, ডালপালা, ফুল ফল ইত্যাদি যত কিছু আছে সবেতেই রস এসে যাবে। ওই গাছ ফুলে ফলে শোভিত হয়ে যাবে। আর যদি কেউ গাছে জল না দিয়ে ডালপালা ফুলে পাতায় যতই জল সিঞ্চন করুক না কেন, তাতে কোন কাজ হবে না। ঠিক সেরকম

সর্বপ্রথমে শরীরের সাধন সঠিক হওয়া চাই। তাহলে অন্য সব সাধন সিদ্ধ হয়ে যাবে।

শিবরাজ সিং ঃ বাবা, শরীরের থেকে মন তো আরও সূক্ষ্ম, তাহলে শরীরের সাধনের ওপর এত জোর দিচ্ছেন কেন? এর তাৎপর্য কী?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, তুমি ভালো প্রশ্ন করেছ। শরীরের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শরীর খারাপ হলে মন খারাপ হয়, আবার মন খারাপ হলে শরীর খারাপ হয়। দুটো শব্দ 'আধি' আর 'ব্যাধি'। শরীরের রোগকে ব্যাধি বলা হয়। আর মনের রোগকে আধি বলা হয়। একটি লোকের কোন রোগ নেই, এমন সময় খবর এল — দূরদেশে তার যে ছেলে থাকে, সে মারা গেছে। লোকটির শরীর তো ভালই ছিল, কিন্তু দুঃসংবাদ শোনার পর তার শরীরের বল বা শক্তি চলে গেল, হাত পা কাঁপতে লাগল। কেন এমন হোল? তার কারণ হল — মনের কষ্ট অর্থাৎ আধিতেই তার শরীরে রোগ বা ব্যাধি দেখা দিল। আবার এমনও হয় যে, মন ভালই আছে। এমন সময় কোন কারণে শরীরে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল, তখন মনে কষ্ট বা আধি দেখা দিল। শরীরে দুঃখ কষ্ট থাকলে তুমি স্বর্গের সুখভোগ আমার কাছে নিয়ে এলেও আমার মোটেই ভালো লাগবে না। তবে, প্রথমে শরীর যদি ঠিকঠাক থাকে, তাহলে সব কিছুই ঠিক থাকবে। যেমন সিঁড়ি — তুমি পাঁচতলায় ওঠো আর দশ তলাতেই ওঠো, তোমাকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে। তুমি লাফ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠবে তা তো হবে না। তবে একটা সিঁড়ি উঠলে অপর সিঁড়িটি কাছে এসে যাবে। সাধনাও ঠিক এরকম, একটির সাধন সিদ্ধ হলে অপরটির সাধন তোমার কাছে এসে যাবে। প্রথম ধাপ সিঁড়ি ছেড়ে তুমি পঞ্চম ধাপ সিঁড়িতে উঠবে — তা কিন্তু হবে না। তেমনি স্থূল শরীর ছেড়ে দিয়ে তুমি সূক্ষ্ম বিষয়ে চলে যাবে, তা হবে না। আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম সিঁড়ি হল শরীর। শরীর ঠিক রাখতে হলে হটযোগ অভ্যাস করতে হবে। হটযোগ আয়ত্ত হলে পরবর্তী ধাপ রাজযোগ সহজসাধ্য হয়ে যাবে।

এদিনের সৎসঙ্গ শুনে সকলেই খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং অষ্টাঙ্গ যোগের এরূপ সরলভাবে চুম্বক ব্যাখ্যা শুনে সকলের মনে আনন্দের ভাব এসেছিল। রাজা সাহেব আর শিবরাজ সিং দুজনে টুপি খুলে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের চরণে প্রণাম করলেন। করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুদেব মাথায় হাত রেখে মধুর হাসি হেসে আশীর্বাদ করলেন। শ্রীগুরুদেবের তখনকার ভাব দেখে মন একেবারে যেন গলে গেল, মনে হল গুরুদেব যেন কত আপনার লোক। সে যে কি এক অনির্বচনীয় মিষ্ট ভাব মনে হয়েছিল, তা কেবল অনুভূত হয়, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না।

দশম পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম ঃ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ফাল্গুন মাস, সময় - সকাল

লক্ষ্মণপুরের রাজা সাহেব ও শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[মনুষ্যজীবনই শ্রেষ্ঠ, এই জীবন মোক্ষ বা মুক্তির দ্বার ঃ ঈশ্বর আছেন অন্তরে ঃ জীব ব্রহ্মই ঃ বিচার করতে করতেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হবে ঃ চঞ্চল মনকে স্থির করার উপায়]

লক্ষ্মণপুরের রাজার সঙ্গে তাঁর ম্যানেজার শিবরাজ সিং এসেছিলেন। দুজনেই প্রণাম করে বসার পর শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ বললেন –

শ্রীশ্রীগুরু ঃ শিবরাজ সিং, আপনি বলুন তো ঈশ্বরের সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বস্তু কোন্‌টি?

শিব ঃ স্বামীজী, আপনার মুখারবিন্দ থেকে আমি শুনব। আপনি বলুন – ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু কোন্‌টি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ মনুষ্যজীবনই সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু। কেন তাকে শ্রেষ্ঠ বস্তু বলে মনে করি? এই যে মনুষ্য জীবন – এটি হল মোক্ষ বা মুক্তির দ্বারস্বরূপ। এই দরজা দিয়ে মানুষ ভূলোক, স্বর্গলোক, জনলোক, তপলোক, মহলোক, সত্যলোকেও যেতে পারে। একদম মোক্ষ লাভ করতেও সমর্থ হয়। এই যে মনুষ্যজীবন, এই জীবনে কর্মের উপার্জন হয়, কিন্তু স্বর্গ ইত্যাদি লোকে যে দেবতারা থাকেন সেখানে তাদের কিছুই উপার্জন হয় না। মর্ত্যলোক হল কর্মভূমি, স্বর্গ আদি লোক হল ভোগভূমি। এই মর্ত্যলোকে মনুষ্যজীবনে শুভ কর্মদ্বারা পুণ্য অর্জন হয় আর তার প্রভাবে দেব যোনি লাভ করে স্বর্গ আদি ভোগ করা যায়। ক্রমে সেই পুণ্যের ফল ক্ষীণ হলে দেবযোনিতে আর থাকা চলে না, স্বর্গ থেকে আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। ("ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি") দেবতারাও মর্ত্যলোককে আর মনুষ্য জীবনকে শ্রেষ্ঠ বলে মানেন। কেন মানেন? মানেন এই কারণে যে, মানুষ সাধনার বলে ভগবানকে পর্যন্ত লাভ করতে পারে, একেবারে মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করতে পারে। দেবতারা তা পারেন না, তাঁরা ভোগভূমিতে যান, স্বর্গ আদি ভোগ করেন, পুণ্য ক্ষয় হলেই সেখান থেকে তাঁদের নেমে আসতে হয়। সৃষ্টি কর্তা যে ব্রহ্মা, পুণ্যক্ষয় হলে তাঁরও পতন হয়। অন্য দেবতার আর কথা কী? এক মোক্ষলাভ হলে অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না, আর সেটা সম্ভব হয় একমাত্র এই মনুষ্যজীবনে। এই জীবন মোক্ষের দ্বার। এই দ্বার ছেড়ে গেলে আবার চুরাশি লক্ষ যোনি পার হয়ে আসতে হবে। তাই খেয়াল রাখবে যে মোক্ষের দ্বারে তুমি এসে

গেছ - এই দরজা যেন ছেড়ে না যায়। এই সম্পর্কে একটি গল্প বলছি শোন, এটি শুনলে আমি যা বলতে চাইছি তা বুঝতে পারবে।

দুজন অন্ধ লোক ছিল। তারা বলাবলি করছিল – দেখ ভাই, আমরা অন্ধ। আমাদের খাবার জুটছে না। চল, আমরা শহরে যাই, সেখানে গেলে আমাদের খাওয়ার কষ্ট ঘুচবে। এই ভেবে তারা একজন লোককে বলল, "ভাই, আমরা শহরে যাব। তুমি আমাদের শহরে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দেবে? লোকটি তখন সেই দুই অন্ধকে শহরে পৌঁছে দিয়ে এল। কিন্তু শহরে এসে তাদের দুর্দশা আরও বেড়ে গেল। তারা তো অন্ধ, চোখে কিছুই দেখতে পারে না। এদিক থেকে গাড়ি আসে, ওধার থেকে মানুষ এসে গায়ে পড়ে। এখানে ঠোক্কর খায়, ওখানে ঠোক্কর খায়। বড় মুস্কিলে পড়ল তারা। তাদের কষ্টের সীমা রইল না। এই ভাবে নাজেহাল হবার পর তারা শহর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যাকে সামনে পায়, তাকেই জিজ্ঞাসা করে, "ভাই এই শহর থেকে কীভাবে বেরুনো যায়?" কেউ বলে ওদিকে যাও, কেউ বলে সেদিকে যাও। এরা তো অন্ধ, তাই কোন্‌দিকে যাবে কিছুই বুঝতে পারল না। এমন সময় তাদের সঙ্গে এক মহাত্মার দেখা হয়ে গেল। তারা কাঁদতে কাঁদতে সেই মহাত্মাকে বলল, "বাবা, আমরা অন্ধ। আমরা এই শহরের মধ্যে এসে পড়েছি, এখন এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই, কিন্তু রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিনে। আপনি যদি শহর থেকে বেরুবার রাস্তা দেখিয়ে দেন, তাহলে আমরা শহর থেকে বেরিয়ে যেতে পারি।" মহাত্মা তাদের বললেন, "বেশ, রাস্তা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। এই শহরের চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সেই প্রাচীরের গায়ে বাইরে বেরুবার একটি মাত্র দরজা আছে। তোমরা তো অন্ধ, এই দরজা তোমরা দেখতে পাবে না। তবে একটা উপায় আছে। আমি তোমাদের প্রাচীরের গা ধরিয়ে দিচ্ছি। সেই প্রাচীরের গায় হাত রেখে তোমরা এগিয়ে যেতে থাকো। যেতে যেতে যেখানে ফাঁক পাবে, সেখান দিয়ে তোমরা বেরিয়ে যেয়ো। তবে দেখ ভাই, প্রাচীর থেকে হাত সরিয়ে নিও না যেন, তাহলে কখন যে দরজা পেরিয়ে যাবে তা বুঝতে পারবে না। বাইরে যাবার ওই একটিই দরজা। একবার যদি দরজা পেরিয়ে যাও তাহলে আবার এই শহরের মধ্যে তোমাদের ঘুরপাক খেয়ে মরতে হবে।" মহাত্মার উপদেশ মতো দুই অন্ধ তখন প্রাচীরের গায়ে হাত রেখে এগিয়ে যেতে লাগল।

দুই অন্ধেরই কোমরে ছিল দাদ। দুজনেই দাদ চুলকোতে শুরু করল। একজন অন্ধ তো প্রাচীর থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে দুহাত দিয়েই দাদ চুলকোতে লাগল। এর

ফলে বেরুবার দরজাও তার নাগালের বাইরে চলে গেল। সে আবার শহরের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। আর এক অন্ধ ছিল বুদ্ধিমান। সে একহাত প্রাচীরে রেখে অন্য হাত দিয়ে দাদ চুলকিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রাচীরের যেখানটায় ফাঁক ছিল সেখানে যেমনি হাত পড়া অমনি সে সেই ফাঁক দিয়ে শহরের বাইরে চলে গেল। এর তাৎপর্য হল যে, জীব হল অন্ধ, তাকে এই দেহরূপ নগরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলি অনবরত তাকে খোঁচা মারছে; ফলে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সে কেবল ঠোক্কর খেয়ে মরছে, অন্ধ জীবের আর শান্তি মিলছে না। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয় তবে সদ্‌গুরুর দর্শন মেলে। সদ্‌গুরুই বলে দেন যে, এই মানবজীবনই হল মোক্ষের দ্বার অর্থাৎ মুক্তি লাভের দরজা। এই জীবনেই মুক্তি লাভ সম্ভব। তবে বিষয় বাসনা মানুষকে ছাড়তে চায় না, দাদের চুলকুনির মতো তা মানুষকে অস্থির করে তোলে। যে বোকা সে প্রাচীর ছেড়ে দিয়ে অর্থাৎ ভগবানকে ভুলে বিষয়রূপ দাদ চুলকে অস্থির হয়ে পড়ে। যে চালাক, সে এক হাত দিয়ে দেয়ালটি অর্থাৎ গুরুর উপদেশ আঁকড়ে ধরে থাকে আর অন্য হাতটি দিয়ে দাদ চুলকোয় অর্থাৎ বিষয় ভোগ করে। দেখ ভাই শিবরাজ সিং, এই যে মনুষ্য জীবন, এটি সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই শরীরেই মোক্ষ লাভ হয়ে থাকে। যে লোক মোক্ষকামী, সে স্বর্গ চায় না, দেব শরীর চায় না। স্বর্গে আছে কী? মর্ত্যলোকে যা আছে স্বর্গলোকেও সেই সব বস্তু আছে। এখানে অনীতি–অনিয়ম যেমন আছে, স্বর্গেও তেমন আছে। তাই তো দেখি যে মর্ত্যের মতো স্বর্গেও রাজা আছে। – তিনি হলেন ইন্দ্র। মর্ত্যভূমিতে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ হয়ে থাকে। তেমনি স্বর্গলোকেও যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে থাকে। কীভাবে তা জানা যায়? যদি স্বর্গলোকে যুদ্ধ বিগ্রহ না হোত তবে কার্তিক সেনাপতির প্রয়োজন কি? এখানে যেমন রোগ আছে সেখানেও তেমনি রোগ আছে। সেখানে যদি রোগ না থাকতো তাহলে বৈদ্য অশ্বিনী কুমার এমনি এমনি সেখানে বসে আছেন? এক কথায় মর্ত্যভূমিতে যা যা আছে, সে সবই স্বর্গলোকে আছে। তাহলে স্বর্গলাভের কামনা করব কেন? দেবশরীর যে আছে তারও পতন হয়। মোক্ষ লাভ করলে, ঈশ্বর প্রাপ্ত হলে আর পতন হয় না। এই কারণে দেবতারা মনুষ্য শরীরকে শ্রেষ্ঠ বলে মান্য করে থাকেন। এই শরীরেই মোক্ষ লাভ হয়। এটি হল মোক্ষের দ্বার। এই দুর্লভ মনুষ্যজীবন লাভ করে আমাদের করণীয় কী? আমরা কী কেবল আহার নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের মধ্য দিয়েই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জীবন কাটিয়ে দেবো? না, কখনই নয়, পশুরাও তো আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়। সৃষ্টির মধ্যে আমরা শ্রেষ্ঠ

মনুষ্য জীবন পেয়েছি। আমাদের ঈশ্বরকে লাভ করতে হবে। মোক্ষ পেতে হবে।

ঈশ্বরকে কোথায় খুঁজতে হবে? তিনি কোথায় থাকেন? নিজের অন্তরে তাঁর খোঁজ কর, তাঁকে পেয়ে যাবে। ঈশ্বর তো বাইরের বস্তু নয়, অন্তরের বস্তু। অন্তরে তাঁকে অনুভব করতে হবে। তাঁকে খোঁজার আগে তুমি নিজেকেই একবার খুঁজে দেখো না। নিজের সন্ধান পেলে তাঁকেও তুমি পেয়ে যাবে। নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকো, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? কোথায় যাবে? নিজের বলতে তোমার কী আছে? তোমার কর্তব্য কি? এইভাবে প্রশ্ন করতে করতেই তুমি নিজেকে খুঁজে পাবে। প্রথমে খোঁজ করে দেখো – তুমি কে? তুমি বলবে – আমি অমুক, আমার বাব অমুক। আমি অমুকের ছেলে। কিন্তু এতো তোমার বাইরের পরিচয়। ওতে চলবে না। আসল কথা তুমি নিজেই জাননা তুমি কে। তুমি হয়তো বলবে – আমি হলাম আমি। আরে বাবা, না হয় বুঝলাম যে তুমি আমিই। কিন্তু তুমি যে কে তা বোঝা গেল না। এই শরীরটা কী তুমি? তা তো নয়। লোকে বলে – আমার শরীর, আমি শরীর কেউ বলে না। প্রাণ বা মনও তুমি নও, কারণ, তুমি বলো আমার মন। আমার বলবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে হবে যে আমি হলাম আমার সমস্ত কিছু থেকে আলাদা স্বতন্ত্র সত্তা। দেহ যা কিছু সব আমার, আমি কিন্তু ওসব নই। সেই যে আমি, তাঁকেই খুঁজে বের করতে হবে। নেতি, নেতি অর্থাৎ আমি এ নয়, ও নয়, এই ভাবে বিচার করে যাও দেখবে শেষে আর কিছুই থাকবে না। কিছুই নেই। একথা তোমার নিজের ভিতর থেকে যে জানিয়ে দিচ্ছে, সেই সাক্ষিই হল 'আমি'। তাঁকে ধরতে পারলে ঈশ্বরকে পেয়ে যাবে। কারণ এই আমিও যা ভগবানও তাই।

একদিন রাজা জনক এক বিরাট সভা ডেকেছেন। এই সভায় বহু মুনি-ঋষি, সাধু সন্ন্যাসী আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সভায় মাঝখানে একটি আসন নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, সে আসনে বসবেন জনক রাজার গুরুদেব। এমন সময় জনক রাজা ঘোষণা করলেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি আমাকে এক কথায় তত্ত্বের উপদেশ দিতে পারবেন যাতে আমার মনে আর কোন প্রশ্ন জাগবে না, তিনি এসে গুরুর জন্য নির্দিষ্ট এই শূন্য আসনে উপবেশন করুন।"

রাজাকে উপদেশ দিতে মুনি-ঋষিরা কেউ আসন ছেড়ে উঠলেন না। তাঁরা ভাবলেন, উপদেশ শুনে রাজার মনে যদি কোন সংশয় জাগে, প্রশ্ন জাগে,তবে তো গুরুর আসন থেকে তিনি নামিয়ে দেবেন। তখন অপমানের একশেষ হবে, সবাই হাসাহাসি শুরু করবে। এই সব ভেবে তাঁরা যে যার জায়গায় স্থির হয়ে বসে রইল। এমন সময়

সভায় উপস্থিত হলেন অষ্টাবক্র মুনি। তাঁর দেহের আট জায়গায় বাঁকা। তিনি এসেই গুরুর আসন খালি দেখে সেখানে বসে পড়লেন। তাই দেখে সভায় উপস্থিত সকলে ঠাট্টা বিদ্রুপ শুরু করে দিলেন – আরে দেহের একটা অঙ্গের অসংগতি থাকলে কেউ গুরু হতে পারে না, আর এঁর তো আট জায়গায় বাঁকা। এই দেহ নিয়ে রাজগুরু হবার সাধ হয়েছে, নির্লজ্জের মতো তাই গুরুর আসনে গিয়ে বসেছে। তখন অষ্টাবক্রকে নিয়ে চারদিকে হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল।

অষ্টাবক্র তখন সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমাকে দেখে যারা হাসছে, তারা সবাই কসাই ও চামার।" একথা শুনে সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কেউ কেউ অষ্টাবক্রকে বললেন, "আপনি নিজে এতবড় মুনি হয়ে এমন অশোভন কথা উচ্চারণ করলেন। আপনার মুখে এসব কথা শোভা পায় না। এখানে আমরা যত মুনি-ঋষি রয়েছি সবাইকে আপনি কসাই আর চামার বললেন, এ কেমন কথা? আপনার এই কথায় আমরা দুঃখিত হয়েছি।" তখন অষ্টাবক্র বললেন, "আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না। যা সত্য তাই বলেছি। আমি এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা যে আমায় দেখে হেসে উঠলে, কাকে দেখে তোমরা এমন হাসলে? হাড়-মাংসে গড়া, চামড়ায় ঢাকা এই দেহটাকে দেখেই তো তোমরা হেসেছ? চামড়ার দিকে নজর কার? চামারের। আর মাংসের দিকে নজর দেয় কে? কসাই। তাই বলছি, আমার শরীরটাকে দেখে যারা হেসেছে তারা সবাই কসাই ও চামার"। তখন রাজা জনক অষ্টাবক্রকে বললেন, "আপনি গুরুর আসনে বসে এখন এক কথায় আমাকে তত্ত্ব উপদেশ করুন।" ব্যাস বশিষ্ঠের মতো আরও যারা সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগালেন। তাঁরা ভাবছেন, জনকের মনে কোনো সংশয় জাগবে না, অথচ এক কথাতেই অষ্টাবক্র রাজা জনককে তত্ত্ব উপদেশ করবেন, কী সে তত্ত্ব? অষ্টাবক্র তখন বললেন, "রাজা জনক, সম্পূর্ণ নিজস্ব বলতে তোমার যা আছে তা তুমি আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।" এই একটি মাত্র কথাতেই জনকের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হল, অষ্টাবক্র নিজের গুরুদক্ষিণাও চেয়ে নিলেন। উপস্থিত সাধু সজ্জনবৃন্দ সকলে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

অষ্টাবক্রের এই একটি কথায় জনকের মনে চিন্তার উদয় হল। তিনি ভাবতে লাগলেন নিজস্ব বলতে আমার কী আছে? রাজ্য? এ রাজ্য কি আমার? আমি যখন ছিলাম না তখনো এ রাজ্য ছিল, আবার যখন থাকব না তখনো এ রাজ্য থাকবে। রাজ্য তো আমার সঙ্গে আসেনি। আমার সঙ্গেও যাবে না। তবে একে আমার বলি

কী করে? এই যে দেহ, এও তো আমার নয়। এ তো পঞ্চভূতের সমষ্টি, চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আমি নিজেই বা কে? আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি চিত্ত অহংকার কিছুই নই। তবে আমি কে? জনক রাজা গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন, শেষে তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণ হল। আত্মজ্ঞানের চরমভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি তখন জানতে পারলেন যে, তিনি হলেন সৎ-চিৎ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা। এইভাবে গুরুর একটি কথাতেই রাজা জনক আত্মজ্ঞান লাভ করলেন। যে প্রকৃত অধিকারী, সদ্‌গুরুর একটি মাত্র বাক্যে তার আত্মসাক্ষাৎকার ঘটতে পারে। নিজেকে মারবার জন্য একটি নরুনই যথেষ্ট। অপরকে মারবার জন্য বড় বড় অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। পরকে বোঝাতে গেলে বড় বড় শাস্ত্রের দরকার হয়ে পড়ে আর নিজেকে বুঝতে গেলে অন্য কিছুই দরকার হয় না। একমাত্র গুরু বাক্যই যথেষ্ট। ভগবান বশিষ্ঠদেব অর্দ্ধশ্লোকে বলেছেনঃ

"ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্" অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, আর জগৎ মিথ্যা। জীব যে আছে, সে তো কেবল ব্রহ্মই। কী করে হচ্ছে? যেমন অগ্নি ও তার যে স্ফুলিঙ্গ আছে - সেই স্ফুলিঙ্গ কি অগ্নি নয়? যেমন সমুদ্রের জল ও তার যে বুদ্‌বুদ্, সেই বুদ্‌বুদ্ কি সমুদ্র নয়? সেই রকম জীব কেবল ব্রহ্মই। তবে সমস্ত জীবের মধ্যে মনুষ্য জীবনই শ্রেষ্ঠ। কেন একে শ্রেষ্ঠ বলা হয়? ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি করার ক্ষমতা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের নেই। ঈশ্বরকে লাভ করার বা মোক্ষ লাভ করার সামর্থ্য একমাত্র মানুষেরই আছে। এই কারণে সৃষ্টির মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ।

দেখ ভাই শিবরাজ সিং, সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জীবন তুমি পেয়েছ এবং তুমি একজন বিদ্বান ব্যক্তি তোমাকে কী করতে হবে জান? কী কাজ করবার জন্য তুমি এই জগতে এসেছ? এই জগৎ সংসার কি? এই সবের বিচার করতে হবে। বিচার করতে করতেই সব কিছু জানতে পারবে, বুঝতে পারবে। মন স্বভাবতঃই চঞ্চল। এই চঞ্চল মন বিচার করতে দেয় না। এই চঞ্চল মন কেবল বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। তাই প্রথমে মনকে স্থির করতে হবে। কিন্তু কীভাবে মনকে স্থির করতে হবে? যেমন দুষ্ট ঘোড়াকে শায়েস্তা করতে হয়, তেমনি মনকে জব্দ করে স্থির করতে হয়। ঘোড়া যদি দুরন্ত হয় তাহলে সে পিঠে সওয়ার নিতে চায় না, তখন তাকে শায়েস্তা করবার জন্যে ময়দানে নিয়ে গিয়ে খুব জোরে ছোটাতে হয়। ছুটতে ছুটতে যখন সে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখনই সে জব্দ হয় আর সওয়ার নিতে আপত্তি করে না। দুষ্ট ঘোড়ার মতো মনকেও সেইভাবে জব্দ করতে হয়। জ্ঞানরূপী গঙ্গা বয়ে চলেছে, তার দুপাশে রয়েছে বিচাররূপী তট। ওই তটে মনরূপী ঘোড়াকে ছেড়ে

দাও আর তাকে বেশ কয়েক ঘা চাবুক লাগিয়ে দাও তখন সে জোরে ছুটতে থাকবে। কিন্তু কতদূর সে ছুটবে? জ্ঞানরূপ গঙ্গার তীর শুধু বালিতে ভরা, সেই বিচারের বালি ভেদ করে মনরূপী ঘোড়া বেশিদূর ছুটতে পারবে না, আপনা আপনি থেমে যাবে বিচাররূপ বালিতে। মন কী বিচার করতে করতে স্থির হবে? তা হল নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক অর্থাৎ নিত্যবস্তু কাকে বলে আর অনিত্যবস্তুই বা কাকে বলে? তার বিচার করে দেখা। বারে বারে বিচার করলে দেখা যাবে যে, জগৎ সংসারে যা কিছু আছে সবই মিথ্যা ও অনিত্য। একমাত্র পরমাত্মাদেব বা ঈশ্বরই হল নিত্যবস্তু। তাই সব সময় বিচার করতে হয়। মনকে স্থির করতে বিচারই সার। বিচাররূপ লগি যার হাতে আছে তার আর কিছু দরকার লাগে না। পরমাত্মাদেব বাইরের কোন বস্তু নয়; যা গুরু শিষ্যের হাতে দেবে। গুরুদেব উপায় বলে দেন যে, এই বিচাররূপী রশ্মিতে তোমার আত্মবোধ হয়ে যাবে।

ওই দিনের সৎসঙ্গ শুনে সকলের মনে এক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়েছিল এবং তখন যেন সকলেরই কিছু কিছু আত্মবোধ হয়েছিল।

একাদশ পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম ঃ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ঃ ফাল্গুন মাস, সময় ঃ সকাল
পোষ্টাল সুপারিনটেণ্ডেন্ট রায় বাহাদুর প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়
ও
শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[তিন পথ ঃ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম ঃ ভক্তির পথ সহজ, ভগবানের চেয়ে ভক্ত শ্রেষ্ঠ ঃ ভগবান ভক্তের জন্যে সব কিছু করতে পারেন ঃ জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয় ঃ সকাম ভক্ত ও নিষ্কাম ভক্ত ঃ প্রেম ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ঃ ভগবান দ্বৈতবাদীর পক্ষে ঃ জ্ঞান মিশ্রিত ভক্তি ঃ রুচি অনুসারে যে কোন একটি পথ অবলম্বন]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই প্রাণগোপাল। কিছু সৎসঙ্গ চালাও।

প্রাণগোপাল ঃ মহারাজ, আমরা তো শ্রোতা আর আপনি হলেন বক্তা, আপনিই বলুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই প্রাণগোপাল, তুমি তো ধীরে ধীরে বৈদান্তিক হয়ে যাচ্ছো। বেদের তিনটি কাণ্ড আছে, যথা জ্ঞান কাণ্ড, কর্ম কাণ্ড ও ভক্তি কাণ্ড। জ্ঞান কাণ্ড শুকনো, বড়ো কঠিন, গোড়ার দিকে এতে কিছু আনন্দ মেলে না। কর্মকাণ্ডও সহজ

নয়, বেশ কঠিন, তাছাড়া এতে অর্থের ও সময়ের দরকার। সকলের পক্ষে তাই কর্মকাণ্ড সুগম নয়। তবে ভক্তিকাণ্ড হল সকলের পক্ষে সহজ পথ। ভক্তির যে সাধন, তাতে গোড়া থেকেই সাধক আনন্দ লাভ করে। দেখো ভাই, জ্ঞান হল শুকনো ফলের মতো। যে ফলে কোন রস থাকে না, সেই ফলকে কেউ গ্রাহ্য করে না। যাকে দেবে সে-ই বলবে ওতে রস নেই, ফেলে দাও, ও ফল খাবো না। ভক্তিরূপ ফল বড় মিষ্টি ও বড় স্নিগ্ধ।

"ভক্তি মাধব প্রিয়ে" অর্থাৎ ভক্তি ছাড়া কোন বস্তুই মাধবের কাছে প্রিয় নয়। শাস্ত্রে ভগবানের চেয়ে ভক্তকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়েছে, ভক্তকে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত হলেন সীতাদেবী। কিন্তু যে কেউ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করবে, তাকে আগেই সীতাদেবীর নাম উচ্চারণ করে বলতে হবে — 'সীতারাম'। প্রথমে ভক্তের নাম পরে ভগবানের নাম। এইভাবেই বলা হয় রাধাকৃষ্ণ, গৌরীশংকর, লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদি। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়। কিন্তু ভক্তকে ভগবানের চেয়ে বড় করা হয়েছে কেন? এর কারণ হল — ভগবান তো ভক্তকে আপন করে নিতে পারেন না, ভক্তই পারে ভগবানকে আপন করে নিতে। ভগবান নির্গুণ, ভক্ত তাঁকে সগুণ করে নেয়। ভগবান নিরাকার, কিন্তু ভক্তের জন্য তাঁকে সাকার মূর্তি ধারণ করতে হয়। এইজন্যে ভক্তকে ভগবানের চেয়ে বড় বলা হয়। অন্য কেউ ভক্তের জন্য যা করতে পারে না, তা ভগবানই করে দেন। এ সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ একটি গল্প আছে ঃ—

এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থ তার স্ত্রীকে নিয়ে বাস করেন। বিষয় সম্পত্তির অভাব তাদের নেই, কিন্তু তাদের দুঃখ এই যে কোন সন্তানাদি তাদের নেই। সাধু সন্ত দেখলেই স্বামী-স্ত্রী পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের সেবা করেন, তাঁদের স্তুতি করে প্রার্থনা করতে থাকেন, বাবা, আশীর্বাদ করুন — আমাদের যেন একটি পুত্র হয়।

একদিন এক তেজদীপ্ত সাধু তাদের কাছে এলেন। স্বামী-স্ত্রী ভক্তি ভরে তাঁর সেবা করে তাঁর কাছে পুত্র লাভের জন্য বর প্রার্থনা করলেন। সাধু বললেন, "তোমাদের ছেলে হবে কিনা আমি এখনই বলতে পারছি না। তোমরা একটা নির্জন ঘরে আমার বসবার আসন পেতে দাও। আমি ইষ্টদেবের ধ্যানে বসবো এবং তাঁর কাছে তোমাদের প্রার্থনার কথা জানাব।" স্বামী ও স্ত্রী সাধুর কথা মতো সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর সাধু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "তোমাদের জন্য আমি

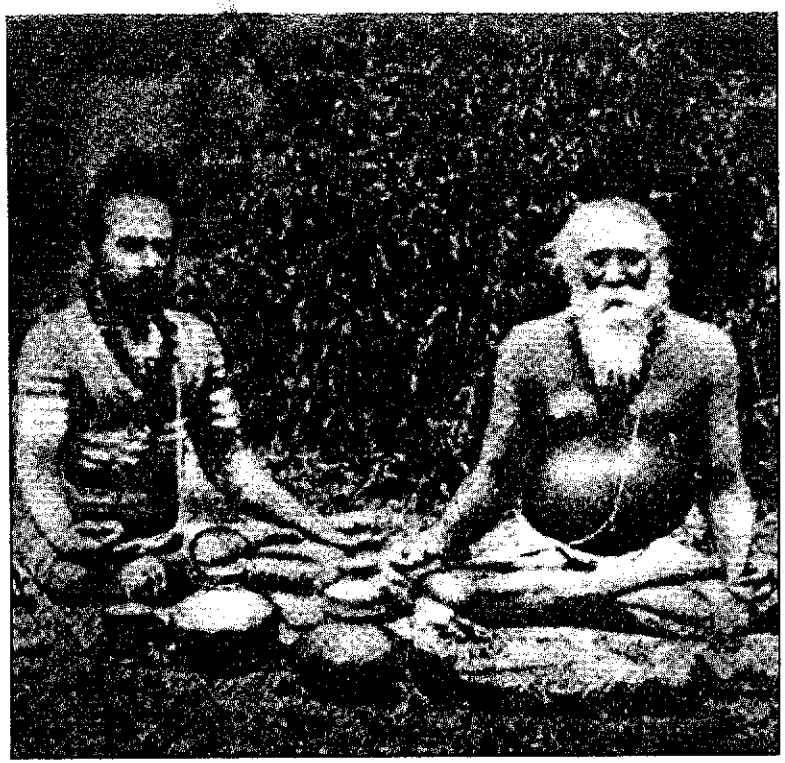

শ্রীশ্রী ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে
শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী

ইষ্টদেবের কাছে অনেক মিনতি করলাম, কিন্তু তিনি বললেন যে তোমাদের এমনই ভাগ্য যে তোমাদের কোন সন্তান হবে না।" এই বলে সাধু চলে গেলেন। এর কিছুদিন পর এক সুদর্শন সাধু তাদের দুয়ারে উপস্থিত হলেন। স্বামী-স্ত্রী তাঁকে যথোচিত অভ্যর্থনা করে ঘরে বসালেন। তারপর তারা করজোড়ে তাঁর কাছে নিবেদন করে বললেন, "প্রভু, আমাদের কোন পুত্র নেই। দয়া করে আপনি বর দিন যেন আমাদের একটি পুত্র হয়।"

একথা শুনে সাধু আসনে বসে চোখ বুঁজে রইলেন। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে সাধু বললেন — "তোমাদের সেবায় আমি খুব খুশি হয়েছি। ধ্যানে বসে ইষ্টদেবের দর্শন পেয়ে তার কাছে মিনতি করে বললাম — তোমাদের যেন একটি পুত্র হয়। তাঁর কৃপায় শীঘ্রই তোমাদের পুত্র লাভ হবে।" এই বলে সাধু চলে গেলেন। কিছুদিন পর মায়ের কোল আলো করে সুন্দর এক শিশু জন্ম নিল। বড় আনন্দে পাঁচ বছর কেটে গেল। একদিন সেই আগের সাধু ঘুরতে ঘুরতে সেই গৃহস্থের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, একটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে আঙিনায় খেলা করছে। সাধু ভাবলেন, এদের তো ছেলে হবার কথা নয়, তবে এ ছেলেটি কার? জিজ্ঞাসা করায় ছেলের বাবা বললেন, "সাধুবাবা, আপনি তো বলে গেলেন —আমাদের ছেলে হবে না। শুনে আমরা খুব হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনি চলে যাবার পর আর এক সাধু আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, তারই আশীর্বাদে এই ছেলেকে আমরা পেয়েছি।" এই কথা শুনে সাধু ভয়ানক রেগে গেলেন — ইষ্টদেব কী তাহলে আমাকে মিথ্যা কথা বলে ছিলেন! তখন তিনি ধ্যানে বসে ইষ্টদেবের দর্শন লাভ করে তাঁকে বললেন, "হে ইষ্টদেব আপনি আমাকে বলেছিলেন — এদের ছেলে হবে না, অথচ আর এক সাধুকে বর দিলেন যেন এদের ছেলে হয়। এ কেমন আপনার পক্ষপাতিত্ব?" তখন ভগবান বললেন,"বৎস, তোমার এ প্রশ্নের উত্তর পরে দেবো। এখন তুমি এক কাজ কর। আমার খুব খিদে পেয়েছে। তুমি কিছু নরমাংস জোগাড় করে আন। নরমাংস খেতে আজ আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে।"

সাধু তখন ছুরি হাতে নিয়ে নরমাংসের খোঁজে চারদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কত লোককে তিনি বললেন — 'ভগবান নরমাংস খেতে চেয়েছেন।' কিন্তু নিজের দেহ থেকে কেউ মাংস কেটে দিতে রাজি হল না। সাধু তখন বিফল হয়ে ভগবানের কাছে এসে বললেন, "হে, ইষ্টদেব, এখানে কোথাও নরমাংস পেলাম না।" তখন ভগবান বললেন, "শহরের বাইরে এক গভীর জঙ্গল আছে, তুমি সেখানে

যাও। সেখানে দেখতে পাবে — আমার এক ভক্ত আমার ধ্যান করছে। এই ভক্তের প্রভাবেই গৃহস্থের পুত্রলাভ হয়েছে। তার কাছে যাও, সে-ই তোমাকে নরমাংসের ব্যবস্থা করে দেবে।" সাধু আবার নরমাংসের খোঁজে গভীর জঙ্গলে গিয়ে সেই সাধুর দেখা পেল যাঁর প্রভাবে গৃহস্থের ছেলে হয়েছে। তাঁর কাছে গিয়ে এই সাধুটি বললেন, "ভাই, আমার ইষ্টদেব নরমাংস খেতে চেয়েছেন, তুমি জোগাড় করে দিতে পারবে?" অপর সাধুটি বললেন, " নিশ্চয়ই পারব। ভগবান খেতে চেয়েছেন এ তো পরম সৌভাগ্যের কথা।" এই বলে প্রথম সাধুর হাত থেকে ছুরিখানা নিয়ে তিনি বললেন, "ভগবান তো নরমাংস খেতে চেয়েছেন কিন্তু শরীরের কোন অংশের মাংস তিনি খেতে চান তা কি তিনি বলেছেন?" শুনে আগের সাধুটি বললেন, "তা বলে দেন নি।" তখন দ্বিতীয় সাধুটি বললেন, "বলে দেন নি? তবে তো বড়ো মুস্‌কিল হল। কোন্ জায়গার মাংস তাঁর জন্য দিই? তাহলে আমার শরীরের সব জায়গা থেকেই কিছু করে মাংস কেটে দিচ্ছি, তাঁর যে জায়গার মাংস পছন্দ তাই খাবেন।" তখন প্রথম সাধু বললেন, "আরে না না, সব শরীরের সব জায়গার মাংস কাটতে হবে না। যে কোন জায়গা থেকে একটু কেটে দাও।" পরের সাধুটি তখন বললেন, "তা কী কখনও হয়। ভগবান খেতে চেয়েছেন। এ তো পরম সৌভাগ্য। কোন্ জায়গার মাংস তাঁর ভাল লাগবে, তা যখন তুমি জানো না, তাঁকে জিজ্ঞাসাও করে আসোনি, তখন সব জায়গার মাংসই তো দেওয়া উচিত।" একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সাধু ছুরি দিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ থেকে মাংস কাটতে শুরু করলেন। তখন শরীর থেকে দরদর করে রক্তের স্রোত বইতে লাগল। সাধুর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। আরও মাংস কাটতে যাবেন এমন সময় ভগবান সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাঁর হাত চেপে ধরলেন। ভগবান তখন প্রথম সাধুকে বললেন, "এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর পেলে তো? ঐ গৃহস্থের ছেলে হবার কথা ছিল না। আমি তোমাকে কিছুই মিথ্যা বলিনি। তবুও কেন তার ছেলে হল তা তোমাকে ভাল করে বুঝতে হবে। তুমি যেমন আমার ভক্ত, এই সাধুও তেমনি আমার ভক্ত। অথচ তোমাদের দুজনের সেবার মধ্যে কত পার্থক্য, সেটা তুমি নিজেই বুঝে দেখো। আমি নরমাংস খেতে চাইলাম, আর তুমি তার সন্ধানে সারা রাজ্য ঘুরে বেড়ালে কেন? তুমি কী মানুষ নও? তুমি তো কই নিজের মাংস কেটে আমাকে দিতে পারলে না? আর এই সাধুকে দেখো। আমি নরমাংস খাব শুনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সে নিজের সারা অঙ্গ থেকে মাংস কেটে দিচ্ছে, কারণ সে জানে না দেহের কোন্ জায়গার মাংসে আমার পরিতৃপ্তি হবে। যে

ভক্ত আমার জন্যে এইভাবে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, আমিও তার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিই। গৃহস্থের ছেলে হবার কথা ছিল না, তবু আমার এই ভক্তের প্রার্থনা পূরণের জন্যে আমি নিজেই ঐ গৃহস্থের ঘরে পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছি। যে আমার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে, আমিও তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করি।"

গীতাতে ভগবানের এ রকমই কথা আছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

— যিনি যে প্রকারে আমার উপাসনা করেন, আমি তাকে সেইভাবে অনুগৃহীত করি। (ভগবান ভক্তের জন্য সব কিছু করতে পারেন)

দেখো ভাই প্রাণগোপাল, নিরাকার ভগবান ভক্তের জন্য কেমনভাবে সাকার রূপ গ্রহণ করেন, নির্গুণ হয়েও কেমনভাবে সগুণ হয়ে যান আবার অসীম হয়েও কেমনভাবে সীমার মধ্যে এসে যান। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি যত অবতার অবতীর্ণ হয়েছেন, সবাইকে আসতে হয়েছে ভক্তেরই জন্য। তাহলে দেখো — ভক্তের কত সামর্থ্য যে নির্গুণ ভগবানকে সগুণ করে আপন করে নেয়।

প্রাণগোপাল ঃ মহারাজ, জ্ঞানের মধ্যে কী ভক্তি নেই? আমার মনে হচ্ছে যে, জ্ঞানের মধ্যে ভক্তি আছে, আবার ভক্তির মধ্যেও জ্ঞান আছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ তুমি খুব ভাল প্রসঙ্গ তুলেছ। জ্ঞানের মধ্যে ভক্তি আছে, তবে বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। তা কেমন? যেমন ফুল আর ফল। প্রথমে ভক্তিরূপী ফুল ফোটে। ফুল না হলে তো ফল হয় না, ফুল ফুটলেই বোঝা যায় এবার ফল ফলবে। তারপর যখন ফল হল, তখন ফুল আপনা থেকেই ঝরে পড়ে। এখন প্রশ্ন হল, ফল হলে ফুল যেমন ঝরে যায়, তেমনি জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভক্তিও কি ফুলের মতো নষ্ট হয়ে যাবে? না, ভক্তি নষ্ট হয় না। ভক্তি তখন রস হয়ে জ্ঞানরূপী ফলের মধ্যে প্রবেশ করে। ভক্তিরস মিশ্রিত যে জ্ঞান, তা-ই হল সঠিক জ্ঞান। জ্ঞান হল ফল, ভক্তি হল সেই ফলের রস। যে ফলের মধ্যে রস থাকে না তা কোন কাজেই লাগে না। ফল শুকিয়ে গেলে লোকে তা ফেলে দেয়। জ্ঞান মিশ্রিত ভক্তিও সে রকম। যার ভক্তির মধ্যে জ্ঞান নেই, তার ভক্তি হবে কেমন করে? ভক্তি যদি জ্ঞান মিশ্রিত না হয়, তাহলে সেই ভক্তির প্রতিষ্ঠা হবে কোথায়? কোন্ আধারে? কাকে ভক্তি করব, এ জ্ঞানই যদি না থাকে, তাহলে ভক্তি কখনও জাগতে পারে না। পাখীকে দুটি ডানায় ভর দিয়ে উড়তে হয়, উড়বার সময় দুটি ডানাই একসঙ্গে কাজ করে। ভক্তি আর জ্ঞানও তেমনি আলাদা থাকতে পারে না। একই সঙ্গে তাদের কাজ

চলতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ জ্ঞান হল বিহঙ্গ, ভক্তি হল বিহঙ্গিনী। জ্ঞান-বিহঙ্গ যেখানে যাবে ভক্তি-বিহঙ্গিনীও তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে যাবে। সেই রকম ভক্তি ও জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। — দুজনের কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তবে ভক্তি দু রকমের আছে। এক, নিষ্কাম ভক্তি দুই, সকাম ভক্তি। নিষ্কাম ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। সকাম ভক্তি নিকৃষ্ট। তবে নিষ্কাম ভক্তি না হলে সকাম ভক্তিও ভাল। তোমাদের বাংলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে — 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।' সকাম ভক্তিও শেষে নিষ্কাম হয়ে যায়। কীভাবে? যেমন ধ্রুবের হয়েছিল। পুরাণে ধ্রুব চরিত্র সম্পর্কে যা লেখা আছে, তাতে দেখা যায় যে, ধ্রুব পিতৃস্নেহ পাবার জন্য এবং পিতৃসিংহাসন লাভ করবার জন্য তপস্যা করতে লাগল। কামনা পূরণের জন্য ধ্রুব যে কঠোর তপস্যা করেছিল, এ রকম তপস্যা তার আগে কেউ করেনি। তার এই ঈশ্বর ভক্তি ছিল সকাম। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কামনা যুক্ত ভক্তি হল সকাম। কঠোর তপস্যার পর ধ্রুব যখন ভগবানের দর্শন পেল তখন ভগবান তাকে বর দিতে চাইল। ধ্রুব তখন ভগবানকে বলল —"আমার আর কোন কামনা নেই। আপনার দর্শন লাভ করেছি। তাতেই আমার সব কামনা পূরণ হয়ে গেছে।" প্রথম দিকে ধ্রুবের সাধনা ছিল সকাম, পরে তা নিষ্কাম হয়ে গেল। এ রকমই হয়ে থাকে। সকাম ভক্তি পরিণামে নিষ্কাম হয়ে যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই। আবার যে ভক্ত নিষ্কাম ভক্তির সাধনা করে তার সব কামনা ভগবান এমনিতেই পূরণ করে দিয়ে থাকেন। ও তো কিছু কামনা করছে না, ভগবানের কাছ থেকে কিছু চাইছে না — তবে তার যদি কিছু কাম্য বিষয় থাকে, ভগবান তা নিজে থেকেই পূরণ করে দেন। ভগবানের কাছ থেকে কিছু চাইবার প্রয়োজন নেই। আমাদের কখন কী প্রয়োজন তা তিনি জানেন এবং আগে থেকেই সব কিছুর ব্যবস্থা করে রাখেন, যেমন আমরা জন্মাবার আগেই আমাদের জন্য তিনি মায়ের বুকে দুধের ব্যবস্থা করে দেন। তাহলে দেখ, পরমাত্মাদেব কত দয়ালু, আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তা তিনি আগে থেকেই আমাদের দিয়ে দিয়েছেন, কিছু চাইবার প্রয়োজন নেই। একটি প্রচলিত কথা আছে ঃ—

"না মাঙ্গে মতি মিলে, মাঙ্গে মিলেনা ভিখ" অর্থাৎ না চাইলেও মোতি মেলে, চাইলে ভিক্ষাও পাওয়া যায় না। তাই পরমাত্মাদেবের কাছ থেকে কিছু চাইতে নেই। তিনি আপনা থেকেই সব কিছু দিয়ে দেবেন। এ সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ একটি গল্প আছে —

কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের একটি ছেলে ছিল। শৈশবে ছেলেটির মা-বাবা দুজনেই

মারা গেলেন। তখন সুযোগ বুঝে শত্রুরা তাকে ঠকিয়ে নাবালকের সম্পত্তি দখল করে নিল। ক্রমে ছেলেটি বড় হয়ে বিয়ে করে সংসারী হল, কিন্তু দু-চারটি সন্তান হবার পর দারিদ্রের জ্বালায় তার দুঃখের অন্ত রইল না। বাজারে তার অনেক ধারদেনা হয়ে গেল। পাওনাদাররা দিনরাত অপমান করতে লাগল। তখন সে ভাবতে লাগল — কী করে আমি এই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব। তখন এক সাধুর কাছে গিয়ে সে বলল, "বাবা, আমি খুবই দুর্দশায় পড়েছি। কেমন করে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাব তা আপনি দয়া করে বলে দিন।" এই বলে সে তার দুরবস্থার কথা সাধুকে খুলে বলল। সব শুনে সাধু বললেন, "তোমার দুঃখ দূর করবার উপায় আমি বলে দিতে পারি, তবে আমার কথামতো কাজ করতে পারবে কি না দেখো।" তখন সে বলল, "আপনি যা বলবেন আমি তা করব।" সাধু বললেন, "যদি তুমি এই দেশের রাজার কাছে যেতে পারো আর তাকে যদি খুশি করতে পারো, তাহলে তোমার সব ঋণ রাজাই শোধ করে দেবেন। তোমার দেনা তো কম নয়। একমাত্র রাজা ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে অত দেনা শোধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে করেই হোক রাজাকে সন্তুষ্ট করতে হবে।" তখন ওই ব্যক্তি বলল, "বাবা, আমি কাঙ্গাল, আর উনি হলেন রাজরাজেশ্বর। তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করব কী করে? কীভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করব?" সাধু বললেন "সে উপায় আমি তোমাকে বলে দেবো।"

সাধু বললেন, "রাজবাড়িতে গিয়ে প্রথমেই তুমি রাজার দর্শন পাবে না। দারোয়ানরা তোমাকে রাজবাড়িতে ঢুকতে দেবে না। তাই আগে তাদের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করতে হবে। তুমি তাদের তামাক সেজে দেবে, বাসন মেজে দিও। তারা যখন জিজ্ঞাসা করবে — তুমি কে, তোমার কী চাই? তখন তুমি বলবে — আমি কিছু চাইনে, আমি একজন স্বেচ্ছাসেবক। ওদের সঙ্গে যখন বেশ মেলামেশা হয়ে যাবে তখন জমাদারের সঙ্গে আলাপ করবে। জমাদার যখন বলবে— "কে তুমি, তুমি কী চাও"? তখন তুমি বলবে —"আমি কিছু চাইনে, আমি স্বেচ্ছায় সকলের সেবা করি, আমি স্বেচ্ছাসেবক।" এইভাবে একে একে রাজার পাত্র মিত্রদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়ে যাবে। তুমি স্বেচ্ছায় সকলের সেবা করছ অথচ কিছুই চাও না দেখে সকলেই তোমাকে ভালবাসবে। তখন তাদেরই সঙ্গে তুমি রাজসভায় যেতে পারবে। সেখানে গিয়ে রাজাকে খুব সম্মান জানাবে, তাঁকে প্রণাম করবে। তাহলেই তোমার ওপর রাজার দৃষ্টি পড়বে আর তখন তিনি তোমার পরিচয় জানতে চাইবেন।" তখন তুমি বলবে "রাজা মশাই, আমি স্বেচ্ছাসেবক, আপনার যথাসাধ্য সেবা করবার

জন্যই আমি এখানে এসেছি। রাজা, যখন বলবেন, —একে তো মাইনে দিতে হবে না, এ আমার কাছেই থাকুক, তখনই তুমি রাজাকে আপন করে পাবে। প্রাণপণে তুমি রাজার সেবাই করবে। তার কাছে কখনও কিছু চাইবে না। তিনি দিলেও কিছু নেবে না। তুমি যদি নিষ্কাম হতে পারো, তাহলে তোমার ওপর রাজা খুব খুশি হবেন। আর রাজা খুশি হলেই তোমার সব ঋণ থেকে তিনিই তোমাকে মুক্ত করে দেবেন।"

সাধুকে প্রণাম করে যুবকটি রাজবাড়ির বাগানে গিয়ে সেখানে দারোয়ানদের সাথে মেলামেশা শুরু করল। সে তাদের তামাক সাজে, বাসন মেজে দেয়। দারোয়ানরা বলল, "ভাই, তুমি আমাদের এসব কাজ করছ কেন? আমরা মোটে দশ টাকা মাইনে পাই, তোমাকে কোথা থেকে মাইনে দেব বলো?" যুবক তখন বলল, "ভাই আমাকে মাইনে দিতে হবে না। আমি স্বেচ্ছাসেবক, নিজের খুশিতে আমি সকলের সেবা করি।" কিছুদিনের মধ্যেই পাত্র মিত্রদের সঙ্গে যুবকের পরিচয় হয়ে গেল। তখন সে তাদের সঙ্গে রাজসভায় গিয়ে রাজাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রণাম করল। রাজা তখন জিজ্ঞাসা করলেন — "কে তুমি?" যুবক বলল — "আমি আপনার দাস।" রাজা বললেন, "আমার অনেক দাসদাসী আছে, নতুন লোকের আর দরকার নেই।" উত্তরে সে বলল, "রাজামশাই, আমি স্বেচ্ছাসেবক, আমার বেতনের প্রয়োজন নেই, আমি খুশি হয়ে আপনার সেবা করব। আমাকে আপনার কাছে থাকবার অনুমতি দিন।"

রাজা ভাবলেন, মাইনে যখন দিতে হচ্ছে না, তখন ও এখানেই থাকুক। সেদিন থেকে যুবক রাজবাড়িতে স্থান পেল। রাজা তাকে 'স্বেচ্ছাসেবক' বলে ডাকেন। তাকে কোনো কাজের জন্য বলতে হয় না, বলবার আগেই সে সব কাজ সম্পন্ন করে রাখে। রাজার যা কিছু কাজ সব সে নিজের হাতে করে রাখে। তার এমন পরিপাটি কাজ দেখে রাজা তাকে খুব স্নেহের চোখে দেখতে লাগলেন। একদিন রাজা দেখলেন—তাঁর সেবক ছেঁড়া কাপড় পরে রয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেঁড়া কাপড় পরে রয়েছ, তোমার আর কাপড় নেই?" তখন সে বলল, "আমার এই কাপড়েই চলবে, অন্য কাপড়ের প্রয়োজন নেই।" রাজা দেখলেন — নতুন কাপড় দিলে ও নেবে না, তাই নিজের পুরনো কাপড় দিয়ে তাকে বললেন, "আমার এই প্রসাদী কাপড় তোমাকে দিলাম, এটি তুমি পরো।" যুবক তখন কাপড়টি পরল।

আর একদিন রাজা দেখলেন — তাঁর সেবকের মুখখানি বড়ো শুকনো দেখাচ্ছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মুখখানি শুকনো দেখাচ্ছে, তুমি কি কিছু খাওনি?" তখন সে বলল, "না, রাজামশাই, এখন আর কিছু খাব না।" একথা শুনে রাজার মনে খুব দুঃখ হল। তিনি ভাবলেন, আহা। ছেলেটি এমন নিঃস্বার্থ ভাবে আমার সেবা করছে আর আমার রাধুনি বামুন এমনই হিংসুটে যে তাকে খেতে পর্যন্ত দেয় না। ও তো কারুর কাছে কিছু চাইবে না, এই ভেবে নিজের খাওয়া হয়ে গেলে রাজা নিজেই সেই পাতে সেবককে বসিয়ে দিয়ে বললেন, "বাছা, তোমাকে খেতে দেয় না। আজ থেকে রোজ তুমি আমার পাতে বসে খেয়ো।" এইভাবে রাজার দেওয়া রাজবেশ পরে রাজার পাতে সে তাঁর প্রসাদী রাজভোগ খেতে লাগল।

একদিন ঐ যুবক রাজার পা টিপছে, রাজা দেখলেন — ঘুমের ঘোরে সে ঢুলে পড়ছে। রাজা বললেন, "তোমার খুব ঘুম পেয়েছে দেখছি, তুমি আমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ো।" সেদিন থেকে প্রত্যেক দিন রাতে রাজার পা টেপার পর সে তাঁর পায়ের কাছে শুয়ে থাকে। এখন থেকে তার ভাগ্যে রাজবেশ জুটেছে, প্রত্যহ রাজভোগ খাচ্ছে আর গদি আঁটা পালঙ্কে রাজার সঙ্গে শুতে পারছে, সেই সঙ্গে রাজার সকল কাজের সাথি হয়ে উঠল। ক্রমশঃ সে রাজার এত প্রিয় হয়ে উঠল যে, রাজা তাকে প্রাণের মতো দেখতে লাগল এবং সে রাজার ডান হাত হয়ে উঠল।

একদিন রাজা কিছু জিনিস কেনবার জন্য সেবককে বাজারে পাঠালেন। তার পুরানো পাওনাদাররা তখন বাজারে বসে ছিল। সেবককে দেখা মাত্র তারা তাকে চেপে ধরে বলতে লাগল, "বেটা, ফাঁকিবাজ, আমাদের ফাঁকি দিয়ে রাজার কাছে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে? রাজার ভয়ে আমরা এতদিন কিছু করতে পারিনি, কিন্তু এখন তো তোকে একলা পেয়েছি। এক্ষুনি আমাদের পাওনা মিটিয়ে দে, তা না হলে তোকে আস্ত রাখব না। ঋণে ডুবে আছে, আবার রাজবেশ পরা হয়েছে, লজ্জা করে না তোর?" এই ভাবে অপমান করার পর তারা তাকে মারধোর করতে লাগল।

এদিকে সেবকের ফিরতে অনেক দেরি হচ্ছে দেখে রাজা নিজেই তার সন্ধানে বাজারে গিয়ে তার দুর্দশা দেখতে পেলেন। তিনি সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হয়েছে? এরা তোমাকে মারছে কেন?" সেবক বলল, "প্রভু আমি এদের কাছে বহু ঋণ করেছি, এরা আমার পাওনাদার, আমি সেই দেনা শোধ করতে পারিনি বলে এরা আমার এই দুর্দশা করেছে।"

রাজা তখন পাওনাদারদের সব ঋণ শোধ করে দিলেন। তাদের কাছে যত হ্যাণ্ডনোট ছিল, সব ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর সেবককে সঙ্গে করে রাজবাড়িতে

দিয়ে এলে নিজের হাতে শুশ্রূষা করতে লাগলেন।

তাহলে দেখো, নিষ্কাম ভক্তের অধিকার কতখানি। পরমাত্মাদেব হলেন রাজরাজেশ্বর। মানুষের পাপরূপ ঋণ হলে, তার কর্তব্য হল—রাজরাজেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া। ঋণ মুক্তির এই হল কৌশল। তবে নিষ্কামভাবে তাঁর সেবা করতে হবে, তাঁর কাছে চাইবে না। তবেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। তোমার কোন ভয় নেই, পাপরূপী পাওনাদাররা তোমার কিছুই করতে পারবে না। তাদের যা কিছু পাওনা, সব তিনিই মিটিয়ে দেবেন। চিত্রগুপ্ত যদি পাপের হ্যাণ্ডনোটগুলি এনে হাজির করে, তাহলে পরমাত্মাদেব সেগুলি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ভক্তকে আপন চরণকমলে স্থান দেন। মানুষের সুকৃতি থাকলে সদ্‌গুরুও মিলে যায়।

সাধু ও সদ্‌গুরু ভগবানকে লাভ করবার উপায় বলে দেন। দেখো, ভক্তির মতো সহজ পথ আর নেই। ভক্তলোক কখনও মুক্তি চায় না, ভক্ত বলে — মুক্তি তো ভক্তের দাসী। ভক্তিরূপী মাকে ছেড়ে মুক্তিরূপী দাসীকে চাইতে যাব কেন? ভক্তি অব্যভিচারিণী। ভক্তি ছোট বড় বিচার করে না। দেখো, রামচন্দ্র হলেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, আর গুহক হল চণ্ডাল। গুহকের ভক্তিতে রামচন্দ্র হলেন তার বন্ধু, পরম প্রেমে তিনি তাকে আলিঙ্গন না করে থাকতে পারলেন না। রামচন্দ্র যখন বনে গেলেন, তখন ঋষিরা তাঁর স্তব স্তুতি, কত পূজা অর্চনা করলেন যাতে তিনি প্রসন্ন হন। কিন্তু রামচন্দ্রের সেদিকে নজর ছিল না। তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। ঋষিরা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন — হে রামচন্দ্র, আমরা আপনার এত যত্ন করছি, পূজা অর্চনা করছি অথচ আপনি তা গ্রাহ্য না করে ব্যগ্র হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন?" তখন রামচন্দ্রদেব বললেন, "আমি আমার ভক্তের জন্যে যতটা ব্যাকুল হই, জ্ঞানীদের জন্যে ততটা ব্যাকুলতা আমার নেই। যে চণ্ডালদের তোমরা তোমাদের কাছে ঘেঁষতে দাও না। আমি সেই চণ্ডালকন্যা, অর্থাৎ ব্যাধ কন্যা শবরীর জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছি, তার দর্শন না পেয়ে স্থির থাকতে পারছি না।" তখন ঋষিরা বললেন, "হে রামচন্দ্র, তোমাকে দর্শন করব বলে কত তপস্যা করেছি, কত উপবাস, পঞ্চতপ করেছি, সে সবের চেয়ে তোমার কাছে বড়ো হল চণ্ডালের মেয়ে শবরী?" রামচন্দ্র তাদের বললেন, "তোমরা আমার জ্ঞানী ভক্ত হলেও তোমাদের মধ্যে প্রেমভক্তির অভাব আছে। কিন্তু শবরী আমাকে জয় করেছে তার প্রেমভক্তিতে, তাই সে আমার কাছে অনেক বড়ো।" ঋষিরা তখন কাতর প্রাণে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে প্রেমভক্তি লাভের

বর চাইলেন যাতে তিনি শবরীর মতো ঋষিদের দর্শন দেন। তখন রামচন্দ্রজী বললেন, "তোমাদের এ জন্মে তা আর সম্ভব হবে না। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হয়ে আবার আমি ফিরে আসব, তোমরাও তখন আসবে বৃন্দাবনের গোপী হয়ে। সেই সময় তোমাদের প্রেমভক্তিতে বাঁধা পড়ব। দেখো, ভাই প্রাণগোপাল, ভক্তিতে উঁচু-নিচুর কোন বাছ বিচার নেই, কোথায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আর কোথায় চণ্ডালের মেয়ে শবরী, কোথায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আর কোথায় গোপ কন্যারা। নীচ কুলে জন্ম হলেও কোন ক্ষতি নেই, ভগবানে প্রেমভক্তি থাকলেই মানুষ উদ্ধার হয়ে যায়। তোমাদের বাংলাতে একটি প্রচলিত গান আছে — .

"চিনি হোতে চাইনা আমি, চিনি খেতে ভালবাসি।" দেখো ভাই, জ্ঞানী চায় চিনি হোতে আর ভক্ত চায় চিনি খেতে। কোন্‌টা ভাল? চিনি হওনা, না খাওয়া? চিনি খাওয়াই ভালো। জ্ঞানী চায় 'সোহহম্' হতে, সে-ই আমি অর্থাৎ ভগবানে আর আমাতে কোন প্রভেদ নেই। আর ভক্ত চায় চিনি খেতে অর্থাৎ তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাস। জ্ঞানী অদ্বৈতকে প্রতিপাদন করে আর ভক্ত দ্বৈতকে প্রতিপাদন করে। জ্ঞানী বলে 'একং ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নাস্তি' একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। ব্রহ্ম ছাড়া যখন আর কিছুই নেই, তখন সেই ব্রহ্মের স্বাদ গ্রহণ করবে কে? অদ্বৈতবাদী তো নিজেই চিনি হয়ে গেছে। কিন্তু ভক্ত বলে — তুমি আছ আর আমি আছি। তুমি ভগবান, আমি মানুষ; তুমি ব্রহ্ম, আমি জীব; তুমি ভগবান, আমি ভক্ত; তুমি প্রভু, আমি দাস। ভক্ত ভগবানকে আস্বাদন করিতে চায় অর্থাৎ চিনি খেতে চায়, চিনি হোতে চায় না। দেখো, ভগবান নিজেই দ্বৈতবাদীর পক্ষ নিয়ে নিয়েছেন। কেমন করে তা বোঝা যায়? সৃষ্টির দিকে নজর দাও, তা হলেই বুঝতে পারবে। সৃষ্টির মধ্যে সবই কেমন দুই-দুই ভাবে রাখা হয়েছে — দিন আর রাত্রি, আলো আর অন্ধকার, প্রকৃতি আর পুরুষ, সুখ আর দুঃখ, সংযোগ আর বিয়োগ — সব কিছুতেই দ্বৈতভাব। গাছের যখন নতুন পাতা বেরোয়, তখন প্রথমেই দুটি পাতা বের হয় —একটা পাতা বেরোয় না কেন? পাখী দুটি ডানা মেলে আকাশে ওড়ে, মানুষ দু পায়ে হাঁটে। ভগবানের রচনাতেও তাই দেখতে পাই, যেমন মায়া আর ব্রহ্ম, জীবাত্মা আর পরমাত্মা — যেদিকে তাকাও সর্বত্রই দেখবে ভগবান দুই -দুই করে সব জিনিস রেখেছেন। এ থেকে বুঝে নাও যে ভগবান নিজেই যেন দ্বৈতবাদীর পক্ষ অর্থাৎ ভক্তের পক্ষ নিয়ে বসে আছেন।

প্রাণগোপাল ঃ মহারাজ, গীতা শাস্ত্রে আছে, 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ

বিদ্যতে।" জ্ঞানের মতো পবিত্র অন্য কোন বস্তু নেই। তাহলে গীতাশাস্ত্রে এ রকম কথা ভগবান কেন বললেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ গীতা শাস্ত্রে এই কথা ভক্তি মিশ্রিত জ্ঞানকে প্রতিপাদন করার জন্য বলা হয়েছে। দেখো, ভাই প্রাণগোপাল, ভক্তিকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড আর কর্মকাণ্ড এই তিনটি হল এক একটি পথ। যার যে পথে চলতে সুবিধে, সে সেই পথ ধরে এগিয়ে যাবে। কিন্তু সবাই পৌঁছবে সেই একই গন্তব্য স্থলে।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।" (শিবমহিম্নঃ স্তোত্র ৭)

এর তাৎপর্য হল, ঋক-সাম-যজু-এই তিন বেদ, সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র, বৈষ্ণব কত রকম ধর্ম, প্রচলিত রয়েছে। মানুষ তার রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্ম তথা সাধনপথ বা পথ অনুসরণ করে। এইসব ধর্মপথের মধ্যে কোনটি সরল, কোনটি কুটিল, কিন্তু নদী যেমন নানাপথ অতিক্রম করে অবশেষে সমুদ্রে মিশে যায়, মানুষও তেমনি যে পথ অবলম্বন করে থাক না কেন, সকলেই শেষে গিয়ে পৌঁছবে সেই ভগবানের কাছে। মানুষ তার সংস্কার অনুসারে যে কোন রাস্তা ধরে চলতে পারে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। অতি ক্ষুদ্র নদী বয়ে চলেছে, তার গতি পথে বাধার মতো দাঁড়িয়ে আছে এক পর্বত। নদী সেই পর্বত ভেদ করে ছুটে চলেছে সমুদ্র অভিমুখে। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম যে কোন পথ ধরে মানুষ তেমনি ধেয়ে চলেছে ভগবানের দিকে, তার গতিরোধ করার সাধ্য কারোর নেই। সকল বাধা পেরিয়ে একদিন সে ভগবানের সাথে অবশ্যই মিলবে।

এই দিনের শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের অমৃত বাণী শুনে আমার মতো অবলা দীনা স্ত্রীলোকের মনে বড়ই আনন্দ হয়েছিল। অবলা স্ত্রীলোকের মনে হল — একমাত্র ভক্তি পথই প্রশস্ত এবং সেই বুঝেই যেন দয়াল ঠাকুর ভক্তি পথের পক্ষ নিয়ে সব কথা বললেন।

দ্বাদশ দিন

স্থান ঃ করুণীবাদ আশ্রম ঃ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ঃ চৈত্র মাস, সময় ঃ সন্ধ্যা
পুকুর পাড়ের চাঁদনী, কয়লা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত কুমুদ বিহারী বসু
ও
শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[ম্যানেজার হয়ে যাও মালিক হয়ো না ঃ ঈশ্বরই মালিক, সংসার করো নির্লিপ্ত হয়ে ঃ গুরুর বাক্য - শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ঃ অদৃষ্টের প্রতিকার — প্রারব্ধ ও পুরুষকার, বিষয়ের বিষ দূরীকরণে গুরু, সাধু সজ্জনদের সঙ্গলাভ ঃ চার রকমের সাধক ঃ তিন প্রকার কৃপা ঃ অন্তঃকরণ শুদ্ধি করণের উপায়]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই কুমুদ, তুমি ম্যানেজার হয়ে যাও, মালিক হয়ো না। মালিক হলে ব্যবসার মুনাফার ভোগে আসক্ত হয়ে পড়বে। ইষ্টদেবকে তোমার মালিক বানাও আর তুমি তার ম্যানেজার হয়ে থাকো। সংসার ছেড়ে কোথায় পালাবে? তা পারবে না, তবে মালিক ভাব ত্যাগ করতে হবে। ভাবকে উল্টে দিতে হবে। এ ব্যাপারে উদাহরণস্বরূপ একটি গল্প আছে ঃ—

এক রাজার ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরু মিলে গেল। তাঁর নির্দেশে রাজা নানারকম সৎকাজ করতে লাগলেন আর সেই সঙ্গে সাধন ভজনে মন দিলেন। কিছুদিন সাধন ভজন করার পর রাজার মনে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হল। তখন তিনি গুরুদেবের কাছে হাত জোড় করে বললেন ঃ "গুরু মহারাজ, আমি আর রাজত্ব করব না।' গুরু মহারাজ দেখলেন যে রাজার মনে বড়ই বৈরাগ্য এসেছে, এখন শিষ্যকে প্রকৃত বৈরাগ্যের মর্ম আর মুক্তির পথ বলে দেওয়া দরকার।

গুরুদেব তখন রাজাকে বললেন, "তোমাকে আর রাজত্ব করতে হবে না, তুমি এ রাজত্ব কাউকে দিয়ে দাও।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে দেব?" গুরুদেব বললেন, "তোমার যাকে ইচ্ছে তাকেই দাও। আর যদি ইচ্ছে হয়, আমাকেও দিতে পার, আমি নিতে পারি।" রাজা তখন এক গণ্ডুষ জল নিয়ে বিধি অনুসারে গুরুদেবকে রাজত্ব অর্পণ করলেন।

গুরুদেব এবার রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজা, তুমি এখন কী করবে? কীভাবে তুমি দিন কাটাবে?" রাজা বললেন, "গুরুদেব আমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাব।" গুরুদেব তখন বললেন, "তুমি যাবেই বা কোথায়? যেখানেই যাও না কেন, নিজের জন্যে তো দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতে হবে, লজ্জা নিবারণের

জন্যে দুখানি কাপড় চাই, থাকবার জন্যও পাড়ে তিন হাত জমির দরকার।"

রাজা বললেন, "হ্যাঁ গুরুদেব, আপনি ঠিকই বলেছেন। জীবনধারণ করতে হলে এ সবই চাই। আমি ঠিক করেছি — কোন বড়লোকের কাছে রোজ দু ঘণ্টা কাজ করব, তাহলে তার কাছ থেকে অন্নবস্ত্রের জোগাড় হয়ে যাবে, আর থাকবার জন্যে তো গাছতলাই রয়েছে।" গুরুদেব বললেন, "ভাই, তুমি রাজা, পরের কাজ তো তুমি করতে পারবে না। তার চেয়ে আমি তোমাকে খাবার অন্ন দেব, পরবার কাপড় দেব আর থাকবার জন্য বাগানের মধ্যে একখানা ঘরও করে দেব। তুমি রোজ দু-তিন ঘণ্টা আমার কাজ করে দাও। পরের দাসত্ব করতে যাবে কেন? আমি তোমার গুরু, তুমি আমার কাজ কর।" গুরুদেবের কথায় রাজি হয়ে রাজা তাঁরই কাজ করতে লাগলেন।

প্রতিদিন দু-তিন ঘণ্টার জন্যে রাজা গুরুদেবের রাজত্বের দেখাশুনা করেন। আগে যেমন রাজকার্য করতেন এখনও ঠিক সেভাবেই রাজকার্য করতে লাগলেন, তবে 'আমি রাজা' এই অহংকার তাঁর মনে আর ঠাঁই পেল না। রাজা এখন জানেন এ রাজত্ব আমার নয় — গুরুদেবের, আমি তাঁর দাস মাত্র, আমি তাঁরই কাজ করছি। এইভাবে গুরুদেবের কাছেই রাজা নিজেকে নিয়োগ করলেন। এরপর একদিন গুরুদেব রাজাকে বললেন, "দেখো রাজা, মুক্তি লাভের জন্যে, নির্লিপ্ত হওয়ার জন্যে দূরে পালিয়ে যাবার কোন দরকার হয় না। যা চাও তা তুমি এখানেই পাবে। তোমার যা কিছু আছে সব ঈশ্বরকে সমর্পণ করে দাও, গুরুদেবকে অর্পণ করে দাও, 'আমি রাজা' —এই অভিমান ছেড়ে দাও। এইভাবে রাজত্ব করতে পারলে তুমি নির্লিপ্ত থাকতে পারবে, কোন বন্ধনে তুমি বাঁধা পড়বে না। কিন্তু মন থেকে 'আমি রাজা' এই অহংকারটি ত্যাগ করতেই হবে। তবে শরীর ধারীর পক্ষে সব অভিমান ত্যাগ করা তো সম্ভব নয়, তবে একটি উপায় রয়েছে — তা হল 'দাসোঽহম্' — আমি ঈশ্বরের দাস, গুরুদেবের দাস, আমি তাঁরই কাজ করছি। তাঁরই দেওয়া অন্ন আমি খাচ্ছি, তাঁরই দেওয়া বস্ত্র পরিধান করছি — এই ভাব নিয়ে তুমি যতই রাজত্ব করো না কেন, কোন কিছুই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না, তুমি নির্লিপ্ত থাকতে পারবে।"

পালিয়ে গেলে কিছু কাজ হবে না। ভাবকে উল্টে দিতে হবে। দেখো ভাই কুমুদ, তোমার যা কিছু আছে সব ঈশ্বরকে সমর্পণ করে দাও, তাঁকেই মালিক বানাও, আর তুমি ম্যানেজার হয়ে যাও, তবেই তোমার বন্ধন টুটে যাবে। কোন কাজেই তুমি

আর বাঁধা পড়বে না। ভিতরে নির্লিপ্ত থাকবে — এটাই তাৎপর্য।

কুমুদ ঃ মহারাজ, সংসারীর পক্ষে এই ভাবে ভাবিত হওয়া খুবই মুস্কিল।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, তুমি সংসার ছেড়ে কোথায় যাবে? এমন স্থান কোথায় আছে যা তুমি নির্জন পাবে? পাঁচজন ব্যক্তি এক জায়গায় থাকলে খাবার ও জল চাই, থাকবার উপযোগী বাসস্থান চাই। জঙ্গলে গেলে সেখানে হিংস্র জীবজন্তু আছে —সুতরাং সংসার ছেড়ে কোথায় যাবে?

সংসারে থাকবে নির্লিপ্ত হয়ে। "নলিনী জলোগত দলবৎ, অর্থাৎ যেমন পদ্ম ফুল, পদ্মফুল জলে থাকে, জল কিন্তু পদ্মের পাপড়িতে লেগে থাকে না। জলেই পদ্মের স্থিতি, তবু জল পদ্মকে ভেজাতে পারে না। পদ্মে জল দিলে তা ঝরে যায়। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন —

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ,
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ।। (গী.৫/১০)

ব্রহ্মকে কর্ম সমর্পণ করে এবং কর্মফল ত্যাগ করে তুমি যতই কর্মের অনুষ্ঠান করবে পদ্মপত্রস্থিত জলের মতো তোমাকে পাপ-পুণ্য কিছুই স্পর্শ করবে না, কর্মে তুমি নির্লিপ্ত থাকবে। দেখো ভাই কুমুদ, তোমাকে নির্লিপ্ত হওয়ার জন্যে যা কিছু উপদেশ বাক্য বলেছি, তা তুমি মোটেই ভুলে যাবে না। যা কিছু উপদেশ বাক্য শুনলে তা আবার মনন করবে। মনন করলে কী হবে? মনন করলে নিদিধ্যাসন হবে অর্থাৎ ওই বাক্য ধ্যানে বসে যাবে।"শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন"। শুধু শ্রবণে কিছু হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মনন না হচ্ছে। শ্রবণ হয়ে গেল ব্যাস ছুটি হয়ে গেল —এই শ্রবণে কিছুই কাজ হবে না। গুরুজনদের কাছ থেকে সৎ উপদেশাবলী শ্রবণ করে ফের তা একান্ত চিত্তে মনন করতে হবে অর্থাৎ অনবরত চিন্তা করতে হবে। মনন করার পর ধ্যানে বসতে হবে অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত স্থির করতে হবে। তবেই শ্রবণ সার্থক হবে। তা না হলে তুমি কেবল শুনেই গেলে, মনন করলে না, তাহলে তুমি এক কান দিয়ে যা শুনলে অন্য কান দিয়ে তা তুমি বের করে দিলে। শ্রবণ কি? আমি তোমাকে নির্লিপ্ত হওয়ার যে উপদেশ করলাম তা তুমি কান দিয়ে শুনলে —এতেই তোমার শ্রবণ হয়ে গেল। মনন কি? তুমি যা যা বাক্য শুনলে তা নিজের মনে মনে আলোচনা করতে হবে অর্থাৎ গুরু মহারাজ আমাকে কী কী বাক্য বলেছেন, কী রীতিতে তাঁর বাক্যের অর্থ বুঝতে পারব — কোন্ পদ্ধতিতে তাঁর বাক্য পালন করতে পারব — মনে মনে এই সব আলোচনাকে বলা হয় মনন। মনন হলেই

নিদিধ্যাসন হবে অর্থাৎ ধ্যানেতে বসে যাবে। ধ্যানের মধ্য দিয়েই অনায়াসে শ্রবণের ফল লাভ হবে, নতুবা শুধু শ্রবণ করলে তাতে কোন কাজ হবে না।'

কুমুদ ঃ মহারাজ, অদৃষ্টের কিছু প্রতিকার আছে কি?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ অদৃষ্টের কিছুপ্রতিকার নেই। কিন্তু অদৃষ্টের উপর মানুষ পুরোপুরিভাবে বসে থাকতে পারে না। অদৃষ্টকে নিবারণ করবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে অর্থাৎ পুরুষকার প্রয়োগ করতে হবে। পুরুষকার প্রয়োগ করেও যখন ফল পাওয়া যাবে না, তখন অদৃষ্টের উপর ছেড়ে দিতে হয়, নতুবা শান্তি বা বিশ্রান্তি লাভ হয় না। অদৃষ্টে কী আছে, তা তো লোকে আগে থেকে জানে না। সেজন্য পুরুষার্থ প্রয়োগ করতে হবে।

অবশ্যম্ভাবি ভাবানাং প্রতিকারো ভবেদ্ যদি
তদাদুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নলরাম যুধিষ্ঠিরাঃ।

অদৃষ্টের যদি প্রতিকার সম্ভব হত, তা হলে নলরাজা, শ্রীরামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরাদি কেন এত দুঃখ ভোগ করতে গেলেন? তাঁরা কি মূর্খ, নিরূপায়, বুদ্ধিহীন মানুষ ছিলেন? তা তো নয়, তাদেরও তো যথেষ্ট শক্তি, সামর্থ ও বুদ্ধি ছিল, তবু কিছু করতে পারলেন না। তাঁদেরও অদৃষ্টে যা ছিল তা ভোগ করতেই হল।

প্রারব্ধের উপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে পড়া উচিত নয়। প্রথমে চেষ্টা-যত্ন করা দরকার। প্রারব্ধ বলবান না পুরুষার্থ বলবান এ কেউ বলতে পারে না। এ যেন দুই পালোয়ানের মল্লযুদ্ধ চলছে, কেউ কাউকে হারাতে পারছে না। কখনো একজন আর একজন মল্লকে নিচে ফেলে দিয়ে তার ঘাড়ের উপর চেপে বসছে, পরক্ষণেই যে নিচে শুয়ে পড়েছিল সে-ই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে অপর জনকে আছাড় দিল ও নিজে তার উপর চেপে বসল। দুজনেই তাই সমান সমান। কেউ বড় ছোট নয়। দুই পালোয়ানের মতো ঠিক এমনই অবস্থা প্রারব্ধ ও পুরুষকারের। কে ছোট, কে বড় বলবার উপায় নেই। কখনো দেখা যায় প্রারব্ধের জোর বেশি, কখনো বা পুরুষকারের। তবে এ ব্যাপারে একটি কথা আছে। প্রারব্ধের উপর তোমার কোন হাত নেই, কিন্তু চেষ্টা যত্নের উপর ষোল আনাই হাত আছে, যেমন, তোমার হাতে একটি ঢ্যালা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তার উপর তোমার পুরোপুরি অধিকার রয়েছে। কিন্তু যেই সেই ঢ্যালা তোমার হাতের বাইরে চলে গেল আর তার উপর তোমার কোন নিয়ন্ত্রণ রইল না আর সে তোমার হাতে ফিরে আসবে না, যেখানে গিয়ে পড়বার সেখানেই পড়বে। প্রারব্ধ আর পুরুষকারের বেলাতেও এই নিয়ম। প্রারব্ধ

যে তোমার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, তার ক্রিয়া যতদূর হবার তা হবেই, কেউ তা রোধ করতে পারবে না। কিন্তু পুরুষকার তোমার হাতেই রয়েছে, ঢ্যালার মতো তুমি তা হাতে রাখতেও পারো, আবার ফেলে দিতেও পারো। প্রারব্ধ আর পুরুষকার আলাদা কোনো জিনিস নয়, দুটো একই জিনিস। ঢ্যালাকে যতক্ষণ হাতে রাখবে ততক্ষণ সে পুরুষকার, ফেলে দিলেই তা প্রারব্ধ হয়ে যাবে। প্রথমে হয় পুরুষকার, পরে সেই পুরুষকারই প্রারব্ধ হয়ে দেখা দেয়, তোমার পুরুষকারের কর্মের দ্বারাই তোমার প্রারব্ধ তৈরি হয়ে থাকে। সবাইকে প্রারব্ধ ভোগ করতেই হবে, তার উপর কারুর কোন হাত নেই। প্রারব্ধ ও পুরুষকার সম্বন্ধে উদাহরণ স্বরূপ একটি গল্প আছে। গল্পটির নাম "ব্যাসশ্চ দাসশ্চ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরঃ" অর্থাৎ এ কাহিনী ব্যাস, তাঁর এক দাস ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরকে নিয়ে। ব্যাসদেবের একটি দাস ছিল। দাসটি অনেকদিন ধরে ব্যাসদেবের সেবাযত্ন পরিচর্যা করছিল। একদিন সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রচণ্ড জ্বর, তা কিছুতেই ছাড়ে না। ব্যাসদেব তার জন্য খুব দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কী করবেন ভেবে পান না, বুঝতে পারছেন না কীভাবে সে সুস্থ হয়ে উঠবে। অনেক ওষুধ পত্র চিকিৎসা করলেন, কিন্তু কোন উপকার হল না। ব্যাসদেব তখন তাকে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, "আমার এই দাসটিকে ভালো করে দিন।"

ব্রহ্মা তখন তাঁকে বললেন, "ভাই, একে ভালো করার শক্তি আমার নেই। আমি জীবের সৃষ্টি মাত্র করে থাকি, কিন্তু তাকে রক্ষা বা পালন করার সামর্থ আমার নেই। জীবকে পালন করেন বিষ্ণু। তুমি বিষ্ণুর কাছে যাও, তাহলে কিছু উপায় হতে পারে।" তখন ব্যাসদেব বললেন, "তাহলে আপনিও চলুন আমার সঙ্গে বিষ্ণুর কাছে।" ব্রহ্মা বললেন, "বেশ, চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।" ব্যাসদেব তখন তাঁর দাসকে নিয়ে বিষ্ণুর কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

ব্যাসদেব বিষ্ণুকে বললেন, "হে বিষ্ণো, আপনি জীবের পালনকর্তা, আপনি আমার দাসটিকে বাঁচিয়ে দিন, রক্ষা করুন।" বিষ্ণু বললেন, "আমি পালন করে থাকি ঠিকই কিন্তু মহেশ্বর হলেন সংহারকর্তা, সংহার থেকে তিনিই বাঁচাতে পারেন। তুমি তাঁর কাছে যাও, তিনি নিশ্চয় একটা উপায় করে দেবেন।" বিষ্ণুর কথা শুনে ব্যাসদেব বললেন, "আপনিও তবে চলুন আমার সঙ্গে, এই দাসের জন্যে আপনিই মহেশ্বরকে একটু বলে দিতে পারবেন।" তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ব্যাসের সঙ্গে মহেশ্বরের কাছে গেলেন। ব্যাসদেব বললেন, "হে মহেশ্বর, আমি আমার এই দাসের জন্য আপনার কাছে এসেছি, আপনি একে রক্ষা করুন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর রক্ষা করবার শক্তি

নেই, তাই তাঁরা আমার সঙ্গে এসেছেন আপনাকে দেখতে।" তখন মহেশ্বর বললেন, "আরে, তুমি এই দাসের উপকার করবার জন্য এখানে এসেছ, কিন্তু তাতে তো তার অপকারই করে বসেছ। ওর প্রারব্ধের ফল এমনই নির্দিষ্ট হয়ে আছে যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতা আর ব্যাস ও এই দাস স্বয়ং এই পাঁচজন একত্র হলেই এর প্রাণ বিয়োগ হবে। তুমি চেষ্টা যত্ন করে সেই তিন দেবতা একত্র করে দাসের সঙ্গে জুটিয়ে এনেছ। আবার এদিকে তাকে বাঁচাতেও চাইছ। একী কথা! এই তিন দেবতার এখন মিলিত হবার কোন কথা ছিল না, তুমিই তাঁদের একত্র করে দিলে। তুমি যদি তাঁদের একত্র না করতে তাহলে এ বেচারার মৃত্যু হত না। তুমি তাকে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করছিলে, কিন্তু আসলে তুমি যে তার মৃত্যুরই সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে দিলে।" এটাই অদৃষ্টের ফল। এইভাবে ব্যাসের সব চেষ্টা বিফল হয়ে গেল।

কুমুদ ঃ অদৃষ্টের যখন প্রতিকার নেই, তখন আপনি কেন আমাকে চেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য আদেশ করছেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, তুমি চেষ্টা ছাড়তে পারবে না। আহারের চেষ্টা তোমাকে করতেই হবে। তুমি যদি বল— আমি আহার বিহার সব ছেড়ে দেব তাহলে তোমার শরীর টিঁকবে না। তোমার দ্বারা কোনো কাজই চলবে না।

কুমুদ ঃ মহারাজ, অনেক গরীব মানুষ আছে যারা কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা করে দুমুঠো অন্ন যোগাড় করে, তাদের তো ভাল ভাল খাবার জোটে না?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, এটাই তাদের প্রারব্ধ। তারা যতই চেষ্টা করুক —ভাল ভাল খাদ্য বস্তু তাদের জুটবে না। এর কারণ কী? এর কারণ হল, ওই সব গরীব মানুষ পূর্বজন্মে দানের মতো পুণ্য কাজ করে নি। এজন্যে আমার উপদেশ হল — হাতের মুঠি খুলে দান কর। এই দানই তোমার পুঁজি হয়ে যাবে। তুমি যদি দানে কৃপণতা কর, তাহলে তোমার পুঁজি বাড়বে না। পুঁজি বাড়াতে হবে, তা না হলে গরীবের কুটীরে জন্ম নিতে হবে। এ বিষয়ে তোমাকে একটি গল্প শোনাচ্ছি —

এক অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে সংকল্প করল যে, প্রতিদিন পঁচিশজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে তবে সে আহার করবে। মেয়েটির বাবা-মা পরম ধার্মিক ছিল। তারা মেয়ের এই শুভ সংকল্পে খুব খুশি হলেন। যথা সময়ে তারা মেয়েটির বিয়ে দিলেন। পাত্রের অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু সে ছিল বড় কৃপণ। সে যখন দেখল যে, তার স্ত্রী প্রতিদিন পঁচিশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাচ্ছে, তখনি তার খুব রাগ হল এবং এই নিয়ে স্ত্রীর

শ্রীশ্রী তারানন্দ ব্রহ্মচারী

সঙ্গে সে ঝগড়া শুরু করল। একদিন সে তার স্ত্রীকে বলল, "তুমি আমার ভাঁড়ার থেকে কোন জিনিস নেবে না। তোমাকে আমি প্রতিদিন একটা করে টাকা দেব তা দিয়ে তুমি ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ো।" একথা শুনে মেয়েটি একদম নিরাশ হয়ে পড়ল। মেয়েটি ঠিক করল যে সে প্রাণত্যাগ করবে। সে তখনি স্বামীকে বলল, "তুমি তো রোজ আমাকে একটা করে টাকা দেবে বলছ, তাতে আমার মাসে ত্রিশ টাকা হবে। সেই টাকাটা একসঙ্গে আজই আমাকে দিয়ে দাও। আমি আর কখনও তোমার কাছে কিছু চাইব না।" মেয়েটি ভেবে ঠিক করেছে, এই টাকায় আজকের মতো আমি ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে সন্ধ্যা বেলায় প্রাণ ত্যাগ করব। প্রভাত হতে দেব না—তা না হলে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্রত ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমন সময় এক ফকির সেই বাড়িতে এলেন। ফকিরকে দেখে মেয়েটি তাঁকে আহারের জন্য অনুরোধ করল। ফকির বললেন, "তোমার কাছে কিছু খেতে পারব না মা। তুমি তোমার মনের মধ্যে গভীর দুঃখ চেপে রেখেছ। সেই দুঃখের কারণ আমাকে না বললে আমি কিছুই খাবো না।" মেয়েটি তখন ফকিরকে তার দুঃখের সব কথা শোনাল। তারপর বলল, "বাবা, এ প্রাণ আমি আর রাখব না। ছোটবেলা থেকে পঁচিশ জন ব্রাহ্মণ ভোজনের যে ব্রত আমি পালন করে আসছি, এতকাল পরে স্বামীর কৃপণতায় তা বন্ধ করতে হবে, এ আমি সহ্য করতে পারব না। তাই আমি আর বেঁচে থাকতে চাইনে। আজ সন্ধ্যাবেলাতেই প্রাণ ত্যাগ করব।"

সব কথা শুনে ফকির বললেন, "আজকের দিনটা তুমি অপেক্ষা কর। আমি একবার তোমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। তাকে বোঝাতে পারি কি না দেখি। যদি না বোঝে তখন কাল না হয় তুমি প্রাণ ত্যাগ কোরো। আজকে কিছু কোরো না।"

ফকির তখন তার স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন, "ভাই, তুমি আমার একটা উপকার করবে?" স্বামী তো কৃপণ, সে ভাবল লোকটা বুঝি টাকার ধান্ধায় এসেছে। তাই, সে বলল, "না ভাই, আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না।" ফকির বললেন, "ভাই, এরজন্যে তোমাকে কিছু খরচ করতে হবে না। বিনা খরচায় তুমি আমার উপকার করতে পারো।" পয়সা খরচ হবে না শুনে মেয়েটির স্বামী বলল, "তবে বলো, তোমার জন্যে কী করতে হবে?" ফকির বললেন, "ভাই, কাজ আমার সামান্যই। আমারা দু ভাই ছিলাম। দুজনেই আমরা দরজীর কাজ করতাম। দাদা মারা গেছেন, তবে স্বর্গে গিয়েও তিনি দরজির কাজই করছেন। স্বর্গে ছুঁচ পাওয়া

যায় না, ছুঁচের অভাবে তাঁর খুব অসুবিধে হচ্ছে। আমি নিশ্চয় জেনেছি যে আর সাত দিন বাদেই তোমাকে স্বর্গে যেতে হবে। আমার একটা ছুঁচ তুমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দাদাকে দিয়ো, এতে তো তোমার কোনো খরচ হবে না, দাদারও খুব উপকার হবে। নাও ভাই, এই ছুঁচটা আমার দাদাকে দিয়ে দিয়ো।"

কৃপন স্বামীর তখন চিন্তা হল, এ ছুঁচ আমি কী করে নিয়ে যাবো? কাপড়ে গেঁথে নেব? আমি মরে গেলে শ্মশানের চণ্ডালরা তো কাপড় খুলে নেবে। শরীরের কোন জায়গায় যদি বিঁধিয়ে রাখি তাহলে তো চিতার আগুনে দেহের সঙ্গে ছুঁচটাও তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তাহলে কোন্ উপায়ে ছুঁচটা সঙ্গে নেব? এসব ভেবে সে ফকিরকে বলল, "না ভাই, আমার পক্ষে তোমার উপকার করা সম্ভব নয়। কেমন করে এই ছুঁচ নিয়ে যাব, তা আমি ভেবে পাচ্ছিনে।" ফকির তখন বললেন, "ভাই, তোমার টাকার থলি যাতে করে নিয়ে যাবে তাতে করেই আমার এই ছুঁচটা নিয়ে যেয়ো। তোমার এত টাকা তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে আর আমার সামান্য এই ছুঁচটা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না?"

তখন কৃপণের মনে নানা চিন্তার উদয় হল। সে ভাবতে লাগল, আরে এ আমি কী করেছি। কার জন্যে টাকার পুঁটলি করেছি, এ সব ধন দৌলত তো এখানেই পড়ে থাকবে। তখন সে ফকিরকে বলল, "আমার সঙ্গে তো কিছুই যাবে না, তুমি আমাকে বলে দাও - মৃত্যুর পর কোন্ জিনিস আমার সঙ্গে যাবে?" ফকির তখন বললেন, "জন্মেছ তুমি উলঙ্গ হয়ে, যাবেও উলঙ্গ হয়ে। তোমার সঙ্গে যাবে তোমার শুভাশুভ কর্ম। যে পাপ আর পুণ্য তুমি সঞ্চয় করেছ, তাই শুধু তোমার সঙ্গে যাবে, আর কিছুই তোমার সঙ্গে যাবে না।"

এতক্ষণে কৃপণের চৈতন্য হল। শুভকর্মে তার প্রবৃত্তি হল। তখন সে তার স্ত্রীকে বলল, "তুমি তোমার ইচ্ছে মতো দান-ধ্যান কর, ব্রাহ্মণ ভোজন করাও, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।"

দেখো ভাই কুমুদ, এই গল্প শুনে শিক্ষা পেলাম যে হাত খুলে মুঠি ভরে দান করে যাও, তাহলে আগামী জন্মে তোমার ভোগ মজুত থাকবে। আর তুমি যদি কৃপণ হও, তাহলে ঈশ্বরও কৃপণ হয়ে যাবেন, তোমাকে কিছু দেবেন না। দেখো কুমুদ, এই উদাহরণের গল্পটি তুমি মনে রাখবে — এই জন্মে তুমি যেসব শুভাশুভ কাজ করবে, তা করবার জন্যে চেষ্টা যত্ন করবে, পরের জন্মে তা - ই প্রারব্ধ হয়ে যাবে। প্রারব্ধ কোন আলাদা বস্তু নয়।

কুমুদ ঃ আপনি আশীর্বাদ করলে তত্ত্ব চিন্তনের মধ্য দিয়ে আমার মধ্যে বিচার আসবে। এজন্যই আপনার কাছে আসি। এখানে এসে আমি খুব শান্তি পাই।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ সংসার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুমি সাধুর আশ্রমে অর্থাৎ বিশ্রাম ক্ষেত্রে এসেছ। এখানে শান্তি অবশ্যই মিলবে। বিষয় হল বিষ। বিষ কার মধ্যে থাকে? সাপের মধ্যে। বিষয়রূপী সাপের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করে চলেছ। যখন সেই বিষের জ্বালায় অস্থির হও, তখনই সেই জ্বালা দূর করতে তোমাদের এই বিশ্রাম ক্ষেত্রে ছুটে আসতে হয়। এ যেন সাপ ও বেজির লড়াই। সাপ বেজিকে দু-চার ছোবল মারতেই বেজির শরীরে জ্বালা ধরে যায়। বেজি তখন কী করে? বেজি তখন চট্ করে বনের মধ্যে ঢুকে যায়। বনে নানা রকমের ঔষধি থাকে। যে গাছ গাছড়া বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে, বেজি তখন সেই সব গাছ গাছড়া শুঁকতে থাকে, তাতেই তার সাপের বিষ নেমে যায়। বেজি তখন আবার সাপের সঙ্গে নতুন করে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়। তোমরাও তেমনি বিষয় বিষে জর্জরিত হয়ে সাধু-সজ্জন-গুরুজনদের কাছে ছুটে আসো। তাঁদের শ্রীমুখ থেকে যে সব উপদেশ বেরিয়ে আসে, তাতেই সেই বিষের জ্বালা দূর হয়ে যায়। তোমরাও শান্তি পেয়ে আবার ফের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কোনো কোনো সাধক-ভক্তের বেজির মতো স্বভাব আবার কোনো কোনো সাধকের স্বভাব হল মোষের মতো। মোষ কী করে? বিষয়রূপী মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে সে কোনো জলাশয়ের মধ্যে নেমে পড়ে। আবার এই মোষও দুরকম স্বভাবের হয়। এক চালাক আর এক বোকা। যে বোকা সে জল থেকে একটু পরেই উঠে পড়ে আর মশার দল আবার তাকে ছেঁকে ধরে ও কামড়ের জ্বালায় অস্থির করে তোলে। কিন্তু যে মোষ চালাক সে অনেকক্ষণ ধরে জলের মধ্যে ডুবে থাকে এবং বেশ ভালো করে তার সারা গায়ে পুকুরের পাঁক মেখে নেয়। তাই তাকে আর মশা কামড়াতে পারে না, কামড়ালেও জ্বালা ধরাতে পারে না। চতুর ভক্ত যে হয়, তার ভাবও ঠিক এই রকমের। সে চতুর মোষের মতো গুরুর চরণ কমলরূপ জলাশয়ে প্রবেশ করে এবং চলে যাবার সময় তাঁর মুখারবিন্দ থেকে যা কিছু উপদেশ লাভ করে, তা ওই মোষের মতো নিজ হৃদয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেয় অর্থাৎ ঐ চতুর ভক্ত যখন আবার বিষয় সংসারের মধ্যে ফিরে যায় তখন সে কী করে? সে বিষয় ভোগ করে এবং সেই সঙ্গে গুরুপ্রদত্ত যে উপদেশ লাভ করে এসেছে তারও ভজনা করে। ফলে বিষয়রূপী মশা আর তাকে দংশন করতে পারে না। আর দংশন করলেও জ্বালা ধরাতে পারে না। তবে যে মূর্খ হয়, তাকে দৌড়োদৌড়ি করতেই হবে। একবার

গুরুর কাছে গেল, শান্তি পেল, আবার বিষয়ের সংসারে এল, জ্বলতে লাগল, ফের ফিরে এল গুরুচরণে। দেখো ভাই কুমুদ, তুমি তো চতুরই আছ। তুমি সংসার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এখানে এসে শান্তি পাচ্ছ। তাই সংসারে ফিরে যাবার আগে আমার কিছু উপদেশ তোমারে হৃদয় কমলে মাখিয়ে নিয়ে যাও। তবে দৌড়োদৌড়ি করলে হবে না।

দেখো ভাই, সাধক চার রকমের আছে। যথা —

এক) চতুর - চতুর ঃ —এই ধরেনের সাধক গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাধনায় নিষ্ঠা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে।

দুই) চতুর-মূর্খ ঃ এই ধরনের সাধক প্রথম দিকে নিষ্ঠা সহ সাধন ভজনে মন দেয়, পরের দিকে বিগড়ে যায় অর্থাৎ অবহেলা করে।

তিন) মূর্খ-চতুর ঃ এই ধরণের সাধক প্রথম দিকে সাধন ভজনের অবহেলা করে, পরে অবশ্য সাধনায় গভীর মনোনিবেশ করে চতুরতার পরিচয় দেয়।

চার) মূর্খ-মূর্খ ঃ এই ধরনের সাধক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাধনায় মনোনিবেশ না করে মুর্খামির পরিচয় দেয়।

দেখো ভাই কুমুদ, তোমাকে তো চতুর-চতুর সাধক হতে হবে। কেনই বা হবে না। তুমি তো উত্তম অধিকারী। অধিকারী তিন রকমেব — উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী আর অধম অধিকারী। উত্তম অধিকারী গুরুর ইঙ্গিত মাত্রই চট্ করে তা বুঝে নেয়, ফলে শীঘ্রই সে কাজে ফল লাভ করে। মধ্যম অধিকারীকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবার পর তবে সে বুঝতে পারে। তারপর ধীরে ধীরে সাফল্যের দিকে অগ্রসর হয়। অধম অধিকারীকে গুরুদেব যতই বোঝান না কেন তার মাথায় গুরুদেবের উপদেশ কিছুই ঢোকে না, তাই সে কাজে কীভাবে সাফল্য অর্জন করবে?

দেখো কুমুদ, তুমি তো উত্তম অধিকারী। তোমাকে বিশেষ কিছু বলার নেই। তুমি তো ভাই ইঙ্গিতমাত্র আমার উপদেশ বুঝে নেবে এবং কাজে সাফল্য লাভ করবে। তোমাকে যা যা উপদেশ দিয়েছি, সেগুলি তুমি তোমার ধারণার মধ্যে এনে সেইমতো কাজ করবে।

কুমুদ ঃ আপনার আশীর্বাদ থাকলে সব কিছু হয়ে যাবে। আপনি আমার উপর কৃপা দৃষ্টি রাখুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, প্রথমে নিজ অন্তঃকরণের কৃপা হওয়া চাই; তিন কৃপা হলে তবেই হবে, যথা - গুরুকৃপা, ঈশ্বরকৃপা আর নিজ অন্তঃকরণের কৃপা। গুরু তো

কৃপা করছেনই কিন্তু তোমার অন্তঃকরণের কৃপা যদি না থাকে তাহলে তুমি তো গুরুর উপদেশ গ্রহণই করবে না। তাহলে গুরুর কৃপা তোমার কোন্ কাজে লাগবে? কোন কাজেই লাগবে না। গুরু দিচ্ছেন অথচ আমি নিচ্ছিনা। এখন দেখতে হবে অন্তঃকরণের কৃপা ছাড়া যখন গুরু কৃপা ও ঈশ্বর কৃপা লাভ করা যায় না, তখন অন্তঃকরণের কৃপা কীভাবে লাভ করা যায়।

অন্তঃকরণের কৃপা তখন হবে, যখন অন্তঃকরণ শুদ্ধ হবে। শুদ্ধ ও পরিষ্কার কীভাবে হবে? গুরুই তোমাকে তা বলে দেবেন। যে যেমন পাত্র গুরুই তাকে তেমনি উপদেশ দেন। তামা বা পিতলের বাসনকে তেঁতুল দিয়ে মাজতে হয়, তবেই পরিষ্কার হবে। কাঁচের বাসনকে মাঁজতে হয় চুন দিয়ে তবেই পরিষ্কার হয়। রূপোর বাসনকে খড়ি দিয়ে মাজলে তবেই পরিষ্কার হবে। কাপড়ের মতো যদি কোন পাত্র হয়, তবে সাবান দিয়েই পরিষ্কার করতে হয়। সর্বধর্ম মতানুসারে অন্তঃকরণকে শুদ্ধ ও পরিষ্কার করতে হবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সব সম্প্রদায়ের মানুষই একথা মানে। হিন্দু বলে — অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করো। মুসলমান বলে —দিল্‌কো সাফ করো। তবে কীভাবে শুদ্ধ করতে হবে পরিষ্কার করতে হবে তা গুরু বলে দেন। গুরু কাউকে বলেন ধ্যান করতে, কাউকে বলেন পুজো করতে, কাউকে জপ করতে, কাউকে যজ্ঞ হোম করতে, আবার কাউকে পরের উপকার করতে উপদেশ দেন। যার যে মাজনে মাজবার কৌশল বা পদ্ধতিও বলে দেন, কিন্তু মাজতে হবে নিজেকে। গুরু যে তোমার হয়ে মেজে দেবেন, তা হবে না।

দেখো ভাই কুমুদ, তোমাকে যে মাজন দেওয়া হয়েছে তা মনে আছে তো? বীজমন্ত্র ভুলে যাওনি তো? তাতে রোজ জলসিঞ্চন করছো তো? দেখো ভাই, বীজকে পচিয়ে ফেলো না, তাতে অঙ্কুর হওয়া চাই। অঙ্কুর হলেই নিশ্চিত হোয়ো না যত দিন পর্যন্ত অঙ্কুরটি গাছের গুঁড়িতে পরিণত না হয়। গুঁড়ি হয়ে গেলে আর চিন্তা নেই, নইলে শুধু অঙ্কুর হলেই নিস্তার পাবে না। কে জানে কখন সেই অঙ্কুরকে গরু ছাগল এসে মুড়িয়ে খেয়ে যাবে। এখানে গরু ছাগল ইত্যাদি পশুরা কে? এরা হল আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি। যখন ইন্দ্রিয়রা চঞ্চল হয়, তখন ধর্মরূপী বৃক্ষের অঙ্কুরকে তারা খেয়ে ফেলে। আগে তাই ঐ বীজে ভক্তিবারি সিঞ্চন করতে হয়। তারপর যখন অঙ্কুর জন্মায় তখন তাতে নামের বেড়া দিতে হয়। নামের বেড়া দিলে আর ইন্দ্রিয়রূপী পশুরা তাকে খেতে পারবে না। তখন ধীরে ধীরে সেই অঙ্কুর পুষ্ট হবে, তার গুঁড়ি হবে — গুঁড়ি হলে আর কোন ভয় নেই, পশুরা সহজেই সেই বৃক্ষে বাঁধা

থাকতে পারবে অর্থাৎ ধর্মবৃক্ষের যখন গুঁড়ি হবে, তখন ইন্দ্রিয়রূপী পশু ওই ধর্মবৃক্ষে সহজেই বাঁধা থাকবে। আর কোন ভয়ের কারণ থাকবে না। তুমি তখন একদম নিশ্চিন্ত হয়ে সেই ধর্মবৃক্ষের ছায়ায় দিন কাটাতে পারবে।

(শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ হচ্ছেন মধু মক্ষিকার চাক। কোন ভক্ত খোঁচা দিলেই মধু ঝরতে থাকে এবং সেই মধু সকলে প্রাণ ভরে নেয়। তবে যার পাত্র তৈরি হয়েছে, মধু তাতে থেকে যায়। আমি তা নই, তাই মধু থাকে না। মধু ঝরে যায়। আমি ভাষাজ্ঞানহীনা। তবে গুরুদেবের কৃপায় যথাসাধ্য শ্রবণ করে লিখছি। আশা করি-ভক্তগণ ভাষার ত্রুটি না নিয়ে নিজ নিজ ভক্তিভাবে উপদেশগুলির ভাবার্থ গ্রহণ করবেন।)

ত্রয়োদশ পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম ঃ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ঃ বৈশাখ মাস সময় ঃ সকাল
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়
ও
শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[পুতুল (মূর্তি) পুজো করার যৌক্তিকতা ঃ ভক্ত ভগবানের চেয়ে বড় ঃ ভক্তি কীভাবে লাভ করা যায়, সকাম ভক্ত ও নিষ্কাম ভক্ত, 'উলট্ যাও'-এর গল্প]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই প্রমথনাথ, তুমি তো বৈদ্যনাথ শংকরকে দর্শন করতে গিয়েছিলে, তা বৈদ্যনাথ শংকরজী তোমার সঙ্গে কী কথাবার্তা বললেন?

প্রমথ ঃ (হেসে) মহারাজ, শংকর ভগবান হরদম আমার সাথে কথাবার্তা বলে থাকেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, ওই সব কথাবার্তার মর্ম বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ তুমি যে শংকর ভগবানকে দর্শন করলে এটা খুব ভাল। তুমি একজন সজ্জন ব্যক্তি। তুমি যা করবে আর দশজন সাধারণ লোক তোমার ব্যবহার আচার আচরণ শিরোধার্য করে নেবে এবং তারা ওই কার্যে প্রবৃত্ত হবে।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ।। (গীতা-৩।২১)

সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা কর্ম করে থাকে। সাধারণ লোকও ওই সকল কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে সব কর্মকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করে অন্য লোকে তাই অনুসরণ করে।

ভাই প্রমথনাথ, একদিনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। কে. জি. গুপ্ত (স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত) আর পাইকপাড়ার রাজার ম্যানেজার একদিন আমার কাছে এলেন। তাঁরা দুজনেই ব্রাহ্ম, মূর্তি পুজো মানেন না। আমাকে তারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ, পুতুল পুজো করা উচিত কী অনুচিত?' আমি তাঁদের বললাম, "বাবু, আপনারা খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন, তবে এ প্রশ্নের জবাব আমি নিজে দেব না। মায়ীর (কে. জি. গুপ্তের স্ত্রী) সঙ্গে একটু কথা বলব, তা থেকেই আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।"

এই বলে মায়ীকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মায়ী, তুমি যখন ছোট ছিলে তখন তুমি পুতুল খেলা করতে, না করতে না?" মায়ী বললেন, "হ্যাঁ বাবা, পুতুল নিয়ে খেলতাম বইকি। ছোট ছোট মেয়েরা সবাই তো পুতুল খেলে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সব ধর্মালম্বীদের মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলা করে থাকে।" তখন আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "এখনো কি তুমি পুতুল নিয়ে খেলা করো?" মায়ী বললেন, "না বাবা, এখন আর খেলি না।" — "কেন খেলো না?" মায়ী বললেন, "এখন সংসারের আসল খেলা নিয়ে যে মেতে আছি, এই কারণে নকল খেলা ছাড়তে হয়েছে।" তখন কে. জি. গুপ্তকে আমি বললাম, "বাবু, এবার আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন তো?" তিনি বললেন, "মহারাজ, আমি এই বুঝলাম যে যতদিন না আসল খেলায় মাতি, ততদিন নকল খেলা নিয়ে থাকতে হয়। আপনি ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষ, আপনি কেন এসব দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন? এখনো কি আপনি পুতুল পুজো করেন, না করেন না?" ভাবখানা এই যে তিনি যেন জানতে চান আমার আসল বস্তু লাভ হয়েছে কি না। আমি তখন হাসতে তাকে বললাম ঃ "বাবু, এর উত্তরও মায়ীই দেবেন।" আমি আবার মায়ীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মায়ী, তুমি তো এখন আসল খেলা নিয়ে আছ, পুতুল খেলা ছেড়ে দিয়েছ। আচ্ছা বল তো, ছোট ছোট মেয়েরা যখন তোমাকে এসে বলে, মা, কেমন করে পুতুল খেলতে হয় শিখিয়ে দাও, তখন, তুমি তাদের সঙ্গে পুতুল খেলো তো?" মায়ী বললেন, "হ্যাঁ, বাবা, ছোট মেয়েদের শেখাবার জন্য তাদের সঙ্গে পুতুল খেলতে হয় বইকি। নইলে তারা শিখবে কী করে?" তখন আমি কে. জি. গুপ্তকে বললাম "বাবু, মায়ী আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন, আপনি শুনলেন তো? দেখুন বাবু, পূর্ণজ্ঞান লাভ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্যে মায়ীর মতো আমাকেও এই পুতুল পুজো নিয়ে থাকতে হয়।"

আমার কথা শুনে কে. জি. গুপ্ত একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। পরে তিনি বললেন, "মহারাজ, এই পুতুল পুজো নিয়ে আমি কত জায়গায় তর্ক বিতর্ক করেছি, আজ আপনি এত সহজে যা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন তা আমার চিত্তে একেবারে বসে গেছে।"

ওইদিনের সৎসঙ্গে ভদ্রলোক খুবই শান্তি পেলেন। দেখো প্রমথনাথ, লোকশিক্ষার জন্য তুমি মন্দিরে গিয়ে মহাদেবের পুজো করেছ। এটা ভাল কাজ করেছ। এরকম কাজই তুমি করবে। এই সৎসঙ্গের কথা শুনে পণ্ডিত মশাই খুব আনন্দ ও প্রসন্ন চিত্তে বললেন —

প্রমথ ঃ মহারাজ, পনের বছর পর আপনার কাছে আমি এলাম। তবে অন্যের কাছ থেকে বরাবর আপনার খবরাখবর নিয়েছি। এক ব্যক্তি আপনার এখান থেকে আমার কাছে গিয়েছিল, তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি — মহারাজ কেমন আছেন? ওই ব্যক্তি বলল — মহারাজকে জরায় ধরেছে, উনি কিছুটা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তার মুখে একথা শুনে আমার মনটা দুঃখে ভরে গেল। এখানে আপনার কাছে আসবার সময় ভাবছিলাম —মহারাজকে কী অবস্থায় দেখবো, দেখবো যে তিনি জরাগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু এখানে এসে আপনাকে দর্শন করে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। পনের বছরেও আপনার কোন পরিবর্তন হয় নি। পনের বছর আগে আপনার যে মূর্তি দেখেছিলাম এখনও ঠিক সে রকমই আছেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই প্রমথনাথ, তুমি তোমার শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে আর ভক্তিনেত্রে আমাকে নবীন দেখছ। এ ব্যাপারে দুটি ভাব আছে। এক পুত্রভাব — পুত্র চায় যতই আমি বৃদ্ধ হই না কেন পিতার কাছে এখনও আমি নবীন। আর দুই - ইষ্টভাব — নিজ ইষ্টদেবকে যতই দেখো, সব সময় তিনি তোমার কাছ মনোরম ও সুন্দর। আমার শরীর তো বৃদ্ধ হয়ে গেছে। তুমি কিন্তু আমার প্রতি ইষ্টভাব পোষণ কর, তাই তুমি আমাকে সব সময় সুন্দর ও মনোরম দেখছ।

এই সব কথাবার্তার পর শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ একখানি গৈরিক রেশমী নামাবলী পণ্ডিত মশাই-এর গায়ে জড়িয়ে দিলেন, তারপর বললেন — দেখো ভাই প্রমথনাথ, আজ তোমাকে যে চাপরাশ দিলাম তা তুমি একে ওকে দিতে পারবে না। যখন তুমি সভা সমিতিতে শাস্ত্র পাঠ-ব্যাখ্যা করতে যাবে তখন আমার দেওয়া এই চাপরাশ তোমার অঙ্গে লেপ্‌টে থাকবে। দেখো ভাই, এই চাপরাশকে ফেলে দিতে পারবে না। তোমার এ জিনিস অনেক আছে। তাই সাধারণভাবে এগুলির মূল্য নেই। কিন্তু

আমার দেওয়া নামাবলীর মধ্যে রয়েছে স্নেহ। এই নামাবলী আমার স্নেহের দান, এটি আমার স্নেহসিক্ত বস্তু। এই কারণে এটি অমূল্য বস্তু হয়ে গেছে।

প্রমথ ঃ (গদগদ চিত্তে) মহারাজ, আমি যত অধম হয়ে যাচ্ছি, আপনার কৃপা দৃষ্টি আর দয়া ততই আমার উপর বেড়েই চলেছে। আমি অধম, অযোগ্য, আর আপনি অহৈতুকী কৃপা সিন্ধু, আপনি দয়াময়। আপনার এত দয়া আমি রাখব কোথায়?

এই সাথে পণ্ডিত মশাই-এর এরূপ গদগদ ভাবে কথা শুনে ওখানে অনেকেরই তখন চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে চোখ দিয়ে উছলে জল নির্গত হতে লাগল।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো প্রমথনাথ, যিনি দয়াময় হয়ে দয়া করছেন, তিনি বড় নন। যাকে দয়া করা হচ্ছে অর্থাৎ দয়ার পাত্র যিনি তিনিই শ্রেষ্ঠ, কারণ ভক্তিভাবে তিনি তা গ্রহণ করছেন। প্রমথনাথ, তুমি বল—ভগবান বড় না ভক্ত বড়?

প্রমথ ঃ মহারাজ, ভক্ত বড়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ তাহলে দেখ, তোমার ভক্তি ভাব বড় আর আমার দয়া ছোটই।

প্রমথ ঃ মহারাজ, ভক্তিভাব তো চাই, কিন্তু তা পাই না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ কেন তা পাবে না? ভক্তি তো সকলের ভিতরেই আছে, তবে তার গতি নিম্নমুখী, সেই গতিকে ঊর্দ্ধমুখী করতে হবে। ভক্তির চার নাম, প্রথম—মোহ, দ্বিতীয় — স্নেহ, তৃতীয় — প্রীতি, চতুর্থ — ভক্তি। মোহ হয় টাকাকড়ির উপর। দেখো, টাকা রোজগারের ধান্দায় নিজের স্ত্রী, পুত্রদের কথাও মানুষের মনে থাকে না, নিজের শরীরকে পর্যন্ত বিকিয়ে দেয়, পরের দাসত্ব স্বীকার করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। ভগবানকে লাভ করবার জন্যে এরকম মোহ কী দেখা যায়? কখনই নয়। তা যদি যেত। তবে তার ভগবান মিলে যেত।

স্নেহ হয় পুত্রের প্রতি। যতক্ষণ না পুত্র হচ্ছে ততক্ষণ মানুষ ভাল খাবার যা কিছু পায়, নিজেই খেয়ে নেয়। তারপর যখন পুত্র হয়, তখন ভাল খাবার নিজে না খেয়ে পুত্রকে খাওয়ায়, পুত্রকে ভাল ভাল পোষাক পরিয়ে আনন্দ পায়, কত পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করে — সব পুঁজি করে রাখে পুত্রের জন্যে। দেখছ তো — স্নেহ কাকে বলে, স্নেহের একটা উদাহরণ দিচ্ছি —এক সাধুর এক শিষ্য ছিল। ওই শিষ্য সাধুর ঘর ঝাঁট দিত, বাসন মাজত, এটা-সেটা ফাই ফরমাস খাটত। একদিন গুরুর কাছে আসতে শিষ্যের দেরি হয়ে গেল। সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ তোমার আসতে এত দেরি হল কেন?" শিষ্য বলল, "বাবা, আমার বিয়ের আজ পাকা দেখা হয়ে গেল।" সাধু বললেন, "যাক্, তুমি তাহলে আমাকে ছেড়ে চললে, তুমি আর

আমার কোন কাজ করতে পারবে না।" শিষ্য জিজ্ঞাসা করল, "এমন কথা কেন বলছেন, বাবা?" সাধু বললেন, "তোমার বিয়ে হবে, তোমাকে এখন রোজগার করতে হবে। তুমি আমার কাজকর্ম কেমন করে করবে?" এরপর ক'দিন বাদে শিষ্য এসে জানাল যে তার বিয়ে হয়ে গেছে। এবার সাধু তাকে বললেন, "বাবা, এবার তুমি তোমার বাবা-মাকেও ছাড়লে। এখন তুমি যা রোজগার করবে তা তো তোমার বাবা-মাকে আর দেবে না, তোমার স্ত্রীর হাতে সব তুলে দেবে।" আরও কিছুদিনের পর একদিন শিষ্য এসে গুরুকে বলল যে, তার একটি ছেলে হয়েছে। একথা শুনে সাধু বললেন ঃ "যাক্ এবার তুমি নিজেকেও ছাড়লে। এতদিন তবু নিজেদের ভাল খাওয়া, ভাল পরার দিকে তোমার নজর ছিল, এখন তোমার ছেলে হয়েছে, এখন থেকে ভাল যা কিছু পাবে, তা তুমি নিজে না খেয়ে বলবে — আমার ছেলেকে খাওয়াব, ভাল পোশাক ছেলেকে পরাব। এভাবে এখন তুমি নিজেও বঞ্চিত হলে।"

প্রমথনাথ, এখন দেখো, ছেলের প্রতি মানুষের এতই স্নেহ যে সে তারজন্যে নিজেকেও কিভাবে বঞ্চিত করে। এই স্নেহ যদি ভগবানের জন্যে হয়, যদি মনে এই ভাব জাগে যে যা কিছু ভাল জিনিস্ মিলল তা প্রথমেই ইষ্টদেবকে নিবেদন করে দেব, ভগবানকে অর্পণ করব, তাহলেই স্নেহ উর্দ্ধগামী হবে। নইলে পুত্রের প্রতি এই যে স্নেহ তা নিচের দিকেই নিয়ে যায়, তা আর উপরে উঠতে দেয় না।

মোহ আর স্নেহের কথা হল। এবার প্রীতি, প্রীতি হয় স্ত্রীর প্রতি। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসায় মানুষ কত কাণ্ডই না করে চলেছে, কিন্তু এই প্রীতি যদি সে ভগবানে অর্পণ করতে পারে, তাহলেই তা উর্দ্ধগামী হয়ে ওঠে।

মোহ, স্নেহ, প্রীতি — এই তিনটি যখন উর্দ্ধগামী হয়, তখন তার নাম হয় ভক্তি। ভক্তি আলাদা কোন ব্যাপার নয়। মোহ, স্নেহ, প্রীতি তো সকলের মধ্যেই রয়েছে। এদের ঈশ্বরমুখী করতে পারলেই তা উর্দ্ধগামী হবে আর তারই নাম হবে ভক্তি। চিত্ত একেবারে নিষ্কাম হলে তবেই ভক্তি হতে পারে, নিষ্কাম না হলে হবে না। সকাম ব্যক্তির কামনা পূর্ণ হলেই সে আর ভগবানকে ডাকবে না। আর তার কামনা পূর্ণ না হলে সে তো টিকে থাকবেই না, সে হটে যায়। আচ্ছা প্রমথনাথ, নিষ্কাম কাকে বলা হয়?

প্রমথ ঃ মহারাজ, যে ঈশ্বরের কাছে কিছু চায় না, একমাত্র ঈশ্বরকেই চায়, সে-ই নিষ্কাম ব্যক্তি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে কামনা করে সে কি কম কামনা করে? আমি কিছু

চাইছি না, কিন্তু আমি একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে চাইছি, এটা কি কামনা নয়? হে ঈশ্বর, আমি তোমার কিছু বিভূতি নেব না। তবে আমি তোমাকে নিয়ে নেব, তাহলে এই কামনা নিষ্কাম কী করে হয়?

প্রমথ ঃ নিষ্কাম ব্যক্তি ঈশ্বরকেও কামনা করে না, তবে ঈশ্বরের প্রসন্নতা কামনা করে। হে ঈশ্বর, তুমি প্রসন্ন থাকো, তুমি প্রসন্ন হও — এটাই আমার কামনা। তবে তিনি নিজ স্বভাববশত নিজেকে ভক্তের কাছে বিলিয়ে দেন। এটা তাঁর স্বভাব, ভক্ত না চাইলেও তিনি এটা করে থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, নিষ্কাম কোন ব্যক্তি হতে পারে না। "বিনা প্রয়োজনে মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে।" প্রয়োজন ছাড়া কোন কাজ মন্দলোকও করে না, ভাল লোক কেন করবে? বিনা প্রয়োজনে কোন কাজ হয় না। তবে নিষ্কামীদের কথা হল — হে ঈশ্বর, আমি তোমার কাছ থেকে কিছু নেব না, কিন্তু তোমার সর্বস্ব আমি অধিকার করে নেব। এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ আছে ঃ—

এক সাধুপুরুষ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, সামনে দেখলেন এক সুন্দর বাগানবাড়ি, মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি। বাড়িটির সামনেই দেখা হয়ে গেল বাড়ির মালিক সে দেশের রাজার সঙ্গে। সাধু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজাসাহেব, এ বাড়ি কার? আপনার?" রাজা বললেন, "না ভাই, এ বাড়ি আমার নয়, ভগবানের।" আবার সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজাসাহেব, এ সুন্দর বাগানটি কার, আপনার?" রাজা বললেন, "না ভাই, এ বাগান আমার ভগবানের।" বাগানের মধ্যে একটি স্বচ্ছ সরোবর দেখে সাধু জানতে চাইলেন, "রাজামশাই, এ সরোবরটি কার?" রাজা বললেন, "এ সরোবরটি আমার ভগবানের।" আরও এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল একটি সুন্দর মন্দির। তা দেখে সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, "এ মন্দিরটি কার?" রাজা বললেন, "আমার ঠাকুরের।" শেষে যখন মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে দেব বিগ্রহের দর্শন মিলল তখন সাধু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা রাজামশাই, এ ঠাকুরটি কার?" এবার রাজা উত্তর দিলেন, "ঐ ঠাকুরটি কেবল আমার। সব কিছু ভগবানের, কেবল ভগবান শুধু আমার।"

দেখো ভাই প্রমথনাথ, এতেই তো বোঝা গেল সব কিছুই ভগবানের কিন্তু স্বয়ং ভগবানকে ভক্ত নিজের আপন করে নিল। যখন তাঁকেই নিজস্ব করে নিল তখন আর বাকি রইল কী? ঈশ্বরকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই মিলে গেল। স্বয়ং ঈশ্বরই যার কাম্য, তাকে তাহলে নিষ্কাম বলা যায় কী করে? তবে এর মধ্যে একটা

কথা আছে — ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্যে যে সুখ, সে সুখ হল কামনাযুক্ত আর ইন্দ্রিয় রহিত যে সুখ, সে সুখকে নিষ্কাম বলা হয়। ঈশ্বর তো ইন্দ্রিয়ের অতীত, তিনি তো ইন্দ্রিয়ের বিষয় নন, তাই ঈশ্বরকে লাভ করবার যে প্রার্থনা, তাকে নিষ্কাম বলতে কোন দোষ নেই। তাঁকেই নিষ্কাম ভক্ত বলা হয়।

প্রমথ ঃ আমাদের বাংলা বই-এ আছে ঃ—

আত্ম ইন্দ্রিয় সুখ ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণ সুখ বাঞ্ছা যাহা, ধরে প্রেম নাম।।

মহারাজ, এর ভাবার্থ হল — নিজ সুখের জন্যে যে আকাঙ্ক্ষা করা হয়, তাকে কামনা বলা হয়। আর ঈশ্বরের প্রীতি ও সুখের জন্যে যে কাজ করা হয়, তাকে বলা হয় নিষ্কাম। হে ঈশ্বর আমার সুখ চাই না, আমি তোমার সুখ চাই — এই ভাবকেই আমাদের বাংলার কবি নিষ্কাম বলেছেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ ভাই, ভাবকে উল্‌টে দিতে হবে। উল্‌টে দিলেই সোজা হয়ে যাবে। এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। তোমাকে বলেছিলাম, মনে আছে তো?

এক পণ্ডিত বহু শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করেছেন, কিন্তু তার মনে শান্তি নেই। একদিন তিনি এক সাধুর কাছে গিয়ে বললেন, "বাবা, আমি তো কত শাস্ত্র পাঠ করলাম, কিন্তু তবু আমার মনে শান্তি মিলল না। কী করে আমি শান্তি পাব?" সাধু বললেন, "আগে তুমি নদীতে স্নান করে এসো, তারপর বলব কীসে তুমি শান্তি পাবে।"

পণ্ডিত নদীতে গেলেন স্নান করতে, এমন সময় একটি মাছ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করল, "ওহে পণ্ডিত, আমি জলে থাকি, জলও খাই, কিন্তু তবু আমার তৃষ্ণা মেটেনা। তুমি তো অনেক শাস্ত্র পড়েছো, এর কোন উপায় বলতে পার?" পণ্ডিত বললেন, "তোমার গলার দুপাশে কানকোর মধ্যে যে ফুটো রয়েছে, তুমি জল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ফুটো দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, তাই তোমার পিপাসা মেটে না। তুমি এক কাজ করো, জল মুখে নেবার সাথে সাথে তুমি উল্‌টে যাও, তাহলে আর জল বেরিয়ে যাবে না, কিছুটা জল অন্তত তোমার পেটে যাবে, আর তাতে তোমার তৃষ্ণা মিটবে।" এই বলে পণ্ডিত স্নান সেরে সাধুর কাছে এসে বললেন, "আমাকে এবার বলুন, কিসে আমার শান্তি মিলবে।"

সাধু বললেন, "ভাই, তুমি মাছকে যে উপদেশ দিয়েছ, ঐ একই উপদেশ তোমার পক্ষেও খাটবে। তুমিও উল্‌টে যাও। মাছের মতো তুমিও তো শাস্ত্র - সমুদ্রে ডুবে রয়েছ, কিন্তু শাস্ত্রের বাণী তোমার পেটে ঢুকছে না। বমি হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই

তোমার তৃষ্ণা মিটছে না, তুমি শান্তি পাচ্ছ না। তাই আমার উপদেশ, তুমি মাছের মতো উল্‌টে যাও। শাস্ত্রের বাণী যাতে হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে তার জন্যে বর্হিমুখী মনকে অর্ন্তমুখী করতে হবে, সংসারমুখী মনকে ঈশ্বরমুখী করতে হবে। এইভাবে মনকে উল্‌টে দিতে পারলেই সব সোজা হয়ে যাবে, জীবনে শান্তি মিলবে।"

এই দিনের সৎসঙ্গ শুনে পণ্ডিত মশাই খুব আনন্দ পেয়েছিলেন।

চতুর্দশ পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম ঃ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ ঃ বৈশাখ মাস, সময় ঃ সকাল
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়
ও
শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ
[তালমে ভঙ্গ্ না পায় ঃ ভাগবতের পণ্ডিত ও সৈনিক ঃ সৎসঙ্গ ও সাধু সঙ্গের প্রভাব ঃ সঙ্গ ও প্রসঙ্গ ঃ দয়া ধর্মের মূল ঃ অভিমান নরকের মূল ঃ অভিমান দূরীকরণের উপায় ঃ ভগবান প্রেমের কাঙাল]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই প্রমথনাথ, আমার অন্তিম কাল ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে।

প্রমথ ঃ না মহারাজ, আপনার একথা আমি শুনব না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, তুমি শোন আর না শোন যমদূত যখন এসে দাঁড়াবে, তখন সে কি তোমার কথা শোনার অপেক্ষায় থাকবে?

প্রমথ ঃ মহারাজ, আমার ভাবনা এই যে, আমি যদি আপনার আগেই চলে যেতে পারি তাহলে খুব ভাল হয়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী আমাকেই তো আগে চলে যেতে হবে, কেননা বয়সে আমি বড়, তুমি ছোট।

প্রমথ ঃ না মহারাজ, প্রাকৃতিক এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই যে, বয়সে যে বড় সে আগে চলে যাবে, আর যে ছোট সে পরে যাবে। বয়সে যে ছোট সে বড়র চেয়ে আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে।

এই সব কথা যখন হচ্ছিল, তখন শ্রীশ্রী গুরু মহারাজ একটি দোঁহা শোনালেনঃ

বহুৎ গয়ী থোড়ী রহী, থড়ী ভী অব্ জায়।
কহে নট সুন্ নায়িকা, তাল্‌মে ভঙ্গ্ না পায়।

প্রমথ ঃ মহারাজ, এই দোঁহার তাৎপর্য কী?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এই দোঁহাটি শুনে চারজনের একসাথে বৈরাগ্যের উদয় হয়েছিল। তাহলে গল্পটি শোন –

এক ছিলেন রাজা, তিনি বড় কৃপণ ছিলেন। একদিন তাঁর রাজসভায় এক নট ও নর্তকী এসে বলল, "মহারাজ, আপনি অনুমতি করুন, আপনার সভায় নাচ-গান করে দেখাই।" রাজা দেখলেন, এদের তো তাহলে টাকা দিতে হবে। তাই তিনি অনুমতি দিতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। এদিকে তাঁর মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ নাচগানের জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। তাঁরা তখন রাজাকে বললেন, "মহারাজ, এতে আপনার কোন খরচ হবে না। যারা এদের অনুষ্ঠান দেখবে তারাই এদের পুরস্কার দেবে। আপনি দয়া করে অনুমতি দিন।" রাজা অগত্যা রাজি হলেন।

সন্ধ্যাবেলায় নট আর নর্তকী তাদের অনুষ্ঠান শুরু করল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, রাত পোহাতে আর বেশি বাকি নেই, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তারা একটি পয়সাও বকশিস্ পেল না। ক্লান্ত নর্তকী তখন গানের ছলে সংকেতে তার স্বামী নটকে বললঃ

রাত দো ঘড়ী রহ্ গয়া, থক্ গয়া পিঞ্জর আজ।
কহে নটী সুন্ বামদেব, খালী তাল বাজ।।

রাত পোহাতে আর তো দু-ঘণ্টা বাকি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এ দেহ পিঞ্জর। তাই নটী বলছে– "শোনো বামদেব, খালি খালি তাল বাজিয়ে যাচ্ছ কেন, যখন এত পরিশ্রম করে লাভ হল না কানাকড়িও"। শোনামাত্র নটও পূর্বে উল্লেখিত দোঁহাটি শুনিয়ে দিল ঃ বহুৎগয়ী থড়ী রহী, থোড়ী ভী অব্ জায়, কহে নট সুন্ নায়িকা, তাল মে ভঙ্গ্ না পায়।

এই দোঁহার তাৎপর্য হল রাতের বেশির ভাগটাই তো কেটে গেল। রাত পোহাতে আর সামান্যই বাকি এবং সেই সামান্যটুকুও শেষ হবার মুখে। তাই নট বলছে – শোন্ নায়িকা, তালে আর ভঙ্গ দিস্ না, রাতের বাকি সামান্য অংশটুকুও নেচে চল্।

যেই না একথা বলা, অমনি এক সাধু যে এতক্ষণ সব শুনছিল তার গায়ের একমাত্র কম্বল খানি খুলে নটকে দিয়ে দিল। রাজপুত্র খুলে দিল তার হাতের জড়োয়া চুড়। রাজকন্যা খুলে দিল তার মুক্তোর মালা। এসব কাণ্ড দেখে রাজা অবাক হয়ে গেলেন। রাজা প্রথমে সাধুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার একমাত্র সম্বল কম্বলখানা আপনি ওদের দিয়ে দিলেন কেন?"

সাধু বললেন, "এই নটের দোঁহায় আমার কী যে উপকার হয়েছে কী বলব? আমি নাচগান দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম আহা! আমি

যদি এমন রাজত্ব পেতাম তাহলে নাচগান উপভোগ করে ফুর্তিতে সময় কাটাতে পারতাম। কিন্তু নটের কথা শুনে আমার চৈতন্য হল – ছি, ছি এত দীর্ঘদিন সাধন ভজন করে এখন মরবার সময় কি না এরকম ভোগবাসনা জাগল? এমন ভাব আর কখনও যেন মনে না আসে, তাল যেন ভঙ্গ না করি। এই বৈরাগ্য জাগার ফলেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি আমার একমাত্র সম্বল। কম্বল খানা ওকে দান করে কৃতার্থ হলাম।'

তারপর ছেলেকে ডেকে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমিই বা নটকে অমন বহুমূল্য অলংকার দিতে গেলে কেন?

রাজপুত্র বলল, "যদি আপনি আমার অপরাধ না নেন, তাহলে বলি। আমি এখন বড় হয়েছি। অথচ নিজের ইচ্ছামতো খরচপত্র করবার ক্ষমতা আমার নেই, কারণ আপনি আমাকে টাকা পয়সা কিছুই দিতে চান না। তাই আমার মনে এই পাপ চিন্তা জেগেছিল যে বাবা তো বুড়ো হয়েছেন, আজ রাতে তাকে খুন করে আমি রাজা হয়ে বসব, তাহলে নিজের খুশিমতো সব কিছু ভোগ করতে পারবো। কিন্তু এই নটের দোঁহা শুনে আমার হুঁশ হল। ভাবলাম, বাবা আর কদিন বাঁচবেন? এমনিই তিনি তো মারা যাবেন। তখন তো রাজত্ব আমিই পাব। তবে এখন কেন তালভঙ্গ করে পিতৃহত্যার দায়ে নিজেকে লিপ্ত করি?"

শেষে রাজকন্যাকে ডেকে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ মা, তুমি তোমার গলার হার খুলে ঐ নটকে দিয়ে দিলে কেন?

রাজকন্যা বলল, "বাবা আপনি রাগ করবেন না, অপরাধ ক্ষমা করুন। দেখুন বাবা, আমার এখন বিয়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু খরচ হবার ভয়ে আপনি আমার বিয়ে দিচ্ছেন না। তাই আমি ভেবেছিলাম কাল আমি কুল ত্যাগ করে মন্ত্রীর ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করব। ইতিমধ্যে নটের দোঁহা শুনে আমার মনে হল – বাবা আর কদিনই বা বাঁচবেন? আমি এ রকম করলে তাঁর কলঙ্ক হবে। এতদিনই যখন কাটিয়ে দিলাম, আরও কিছু দিন গেলই বা, বাবাকে আর দুঃখ দিই কেন। শুধু শুধু তাল ভঙ্গ করি কেন? তাই নটের দোঁহা শুনে এই কথাগুলি মনে হল – তাই আমি গলার হার খুলে তার হাতে দিয়েছি।"

এই সব কথা শুনে রাজারও মনে বৈরাগ্য জাগল। তিনি ভাবলেন, আমার মরণ তো ঘনিয়ে এসেছে, তবে কার জন্যে এত কৃপণতা করছি? তাই স্বেচ্ছায় তিনি রাজপুত্রের হাতে রাজ্যভার তুলে দিলেন। মেয়েরও বিয়ে দিলেন মহাসমারোহ

করে এবং তারপর সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মুক্ত করে নিলেন নিজেকে।

দেখো ভাই প্রমথনাথ, এক নটের একটি মাত্র দোঁহায় চারজনের মধ্যে বৈরাগ্য জন্মে গেল। কোন্ কথা কার হৃদয়ে কখন কীভাবে কাজ করে তা কেউ বলতে পারে না।

প্রমথ ঃ মহারাজ, এই দোঁহাটি আমি লিখে নেব। আমাকে অনেক জায়গায় ভাষণ দিতে হয়, সেই সব ভাষণের মধ্যে আমি এই দোঁহাটি প্রয়োগ করব। নট-নটীর এই দোঁহা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছি।

এই বলে পণ্ডিত মশাই দোঁহা দুটি লিখে নিলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই প্রমথনাথ, আমার মনেও এই দোঁহার অর্থ উপলব্ধি হয় যে, জীবনের বহু সময় চলে গেল, আর কিছু সময় বাকি আছে। তোমারও জীবনের অনেক সময় চলে গেছে আর একটু সময় বাকি আছে তাই এই সময় যেন জীবনের তালভঙ্গ না হয়। ভাই প্রমথনাথ, কত লোককে কত উপদেশ তুমি দিয়ে থাক, তাই তোমাকে আর কী উপদেশ দেব?

প্রমথ ঃ মহারাজ, আপনার কাছে আমি তো শিশু। আপনার অনুপস্থিতিতে আমি তো কত জায়গায় উপদেশ দিয়ে বেড়াই, শাস্ত্র ব্যাখ্যা করি, কিন্তু আপনার কাছে আমার ব্যাখ্যা কিছু নয়। মহারাজ আমি তো বহু লোককে উপদেশ দিয়ে থাকি, কিন্তু তবু নিজে উপবাসীই থেকে যাই।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, এ সম্পর্কে তোমাকে একটা গল্প শোনাচ্ছি।

এক ময়দানে ভাগবতের কথা হচ্ছিল। সেই সময় এক সেপাই সেখান দিয়ে যাচ্ছিল ঘোড়ায় চেপে। লোকজনের ভিড় দেখে সে একজনকে জিজ্ঞাসা করল, এখানে এত ভিড় কিসের? লোকটি বলল, "এখানে ভাগবত পাঠ হচ্ছে কিনা, তাই এত ভিড় হয়েছে।" সেই কথা শুনে সেপাই তার ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে ভাগবত শুনতে লাগল, ভাগবতের পণ্ডিত তখন বলছিলেন জগৎ সংসার সবই মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। যেই না সেকথা কানে শোনা অমনি সেপাই-এর বৈরাগ্য দেখা দিল। সে তখন তার ঘোড়াটাকে বেচে দিয়ে ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়ল সংসার ত্যাগ করে।

দশ পনের বছর পর সেই ফকির ঘুরতে ঘুরতে সেই ময়দানের কাছে এসে দেখলেন, সেদিনও সেখানে আগের মতোই লোকজনের ভিড় জমেছে। তাই দেখে তিনি একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে এত ভিড় কেন?" সে বলল, "এখানে

ভাগবত পাঠ হচ্ছে।" শুনে তো ফকির অবাক। বললেন, "এখনো এখানে কথা হচ্ছে?" তখন লোকটি বলল, "এখানে একজন পণ্ডিত আছেন, তিনি প্রায় কুড়ি বছর ধরে এই ভাগবতী কথা বলে যাচ্ছেন এবং প্রতিদিন ঠিক এমনই ভিড় হয় তার কথা শুনতে।"

ফকির তখন সেই পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বললেন, "মশাই, আমি তো এক চাপড় খেলাম, আর তাতেই আমার চৈতন্য হয়ে গেল। সেই এক চাপড়েই আমি মিথ্যা সংসারকে ত্যাগ করে ব্রহ্মের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর আপনি নিত্য কত চাপড় খাচ্ছেন, তবু আজ পর্যন্ত আপনার চৈতন্য হল না।" দেখো ভাই প্রমথনাথ, এখানেও তুমি অনেক চাপড় খেয়েছ ও খাচ্ছ। তোমারও তো এতদিনে চৈতন্য হওয়ার কথা।

প্রমথ ঃ "মহারাজ, চৈতন্যময় চৈতন্য না দিলে চৈতন্য হবে কী করে?"

শ্রীশ্রীগুরু ঃ "ভাই, তাহলে তোমার চৈতন্য না হওয়া পরমাত্মারই দোষ?"

প্রমথ ঃ হ্যাঁ মহারাজ, নিশ্চয় তাঁর দোষ। মায়াকে তিনি সৃষ্টি করতে গেলেন কেন? এই মায়া সৃষ্টি করেই তো তিনি আমাদের ফাঁসিয়েছেন। সৃষ্টি না হয় করলেন, কিন্তু আমাদের তাতে ফাঁসাতে গেলেন কেন? তাঁর চেয়ে দোষী, তার চেয়ে ঠগ আর তো কেউ নেই, মহারাজ।"

ভগবানের উপর কতখানি অভিমান করে যে পণ্ডিত মশাই কথাগুলি বললেন, তা সেখানে উপস্থিত সকল শ্রোতারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পুনরায় পণ্ডিত মশাই বলতে লাগলেন।

প্রমথ ঃ সৎসঙ্গ ও সাধু সঙ্গে আমাদের চৈতন্যের উদয় হয়ে থাকে, এছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উপায় নেই। সংসারে দেখা যায় যে আমরা যার সঙ্গ করব, আমাদের মনের গতি সে সময় সেরকমই হবে। উকিল ব্যারিস্টারের সঙ্গ করলে কেমন করে মামলা জেতা যায় সেই চিন্তাই মনকে পেয়ে বসে। ব্যবসায়ীর সঙ্গ করলে এক টাকায় জিনিস কিনে কেমন করে তা দু টাকায় (তার কমে নয়) বিক্রি করা যাবে, সেই চিন্তায়ই মন সব সময় মগ্ন থাকবে। আবার সাধুদের কাছে গেলে সেখানে ঈশ্বর প্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছুই হয় না। হৃদয়কমল ঈশ্বরভাবে ভাবিত হয়ে যায়, অবশ্য সাধুর আশ্রমেও আশ্রম সংক্রান্ত বৈষয়িক আলোচনা হয়ে থাকে, কিন্তু তার মূলেও থাকে ঈশ্বর ভাবনা। সাধুর আশ্রমে একটা স্থান মাহাত্ম্য আছে, তার দরুন সেখানে সব কিছু ঈশ্বরভাবে ভাবিত, সব কিছুর কেন্দ্রে থাকেন ভগবান। তাই সাধুর সঙ্গ করতে হবে।

সঙ্গ দু'রকম ঃ এক সঙ্গ, দুই প্রসঙ্গ। সঙ্গ, যেমন দুপুরে রোদ্দুর লেগে শরীর গরম হয়ে গিয়েছে, ঝট্ করে একটু জলের সঙ্গ করে নিলাম, শরীর ঠাণ্ডা হল। এ হল ক্ষণিক সঙ্গ। আর প্রসঙ্গ করে মোষ। সে শুধু গায়ে একটু জল লাগিয়েই উঠে পড়ে না, পুকুরের কাদামাটিও গায়ে ভালো করে মেখে নেয়। তাই জল ছেড়ে উঠলেও তার গায়ে রোদের তাপ লাগে না, গা শীতলই থাকে। তেমনি মহারাজ, আপনার কাছে এলে সংসার তাপ থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি লাভ করি, আপনার পুণ্য সঙ্গের প্রভাবে ক্ষণিক শীতলতা অনুভব করি। কিন্তু এখান থেকে চলে গেলেই আবার সেই তাপে দগ্ধ হতে হয়। যদি ওই মোষের মতো আপনার প্রসঙ্গ করে নিতে পারি, আপনার সাধু স্বভাব এবং সৎ উপদেশ কিছু নিজের হৃদয়ে বসিয়ে নিতে পারি, তাহলে আর আমাকে সংসারের তাপ চট্ করে আক্রমণ করতে পারবে না। সঙ্গ করলে ক্ষণিকের জন্য শান্তি হয়, আর প্রসঙ্গ করলে শান্তি স্থায়ী হয়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ তুমি যা বলেছ তা সর্বসম্মত, সকল লোক এই বক্তব্য বিষয়কে মান্য করে থাকে। যার সঙ্গ তুমি করবে, তোমার চিত্ত সেই ভাবেই ভাবিত হবে। এতে কোন সংশয় নেই। দেখো ভাই প্রমথনাথ, তুমি তো একজন শাস্ত্রজ্ঞ, মহামহোপাধ্যায় ও পণ্ডিত। তোমাকে তো বেশি বলার প্রয়োজন হয় না। তুমি উল্টে যাও। তুমি উল্টে গেলেই সোজা হয়ে যাবে।

প্রমথ ঃ মহারাজ, আমাদের কল্যাণের জন্য আপনি কত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কত সময় ধরে আপনি বক্‌বক্ করে চলেছেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ ভাই, উকিল ব্যারিস্টারদের উদ্দেশ্য আমার বার্তা হল যে, তোমরা যদি আমার মতো এতক্ষণ ধরে বকবক করে মক্কেলদের জন্য সময় ব্যয় করতে তাহলে তোমাদের ফি হয়ে দাঁড়াতো একশো / দুশো টাকা। এতক্ষণ ধরে আমি যে তোমাদের উপদেশ দিলাম, কোন লোক যদি সেই উপদেশ গ্রহণ করে এবং তার কল্যাণ হয়, তবে সেটাই হবে আমার প্রাপ্য ফি। এক কথায় আমার উপদেশ মনে রাখতে পারলেই আমার ফি মিলে যাবে।

প্রমথ ঃ মহারাজ, আপনি হলেন দয়াময়। মানুষের কল্যাণের জন্য আপনার এই সৎসঙ্গরূপ দয়া বর্ষণ হয়ে চলেছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ''দয়া ধরমকা মূল হ্যায়, নরক মূল অভিমান।
তুলসী দয়াকো না ছোড়িয়ে, যব্ তক্ ঘটমে প্রাণ।।''

অর্থাৎ দয়া হল ধর্মের মূল, যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে ততদিন দয়াকে ত্যাগ

করবে না। আর নরকের মূল হল অভিমান। এই অভিমানকে ত্যাগ করতে হবে। কী প্রমথনাথ, জীবের যে অভিমান তা কীভাবে দূর হবে?

প্রমথ ঃ মহারাজ, সাধন বলেই তো দূর হয়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, অভিমানকে দূর করা খুবই দুরূহ। সাধনা করলেও অভিমান কোন না কোন ভাবে থেকে যায়। অভিমানকে উর্দ্ধমুখী করতে হয়, যেমন — সোঽহম্ সচ্চিদানন্দোঽহম্ শিবোঽহম্ নিরঞ্জনোঽহম্, নিরাকারোঽহম্।

এই সব কথাবার্তার মধ্যে আশ্রমের বড় পণ্ডিতজী বললেন —

মহারাজ, আপনার সামনে আজ যে সৎসঙ্গ বা সভা চলছে তা হল ভক্তসভা। এই সভায় শিবোঽহম্ সোঽহম্ ইত্যাদি কথাগুলি মনে ঠিক ধরছে না, তাই এখানে দাসোঽহম্ কথাটি বললেই ভাল হয়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ কথাটি ঠিকই বলেছ। আমাদের প্রার্থনা হবে — হে ঈশ্বর, তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাস। দেখো প্রমথনাথ, জ্ঞান লাভের পথে বাধা তিনটি — মল, আবরণ ও বিক্ষেপ। এর মধ্যে বিক্ষেপ কিছুতেই দূর হতে চায় না। পূর্ণ জ্ঞানীর কি রকম অবস্থা হয়, তা শোন। একটি লোক প্রচুর মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, বাইরের কোন হুঁশ তার নেই, কোথায় কোন্ খানা-খন্দে পড়ে রইল, কাপড়-চোপড়ের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই, হয়তো উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতে লজ্জা সরমের কোন বালাই নেই। তেমনি কোন সাধক যখন ধর্মের মদে মাতাল হয়ে বিভোর হয়ে যায়, তখন তারও বাইরের শরীরের কোন হুঁশ থাকে না। তার বিক্ষেপ চলে গেলেও কিছুটা অবশ্য থেকে যায়। দেখো ভাই প্রমথনাথ, আমার তো অন্তিমকাল এগিয়ে আসছে। তাই ভগবানের প্রতি অচলাভক্তি থাকাই শ্রেয়।

অনায়াসে মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
তব দয়া কৃপাসিন্ধো তব ভক্তিরেবচ অচলা।।

— হে ভগবান, আমার মরণ যেন সহজে হয় আর জীবন যেন দৈনদশাগ্রস্ত না হয়। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, তোমার চরণকমলে আমার যেন অচলা ভক্তি থাকে — এটাই আমার প্রার্থনা, অন্য কোন প্রার্থনা আমার নেই। ভাই প্রমথনাথ, সব লোক তো ভগবান, ভগবান করে আর মাথা ঠোকে, কিন্তু তাঁর সন্ধান করে না। সন্ধান করতে জানে না। এ সম্পর্কে একটি কথা আছে —

''ভগবান রহ্‌তা হ্যায় কাঁহা? ভগবান খাতা হ্যায় কেয়া?
ভগবান হাস্‌তা হ্যায় কব্? ভগবান কেয়া কাম কর্‌তা হ্যায় ?''

এই চারটি প্রশ্নের উত্তর আছে। প্রথম, ভগবান কোথায় থাকেন? অর্থাৎ ভগবান কোথায় থাকেন? ভগবান থাকেন সকলের হৃদয়ে। আপন হৃদয়ে ডুব দিয়ে ডাকতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়, ভগবান কী খান? মানুষের অভিমানকে তিনি খেয়ে থাকেন। মানুষের দর্পকে এইভাবে নাশ করেন বলে তাঁর নাম দর্পহারী। তৃতীয়, ভগবান হাসেন কখন? মানুষের বেইমানী দেখে ভগবান হাসেন। মানুষ কী রকম বেইমান তা দেখো। মানুষ বলে – আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার ধন, আমার দৌলত, ঘর-বাড়ি যা কিছু সব আমার। ছেলেকে বলছে আমার, তবে সকলের ছেলে হয় না কেন? অনেক স্ত্রী তো বন্ধ্যা হয়ে থাকে। আসল কথা হল যা কিছু মেলে সব ঈশ্বরের দান, তিনি দিলে তবেই হয়। মানুষ একথা মানতে চায় না। চতুর্থ, ভগবান কোন কাজ করেন? ভগবান রাজাকে গোলাম বানান, আর গোলামকে রাজা করেন। কাজীকে পাজী আর পাজীকে করেন কাজী। তাই ভগবান শংকরের একটি নাম ভাঙ-গড়, একদিকে তিনি ভাঙেন, অন্যদিকে গড়েন।

দেখো, মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন সে ভগবানের কাছে কত মানসিক করে – হে ভগবান, এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর। আমি তোমাকে এই দেবো, ওই দেবো। তারপর যখন বিপদমুক্ত হয়, তখন সব ভুলে যায়, আর ভগবানকে মনে রাখে না। তাহলে দেখো – মানুষ কত বেইমান। ঈশ্বর হলেন মালিক — একথা সে ভুলে যায় আর নিজেকেই মালিক মনে করে। পুত্র যদি তোমার হয়, তাহলে ভগবান যখন তাকে তুলে নিতে আসেন তা তুমি রদ করতে পারবে? পারবে না। তোমার ধন সম্পত্তি যা আছে তোমার ইচ্ছা না থাকলেও কেন তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? তুমি নষ্ট হতে দিও না!

প্রমথ ঃ মহারাজ, আপনি অনেকক্ষণ ধরে ভিক্ষা দিয়ে চলেছেন এখন আপনি উঠুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ ভাই, ভগবান তো সব মানুষের খিদে নিবারণ করে দিচ্ছেন, সমস্ত প্রাণীর ভিক্ষা পূরণ করছেন। কিন্তু তিনি নিজে উপবাসী রয়ে যাচ্ছেন কেন? তিনি তো দুনিয়ার মালিক, কোনো জিনিসেরই তার অভাব নেই। তবে অভাব শুধু একটি জিনিসের, তা হল প্রেম। তিনি যে প্রেমের কাঙাল। প্রেমই তিনি পেতে চান, তাতেই তাঁর সন্তোষ। কিন্তু প্রেমই তিনি পান না। প্রেমের বাঁধনে বাঁধতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

"বিনা প্রেমসে নেহি মিলে নন্দ কি লালা"

ভগবানকে প্রেম না দিলে তাঁকে পাওয়া যায় না। কোন মানুষ যদি নন্দলালাকে প্রেমের বাঁধনে বাঁধতে পারে, তাহলে সে নন্দকুমারকেই লাভ করে।

(এই সৎসঙ্গের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি ভাষাজ্ঞানহীন নারী, এই সৎসঙ্গ শুদ্ধ ভাষায় লিখতে জানি না। এ যেন বামনের চাঁদ ধরার মতো আমার চেষ্টা করা, তবে যদি ভগবান শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের কৃপা হয়, তাহলে সকলই সম্ভব হয়, এই আশাতেই যতদূর সম্ভব লিখলাম। একটি শ্লোক আছে ঃ–

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।।

– হে পরমানন্দ মাধব, তুমিই যদি কৃপা কর তবে সবই সম্ভব হয়। বোবার বাচালের মতো কথা হয়, খোঁড়া পর্বত উল্লঙ্ঘন করতে পারে। অতএব হে গুরু, হে ইষ্টদেব, হে মাধব, আমি দীন হীনা মূর্খ নারী, তোমার কৃপার ভিখারী, তুমি যদি কৃপা না কর, তাহলে আমার পক্ষে এই অমূল্য অমৃতোপম উপদেশমালা সংগ্রহ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। হে গুরু, আপনি কৃপাসিন্ধু অহৈতুক কৃপা করে এই কন্যার বাঞ্ছাপূর্ণ করুণ। আপনি বাঞ্ছা কল্পতরু, আপনার শ্রীচরণকমলে এই আমার প্রার্থনা নিবেদন রইল।

পঞ্চদশ পর্ব

স্থান ঃ ধ্যানকুঠীর রোয়াক ঃ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ মাস, সময় ঃ সকাল
রায়বাহাদুর প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়
ও
শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[বদ্ধ কে ও মুক্ত কে? ঃ বিদেহ মুক্তি ও জীবন্মুক্তি ঃ জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য ঃ ত্রিতাপ জ্বালায় তাপিত নয় কে? ঃ চেতনা শক্তি ও প্রাণশক্তি ঃ সূত্র-আত্মা ঃ জ্ঞানের চর্চা শুকনো ঃ ভক্তিতত্ত্ব বড় মিষ্টি]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই প্রাণগোপাল, তুমি তো শুক্ল সন্ন্যাসী। সাধু দু'প্রকার, এক-রাঙ্গা সাধু, দুই - শুক্ল সাধু। তুমি হলে শুক্ল সাধু। তুমি নিজেকে লোকের কাছে ধরা দাও না। সে কারণে, তুমি উপরে ধুতি পরে নিয়েছ। তাই বাবাজী বলে তোমার কোন পরিচিতি নেই। তুমি তো ভাই মুক্ত পুরুষ, তোমার কোন বন্ধন নেই। 'বদ্ধোহি কো, যো বিষয়ানুরক্তঃ, কো বা বিমুক্তঃ বিষয়ে বিরক্তঃ। শিষ্য জিজ্ঞাসা করছে,

"হে গুরুদেব, সংসারে বদ্ধ কে?" উত্তরে গুরুদেব বললেন, "বিষয়ে যার অনুরাগ, সে-ই বন্ধন দশায় পড়ে আছে।" শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন, "হে গুরুদেব, মুক্ত কে?" গুরুদেব উত্তর দিলেন, "যার বিষয়ের প্রতি বিরক্তি এসে গেছে সে-ই মুক্ত।" বিষয়ের প্রতি বিরক্তি এলেই জীব মুক্ত হয়ে যায়। আর বিষয়ানুরাগই বন্ধনের মূল কারণ। এই অনুরাগকে নাশ করতে পারলেই মানুষ মুক্ত হতে পারে।

মুক্তি দু'প্রকার। প্রথম হল বিদেহ মুক্তি, অপরটি হল জীবন্মুক্তি। বিদেহ মুক্তির উদাহরণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে — দগ্ধ ধান্যবৎ। ধানকে আগুনে পোড়ালে তা জ্বলে যায়, তার নাম রূপ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তার অংকুর পর্যন্ত নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যায়। এই রকম যাঁর অবস্থা, কর্মফলের বীজ পর্যন্ত যাঁর সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়ে গেছে, জন্ম মৃত্যুর আবর্ত থেকে তিনি চিরতরে মুক্ত হয়ে যান। তাঁকে আর সংসারে ফিরে আসতে হয় না। একে বলে বিদেহ মুক্তি।

জীবন্মুক্তি দু রকমের হয়ে থাকে। তা কেমন? ধান থেকে তুমি খই করলে। তাতে তার নাম বদলে গেল, রূপও বদলে গেল। ধানের যে বীজ অর্থাৎ তার যে উৎপাদিকা শক্তি, সেই শক্তি খই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। তবু তার মধ্যে প্রারব্ধের কিছুটা অবশিষ্ট থাকে। সেই প্রারব্ধটুকু নষ্ট হয় কিসে? কেউ হয়তো খই খেয়ে নিল, তাতে তার ক্ষুধা মিটল আর সেই সঙ্গে খই-এর যেটুকু প্রারব্ধ ছিল তা নষ্ট হয়ে গেল। সাধুরা হলেন এই খই-এর মতো মানুষ। খই-এর যেমন নাম আর ধাম বলে চেনা যায় না, সাধুদেরও তেমনি নাম আর রূপ বদলে যায়, খইকে যেমন আর ধান বলে চেনা যায় না, সাধুদেরও তেমনি আর সাধারণ মানুষ বলে চেনা যায় না। সাধু তখন অন্তরে বাইরে গেরুয়া রঙে রঙিন হয়ে যান। খই-এর যেমন উৎপাদিকা শক্তি থাকে না, তার থেকে আর অংকুর উদ্‌গত হয় না, তেমনি যে বীজ অংকুরিত হওয়ার দরুণ মানুষকে আবার সংসারে ফিরে আসতে হয়, সাধুদেরও সেই বীজ নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায়। তাঁদেরও আর জন্ম-মৃত্যুর কবলে পড়তে হয় না। শুধু প্রারব্ধের ভোগ যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেটুকুই এই জন্মে ভোগ হয়ে যায়।

এই হল এক রকমের জীবন্মুক্তি। আর এক রকম হল, যেমন ধানকে জলের সঙ্গে সিদ্ধ করে সেই ধানকে জল থেকে তুলে নিলে। জলে সিদ্ধ হওয়ার ফলে ধানের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু তার নাম আর রূপের কোন পরিবর্তন হল না। এই সিদ্ধ ধানকে সাধারণ ধানের সঙ্গে মিলিয়ে দাও, তখন আর তাকে সিদ্ধ বলে বোঝা যাবে না। দেখতে এক রকম হলেও সিদ্ধ ধান থেকে কিন্তু কখনো

অংকুর হয় না। গৃহীদের মধ্যেও যাঁরা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁদের অবস্থাও হয় এই সিদ্ধ ধানের মতো। তাঁদের নামের পরিবর্তন হয় না, রূপও বদলায় না, সাধারণ গৃহস্থের মতো তারা সংসারেই থেকে যান। কিন্তু ভিতর থেকে কর্মবন্ধনের সমস্ত বীজ তাঁদের নষ্ট হয়ে যায়। এই সব গৃহীদেরও তাই আর জন্ম-মরণশীল সংসারের ফিরে আসতে হয় না।

ভাই প্রাণগোপাল, তুমি তো গৃহস্থ হয়েও একজন সাধু, সিদ্ধ ধানের মতো তোমাকে চেনা যায় না। কেউ গেরুয়া পরলে তার চাপরাশ দেখলেই বোঝা যায় যে এ ব্যক্তি একজন সাধু। তুমি তো ভাই শুক্ল সন্ন্যাসী, তোমার কাপড় তো সাদা, তুমি তো চাপরাশ নাও নি তাহলে তোমাকে কে চিনবে যে তুমি একজন সাধু? আচ্ছা প্রাণগোপাল, তুমি বলতো — জড় ও চেতনের মধ্যে তফাৎ কোথায়?

প্রাণ ঃ মহারাজ, যে জিনিস ক্রিয়াশীলরূপে দেখা যায় তা চেতন। যার মধ্যে ক্রিয়াশীলতা নেই তাকে জড় বলা হয়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ইঞ্জিনে যে ক্রিয়া দেখা যায়, ঘড়ির মধ্যে যে ক্রিয়া দেখা যায়। তাহলে এদের কি চেতন বলা যাবে?

প্রাণ ঃ না মহারাজ, যার মধ্যে বুদ্ধি প্রয়োগ পূর্বক যে ক্রিয়া দেখা যায় তাকেই চেতন বলা যায়। ইঞ্জিন ও ঘড়ির তো কোন বুদ্ধি নেই। এদের তো একজন করে চালক আছে, এরা আপনা থেকে চলতে পারে না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, এ যুক্তি ঠিক নয়। চৈতন্য তো সর্বব্যাপী আছে। জড় ও চৈতন্যকে তুমি যদি আলাদা বলতে চাও, তাহলে তোমার চৈতন্য একব্যাপী হয়ে যাবে, তার সর্বব্যাপীত্বে দোষ এসে যাবে। জড়ের মধ্যে যে চৈতন্য নেই কোন্ যুক্তি দিয়ে তুমি তা প্রমাণ করবে?

প্রাণ ঃ মহারাজ, আপনার এ কথা ঠিক, চৈতন্য আর জড় কোনো আলাদা জিনিস নয়। যা সর্বব্যাপী তা নিজ ব্যাপীত্বকে ছেড়ে যাবে কোথায়?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ, ভাই, একথা তো যুক্তি দিয়েই আমি বলেছি। জড় ও চৈতন্য কোনো আলাদা জিনিস নয়। তবে আলাদা মনে হয় কেন? মায়ার জন্যই এই ভেদ ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। দড়ি দেখে যেমন সাপ বলে ভুল হয়, যদিও বাস্তবিক সেখানে সাপের কোন অস্তিত্বই নেই, তেমনি জড়ে আর চৈতন্যেও একটা ভ্রান্তি দেখা দেয়। একমাত্র চৈতন্য সত্তাই সর্বত্র বিদ্যমান, জড় বলে কোথাও কিছু নেই। জগৎ সংসার সবই চৈতন্যময়। যেমন বিম্ব আর প্রতিবিম্ব। বিম্বে আর প্রতিবিম্বে ভেদ কোথায়?

কোনো ভেদ নেই। মায়ারূপী আয়না সামনে থাকলে তবেই বিম্ব আর প্রতিবিম্ব আলাদা হয়ে ধরা দেয়। প্রতিবিম্ব রয়েছে কোথায়? বিম্বেতেই রয়েছে। জগৎ-সংসার যা কিছু দেখছ, সব সেই চৈতন্যময় বিম্বের প্রতিবিম্ব, তারই ছায়া। মায়ারূপী আয়নাখানা ভেঙে গেলেই ঐ ছায়া কায়াতে মিশে যাবে। তখন আর তাদের আলাদা বলে বোঝা যাবে না, জড় চৈতন্য সব এক হয়ে যাবে।

ভাই, প্রাণগোপাল, তুমি বলতো, দেহধারী মানুষের যে ত্রিতাপ আছে, এই তিন তাপে তাপিত নয় এমন কোন দেহধারী মানুষ আছে কি?

নলিনী ঃ (প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর বাবু নলিনীনাথ ব্রহ্ম, পি. আর. এস) হ্যাঁ মহারাজ, মহাপুরুষগণ ত্রিতাপ থেকে মুক্ত হয়ে থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, এ কথা আমি গ্রাহ্য করব না। মানুষের আমিত্ব যখন নাশ হয়, তখন মানুষ মুক্ত হয়। আমিত্ব যখন নাশ হয় না। তখন 'আমি মুক্ত' একথা কে বলবে? যে বলবে, বুঝতে হবে সে মুক্ত নয়। যেমন কেউ যদি বলে, "আমার মুখে জিহ্বা নেই।" এ কথা থেকে কি বুঝবে? জিহ্বা যখন নেই, তাহলে কথা বলছে কে? যদি বলে থাকে তাহলে নিশ্চয় তার জিহ্বা আছে। ঠিক এই রকম, যদি কেউ বলে — 'আমি মুক্ত', তাহলে বুঝতে হবে ও মুক্ত নয়। ও যদি মুক্ত হয়, তাহলে কী করে কথা বলছে?

ভাই প্রাণগোপাল, তুমি তো একজন অনুভূতি—প্রবণ পুরুষ। তুমি বলতো — দেহের মধ্যে এমন কোন্ শক্তি আছে যার সাহায্যে দেহের সব কাজ চলছে?

প্রাণ ঃ মহারাজ, চৈতন্য শক্তির সাহায্যে দেহের সব কিছু চলছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, তোমার চৈতন্য অচৈতন্য আমি মানব না। তাদের তো দেখা যাচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, একটা যে প্রাণ শক্তি আছে, তাকে দেখা যায়, যার আশ্রয়ে সব কিছু কাজ হচ্ছে। যখন প্রাণ বায়ু থাকে না, তখন আর কিছু কাজ করতে পারে না। এই প্রাণ হল সূত্র-আত্মা। প্রাণ-সূত্রেই আত্মাকে ধরা যায়। অর্থাৎ আত্মাকে ধরবার সূত্র হল এই প্রাণ।

প্রাণ ঃ মহারাজ, প্রাণ সূত্র-আত্মা হতে পারে, কিন্তু স্বয়ং আত্মা তো নয়। তবে ক্রমবিকাশের পথে প্রাণ বৃদ্ধি পেতে পেতেই আত্মায় পরিণত হবে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, প্রাণের বিকাশ যেমন দেখা যায়, তেমনি তার বিনাশও দেখা যায়। প্রাণের যেমন বৃদ্ধি হয়, তেমনি তার হ্রাসও হয়। একটি শিশু জন্মাল, তার প্রাণের বিকাশ ঘটল। কিন্তু শিশুটি মারা গেল, সেই সঙ্গে প্রাণের নাশ হল।

প্রাণের হ্রাস বৃদ্ধি হল।

নলিনী ঃ মহারাজ, বিজ্ঞান তো প্রাণ-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করে না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ তবে মানুষ মারা গেলে তার প্রাণশক্তি কোথায় যায়? অন্তত প্রাণ শক্তির কিছু রূপান্তর ঘটে, সে কথাটা তো মানবে? দেখো ভাই প্রাণগোপাল, আত্মা কিন্তু সব অবস্থাতেই এক। তার কোন রূপান্তর নেই। আত্মাকে তো দেখা যায় না। আমি যদি বলি আত্মা কোথাও নেই, ঈশ্বর কোথাও নেই — তাহলে কোন্ যুক্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করাবে? তোমাদের বেদান্ত বলছে — ঈশ্বর বাণীর বিষয় নয়, তিনি মন ও বুদ্ধির বিষয় নয়, "অবাঙ্মনসগোচরম্" তাহলে তাঁকে খুঁজে পাবে কী করে? জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও ঈশ্বর কোথায় আছেন?

ভাই প্রাণগোপাল, আজ এতক্ষণ ধরে যে সৎসঙ্গ চলছে তা বেশী আলোচনা করলে মানুষ নাস্তিক হয়ে যাবে। তাদের ঈশ্বরবুদ্ধি চলে যাবে। এ আলোচনা এবার বন্ধ হোক। বিশেষত এখানে মায়েরা বসে আছে, এদের মাথায় একবার যদি এসব ভাব ঢুকে যায়, তাহলে ভীষণ অনর্থ ঘটবে, এরা সব নাস্তিক হয়ে যাবে। বেদান্তের চর্চা সকলের সঙ্গে করতে নেই, অধিকারী ছাড়া এসব আলোচনা করা নিষেধ।

শ্রীগুরুমহারাজের কথা শুনে আমি বললাম — মহারাজ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে একটি গীত লিখে গেছেন। গানটির ভাবার্থ খুবই সুন্দর। গানটি হল —

'নামিয়ে দাও জ্ঞানের বোঝা, আমি বইতে নারি বোঝার ভার
আমার সকল অঙ্গ শিউরে উঠে, নয়নে হেরি অন্ধকার।
সেই যে শিরে মোহন চূড়া, সেই যে হাতে মোহন বাঁশি,
সেই মূরতি হেরবো বলে, পরাণ আমার অভিলাষী।
বাঁকা হয়ে দাঁড়াও শ্যাম, আলো করি কুঞ্জ-দুয়ার,
এসো আমার হৃদয়-মাণিক, বেদ-বেদান্তে কাজ কি আমার।'

মহারাজ, ঈশ্বর নেই, ঈশ্বরকে পাওয়া যাচ্ছে না —এ কথা শুনলে আমার হৃদয় দুঃখে ভরে যায়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না বাছা, ঈশ্বর অবশ্যই আছেন। পুত্র থাকলে বুঝতে পারা যায় যে পুত্রের পিতাও আছেন। পুত্র পিতাকে পাবে না — এ কেমন কথা? তবে পিতা মারা গেলে, পুত্র তখন পিতাকে পায় না। তবে এ তো, বাছা, মরণশীল পিতা নন। এ তো

জগৎপিতা, কোনদিন তিনি মারা যাবেন না।

আমি (সরলাবালা) ঃ মহারাজ, আপনার এই কথা শুনে আমার চিত্ত কিছুটা সুস্থ হয়েছে। হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়েছে। মহারাজ, আমার কাছে পৌরাণিক আলোচনা খুব মিষ্টি লাগে। ধ্রুব কেমন পাঁচ বছরের বালক হয়ে ভগবানকে লাভ করল আর প্রহ্লাদের এমন বিশ্বাস যে আমার হরি এই স্ফটিকের স্তম্ভেই আছেন। ঝট্ করে হিরণ্যকশিপু ওই স্ফটিক স্তম্ভ ভেঙে দিল আর ভগবান হরি সেই স্তম্ভ থেকে বেরিয়ে এসে হিরণ্য-কশিপুকে নিধন করলেন। মহারাজ, ঈশ্বর যদি না থাকেন, তাঁকে যদি পাওয়া না যায় তাহলে তো আমাদের অষ্টাদশ পুরাণ সবই মিথ্যা হয়ে যাবে।

এ কথা শুনে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ খুবই হেসে উঠলেন এবং বললেন —

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই প্রাণগোপাল, ভক্তিমতী মায়েদের কাছে ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করাই ভাল। জ্ঞানের চর্চা বড় শুকনো। কিন্তু ভক্তিতত্ত্ব বড়ই মিষ্টি। দেখো ভাই, এতক্ষণ ধরে আমরা খুব জ্ঞানের চর্চা করলাম। এখন আমরা কদিন ভক্তি তত্ত্ব আলোচনা করব, এতে সবার ভাল লাগবে। 'হে ঈশ্বর, তুমি প্রভু, আমি দাস'—এই ভাব খুব ভাল।

প্রাণ ঃ প্রভু কাকে বলবো — ঈশ্বরকে ? ঈশ্বরের তো খোঁজই নেই, সুতরাং কারই বা দাস হবো?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, তোমার জ্ঞান চর্চায় — আমি আর কোন কথা বলব না। ভক্তিময়ী মায়েদের জন্যই আমার এই সিদ্ধান্ত, এখন আমি ভক্তি পথ অবলম্বন করেছি।

[তখন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ আমাদের পক্ষ নিলেন শুনে বড়ই আনন্দ হল। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শিষ্যদের বিদ্যা বুদ্ধি আছে, বিচার ক্ষমতা আছে, কিন্তু আমাদের তো কিছুই নেই। একমাত্র শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর কোনও উপায় নেই। হে শরণাগত পালক, হে বরেণ্য, তুমি যে নেই — এ কথা যেন কখনও মনে উদয় না হয়। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের চরণ কমলে এই আমার একান্ত প্রার্থনা।]

ষোড়শ পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম, ধ্যান কুঠীর রোয়াক ঃ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ মাস, সময় ঃ সকাল

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর বাবু নলিনী নাথ ব্রহ্ম পি.আর.এস্,

ও

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[চিত্ত ও মনের তফাৎ ঃ অন্তঃকরণ-চতুষ্টয় ঃ অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই নলিনী, তুমি তো প্রফেসর, কত ছাত্রের তুমি পরীক্ষা নিয়ে থাক। এখন তোমাকে কিছু পরীক্ষা দিতে হবে। তুমি বলতো — চিত্ত ও মনের মধ্যে তফাৎ কি?

নলিনী ঃ মহারাজ, মন মনন করে আর চিত্ত চিন্তন করে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, তুমি ফেল হয়ে গেলে। সংকল্প-বিকল্পাত্মকং মনঃ—এ তো সবাই জানে। এখন মনের কাজ কী এবং চিত্তের কাজ কী তা আমাকে বুঝিয়ে দাও। ভাই প্রাণগোপাল, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করিনি। তুমি এখানে ওকালতি করবে না, আমি নলিনীকে প্রশ্ন করেছি। দেখো নলিনী, তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, তুমি এখন পরীক্ষার মধ্যে পড়েছ।

নলিনী ঃ মহারাজ, চিন্তার ধারা যখন বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, তখন তাকে মন বলে আর তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্নভাবে যখন চিন্তার ধারা চলতে থাকে। তখন তাকে বলে চিত্ত।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, এ কথাটা ঠিক হল না। আমি অনেকের কাছে এই প্রশ্ন করেছি, দু চারজন মহাত্মা ছাড়া কেউ এর সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। তবে আমাদের জেনারেল সাহেব'এর উত্তর দিতে সমর্থ।

গুরু মহারাজ, প্রাণ গোপাল বাবুকে জেনারেল সাহেব বলে ডেকে থাকেন, যেহেতু প্রাণগোপাল বাবু কর্মস্থানে অস্থায়ী পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ প্রশ্নটা আমি নলিনীকে করেছি, জেনারেল সাহেবকে নয়। দেখ ভাই নলিনী তুমি উত্তর দিতে পারবে না। মন যা কিছু দেখে, যা কিছু শোনে কেবল সেগুলিই কল্পনা করতে পারে। চিত্ত হল অগম্যাগম্য। চিত্তের এমন সামর্থ রয়েছে যে অগম্য বিষয়েও সে গমন করতে পারে। অর্থাৎ সে যা দেখেনি, যা শোনেনি সেখানেও তার যাওয়ার কোন বাধা নেই। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার — এই চারটিকে

নিয়েই হল অন্তঃকরণ। এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের আলাদা আলাদা কাজ আছে। সংকল্প-বিকল্পাত্মকং মনঃ। মনের কাজ হল সংকল্প বিকল্প করা, আর বুদ্ধি হল নিশ্চয়াত্মিকা। বুদ্ধির কাজ হল — বস্তুর অনিশ্চিয়তা, নিশ্চয়তা বুঝিয়ে দেওয়া। আর রইল অহংকার; এর উপর আর কিছু নেই।

আমি (সরলাবালা) ঃ মহারাজ, অহংকারকেই কি আত্মা বলে মেনে নিতে হবে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ মায়ী, অহংকারকেই কি আত্মা বলে মেনে নিতে হবে। অহংকারকে ছাড়িয়ে আর এগিয়ে যাবার রাস্তা নেই। তবে কথা হল যে, দু'রকমের অহংকার আছে — শুদ্ধ অহংকার ও অশুদ্ধ অহংকার। যেমন অহং শূদ্রঃ, অহং বৈশ্যঃ, অহং ক্ষত্রিয়ঃ, অহং ব্রাহ্মণঃ, অহং দরিদ্রঃ, অহং ধনী, অহং চণ্ডালঃ — এগুলি হল অশুদ্ধ অহংকার। শুদ্ধ অহংকার হলো — অহং ব্রহ্মাস্মি, আমিই ব্রহ্ম। এই ভাব দৃঢ় হয়ে গেলে তা আত্মভাবে পরিণত হবে। আমিই ব্রহ্ম, আমিই আত্মা, আমি জীব নই আমি শিব — এই ভাব বা শুদ্ধ অহংকার থেকেই আত্মজ্ঞান বা আত্মভাব এসে যাবে। মানুষ জানে না যে সে ব্রহ্ম, সে নিজেকে জীব বলে মনে করে।

আমি ঃ এই ভ্রান্তি কেন হয়?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, মায়ার জন্যই এই ভ্রান্তি হয়ে থাকে। মায়ার ভ্রান্তি দূর হলেই দেখা যাবে — অহং ব্রহ্মাস্মি। তবে মায়া অতিক্রম করা খুবই কঠিন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন — 'মম মায়া দুরত্যয়া' আমার মায়া দুস্তরা। একে অতিক্রম করা খুব মুস্‌কিল।

নলিনী ঃ মন আর চিত্তের মধ্যে কি পার্থক্য তা আজ আপনার মুখ থেকে শুনলাম। এই বিষয়ে আমার কোন ধারণা ছিল না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ যদি উপর থেকে দেখ, তাহলে প্রথমে অহংকারের স্থান, তার নিচে চিত্ত, তার নিচে বুদ্ধি, তারও নিচুতে মন। আর নিচ থেকে যদি দেখ, তাহলে মনের স্থান প্রথম, তারপর বুদ্ধি। তারপর চিত্ত, তারও পর অহংকার। অহংকার ও চিত্তের মধ্যে খুব নিকট সম্পর্ক রয়েছে। চিত্তের যদি একটা 'ত' লোপ পায়, তখন চিত্ হয়ে যায়। এই চিতের মধ্যে অর্থাৎ চৈতন্য সত্তার মধ্যে আত্মা তথা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব এসে পড়ে। পাতঞ্জল যোগদর্শনে বলা হয়েছে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"।

চিত্তের নিরোধ হলেই সব কিছু নিরোধ হয়ে যাবে। তাহলে মনের স্বরূপ কী?

নলিনী ঃ মহারাজ, শাস্ত্রে মনের তিনটি রূপের কথা বলা হয়েছে, যথা — সংকল্প, বিকল্প ও আত্মকামন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাঃ, কি সুন্দর কথা। যেমন কর্তা, করণ ও কর্ম। যেমন এক ব্যক্তি কাঠ কাটল — ওই ব্যক্তি হল কর্তা, আর ওর হাতে যে কাটল — ওই ব্যক্তি হল কর্তা, আর ওর হাতে যে কুঠার আছে তা হল করণ, তারপর কাঠ কুঠার দিয়ে কাটাকে বলা হয় কর্ম। সংকল্প ও বিকল্প হল মনের কাজ। আর কর্তার কেমন রূপ, তা আমাকে বল।

শ্রীগুরু মহারাজ এই কথা বলে খুব হাসতে লাগলেন। তিনি সৎসঙ্গ করতে করতে মাঝে মাঝে ছোট বালকের মতো খুব হেসে থাকেন। এরপর তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই নলিনী, কর্তার রূপ কি — এখনও পর্যন্ত কেউ বলতে পারে নি। কারণ, তাঁকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তিনি হলেন মনেরও মন্তা অর্থাৎ মনকে যিনি চালিত করেন সেই আত্মাই হলেন প্রকৃত কর্তা। তুমি একজন প্রফেসর, তুমি যা বললে তা ঠিক আছে। এখন এই সৎসঙ্গের এখানে ইতি হোক।

সপ্তদশ পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম — রন্ধন বাটীর দালান। ঃ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ,
বৈশাখ মাস, সময় ঃ সকাল
ডাক্তার হিরণ্যবাবু, দেওঘর স্কুলের মাষ্টার
ও
শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[সর্বশাস্ত্রের সার স্বরোদয় শাস্ত্র ঃ ন'টি গোপনীয় বিষয় ঃ প্রকৃত শিষ্য গুরুর উপদেশ ইঙ্গিতেই বুঝে নেয় ঃ উত্তম অধিকারী হলেই বস্তু লাভহয়। গুরুর কাছ থেকে যা পেয়েছো নিষ্ঠাসহ তার সাধন করে যাও, এখান ওখান বৃথা ছোটাছুটি কোরো না]

হিরণ্য ঃ মহারাজ, জ্যোতিষ বিদ্যা ঠিক, কি ঠিক নয়?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ ভাই, জ্যোতিষ বিদ্যা বলে — একটি বিদ্যা আছে। এই বিদ্যা দু'রকম, এক - ফলিত জ্যোতিষ, দুই, গণিত জ্যোতিষ। ফলিত জ্যোতিষ স্বরশাস্ত্র থেকে আর গণিত জ্যোতিষ অঙ্ক শাস্ত্র থেকে নিশ্চিত রূপে জানা যায়।

হিরণ্য ঃ মহারাজ, স্বরশাস্ত্র থেকে জ্যোতিষ তত্ত্ব কীভাবে বুঝতে পারা যায়?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, স্বরশাস্ত্রের সাধক ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারেন।

স্বরশাস্ত্রের মতো এমন জিনিস আর কিছু নেই। স্বরশাস্ত্র কী রকম জান? যেমন দুধকে জমিয়ে দই করে সেই দউকে মন্থন করে মাখন বের করা হয়, তারপর সেই মাখন থেকে ঘি বের করা হয় — সেই ঘি থেকে আর কিছু হয় না। ঠিক তেমনি সর্বশাস্ত্র মন্থন করে স্বরোদয় শাস্ত্র রচিত হয়েছে। এটি হল সর্বশাস্ত্রের সার, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আর নেই। এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে এমন সাধক এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে গণিত জ্যোতিষ এখনও আছে। দেখো, গণিত জ্যোতিষকে মানতেই হবে। এই বিদ্যায় পারদর্শী জ্যোতিষী সব ঠিক ঠিক বলে দেন। তিনি তো গ্রহণ কবে কখন লাগবে, কখন ছাড়বে সবই আগে থেকে বলে দেন।

হিরণ্য ঃ স্বরশাস্ত্রে কী বিষয় নিয়ে লেখা থাকে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, স্বরশাস্ত্র নিজে নিজেই পড়ে আয়ত্ব করবে তা হবে না। এই বিদ্যা গুরুমুখ থেকে শুনে আয়ও করতে হয়। তোমাদের সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তি এখানে এসে স্বরের বিষয় অবগত হয়েছে এবং এই বিষয়ে অনেকটা এগিয়েও গেছে। তবে এই স্বরবিদ্যা আয়ত্ত করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি না থাকলে স্বরবিদ্যার ধারণা করা খুবই মুশকিল। মানুষ প্রতিনিয়ত শ্বাস গ্রহণ করছে আর পরক্ষণেই তা বের করে দিচ্ছে — এই বিষয় নিয়েই এই স্বরোদয় শাস্ত্র রচিত হয়েছে। স্বয়ং মহেশ্বর এই শাস্ত্রের বক্তা আর স্বয়ং মহেশ্বরী এর শ্রোতা। তাহলে দেখো, স্বরশাস্ত্রের বক্তা ও শ্রোতা কোন্ জন! মহেশ্বর পার্বতীকে অনেক করে প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়ে ছিলেন — তুমি স্বরবিদ্যার কথা কাউকে বলবে না। এমন কী তোমার অতি প্রিয় পুত্রদ্বয় গনপতি বা কার্তিক কাউকে বলবে না। তবে স্বরবিদ্যা সম্পর্কে শুনবার জন্য তুমি খুব ব্যাকুল হয়েছ তাই তোমাকে এই বিদ্যা সম্পর্কে বলছি।

হিরণ্য ঃ মহারাজ, স্বরশাস্ত্র সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবে না — এ ব্যাপারে এত গোপনীয়তার কারণ কি?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, "গুপ্ত যো মুক্ত, প্রকট যো ভ্রষ্ট" অর্থাৎ গুপ্ত যে, সে মুক্ত আর প্রকট যে, সে ভ্রষ্ট, এই হল সাধন তত্ত্ব। সাধনতত্ত্বকে যদি গোপন রাখতে পারো, তবেই সাধনার দ্বারা তুমি মুক্ত হতে পারবে। আর যদি তাকে প্রকট কর, তাহলে তুমি ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

হিরণ্য ঃ মহারাজ, গুপ্ত বিষয় প্রকট হলে তার ফল পাওয়া যায় না কেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, তুমি ভালো ভালো জিনিস খেয়েছ, যদি সঙ্গে সঙ্গে তা বমি

করে ফেলো, তাহলে তুমি কী ফল লাভ করবে? যা খেলে সেটা হজম হবে, তবেই শরীরে বল পাওয়া যাবে। সাধন ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। দেখো ভাই, সাধনতত্ত্ব সব সময় গোপন রাখতেই হবে। ব্যবহারিক জগতেও কিছু কিছু কথা গোপন রাখাই বিধি।

আয়ুর্বিত্তং গৃহশ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুন ভেষজম্।
দানাপমানমানঞ্চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ।।

অর্থাৎ এই নয়টি জিনিস গোপন রাখা উচিত। আয়ুর কথা কাউকে বলবে না, তোমার কত টাকা কড়ি আছে, তা-ও কাউকে জানাবে না, তোমার ঘরের গলদ বা সমস্যার কথা বাইরে প্রকাশ করবে না, গুরুর কাছে যা মন্ত্র নিয়েছ তা গোপন রাখবে, মৈথুন সম্পর্কে নীরব থাকবে, ওষুধের কথা রোগীকে বলবে না। ওষুধের কথা যদি রোগীকে জানিয়ে দাও সে ভাবতে পারে — ও হরি, এই জিনিস দিয়েছে, এতে আমার রোগ সারবে কী করে? তাই রোগীর কাছে ওষুধের কথা জানানো উচিত নয়। দানের কথা গোপন রাখাই বিধি, ডান হাতের দান বাঁ হাত যেন টের না পায়। লোকের কাছে তোমার মান বাড়লে তা নিয়ে বলে বেড়িয়ো না। যদি বলে বেড়াও তাতে তোমার প্রতি লোকের ঈর্ষা বাড়বে। কেও তোমাকে অপমান করলে তা গোপন রেখো। নইলে লোকেজানতে পারলে তোমাকে হেয় জ্ঞান করবে। তাই এই নয়টি জিনিস সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করবে। স্বরশাস্ত্রও গোপন রাখবে। যখন কোন প্রকৃত অধিকারী পাওয়া যাবে তখন তাকে এই স্বরশাস্ত্রের কথা বলবে।

মানবদেহে প্রধানতঃ তিনটি নাড়ী আছে — ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। মেরুদণ্ডের বামদিকে ইড়া নাড়ী স্থিত হয়, দক্ষিণপ্রদেশে পিঙ্গলা নাড়ী স্থিত এবং মধ্যপ্রদেশে সুষুম্না নাড়ী স্থিত। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর দ্বারাই শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য নির্বাহ হয়। বাম নাকে আছে ইড়া আর ডান নাকে আছে পিঙ্গলা অর্থাৎ বাম নাকে যখন শ্বাসকার্য চলে তখন তা হল ইড়া নাড়ী যার অপর নাম চন্দ্র নাড়ী। আর ডান নাক দিয়ে যখন শ্বাস কার্য চলে তখন তাকে বলা হয় পিঙ্গলা নাড়ী, যা সূর্য নাড়ী নামে পরিচিত। যখন নাকের উভয় ছিদ্র দিয়ে সমানভাবে শ্বাসকার্য চলতে থাকে, তখন তাকে বলা হয় সুষুম্না নাড়ী। সূর্যোদয় থেকে ফের পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত ঘন্টায় ঘন্টায় এই শ্বাসের পরিবর্তন হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষের এ ব্যাপারে ধারণা নেই। তবে যোগী পুরুষেরা অবশ্যই ধারণা করতে পারে। যে সাধক দিনের বেলায় চন্দ্র নাড়ীতে (ইড়া নাড়ী) এবং রাতে সূর্যনাড়ীতে (পিঙ্গলা নাড়ী) শ্বাস চালন করতে

সমর্থ হয়, তখন ওই সাধক স্বর সাধন ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করে।

এই স্বর সাধন এমনই অপূর্ব যে এর সাধনা করলে সব সাধনা সিদ্ধ হয়ে যায়। এমন এক কাজ তোমার কাছে এসে পড়ল যে ওই কাজ তোমার দ্বারা হবে না, কিন্তু তুমি যদি নিজের স্বরের (শ্বাস) উপর লক্ষ্য রেখে যদি বাইরে বেড়িয়ে পড়, তাহলে দেখা যাবে — যে কাজটি সম্পন্ন হবার নয়, তা তোমার সাধন বলে সুসম্পন্ন হবে, কিন্তু বিপরীত শ্বাস চলাকালীন তুমি বাইরে বেরোলে, তখন দেখা যাবে যে তোমার কাজটি সুসম্পন্ন হল না অর্থাৎ কাজটি ব্যর্থ হল। স্বরই ঈশ্বর, স্বরসাধন বলেই ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব। স্বরোদয় শাস্ত্রের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ যেমন হয়, তেমনি জাগতিক সব বাধা বিঘ্ন বিপদ আপদ সুখ দুঃখ সবই জয় করা যায়।

প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় মানুষের একুশ হাজার ছ'শো শ্বাস কার্য চলে, এই হিসেবে মিনিটে পনের বার শ্বাস কার্য হয়। স্বর-সাধক যিনি হবেন, তিনি কী করবেন? তিনি শ্বাসকে সংযম করে প্রাণায়ামের সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখবেন। সাধারণ মানুষের মিনিটে ১৫বার শ্বাস কার্য চলে, সাধকের কিন্তু প্রতি মিনিটে ১০ বার শ্বাস চলে। সুতরাং মিনিটে তার ৫ বার শ্বাস বেঁচে যায়। এই রীতি অনুসারে সাধক দীর্ঘায়ু লাভ করেন। এই স্বরশাস্ত্রে বহু ধরণের সাধন আছে। তবে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল — দিবাভাগে চন্দ্র নাড়ীতে আর রাত্রিকালে সূর্য নাড়ীতে শ্বাস চালনা করা। এটি সম্পাদন করা সাধন সাপেক্ষ। স্বরোদয় শাস্ত্রে শ্বাস পরিবর্ত্তনের পদ্ধতির বিবরণ আছে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বুঝতে পারা কঠিন।

দিনের বেলায় এক গুরুদেব শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করছেন — এখন দিন না রাত্রি? ওই শিষ্য ছিল উত্তম সাধক এবং সাধনায় সে অধিকার অর্জন করেছে। ওই শিষ্যটি বলল — হে গুরুদেব, এখন তো রাত আছে। এরপর রাত যখন হল, তখন গুরুদেব ফের উক্ত শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন — এখন রাত না দিন। শিষ্যটি বলল — গুরু মহারাজ, এখন তো দিন। সাধারণ লোক সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারা ভাবতে লাগল — এ কী রকম কথা? গুরুদেবকে শিষ্য এ কী রকম হাসির কথা বলছে? দিনকে বলছে রাত আর রাতকে বলছে দিন? সাধন জগতের পরিপ্রেক্ষিতে শিষ্য অবশ্যই ঠিক বলছে, যা সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়। শিষ্যের কাজই হল রাতে দিনকে নিয়ে আসা আর দিনে রাতকে নিয়ে আসা অর্থাৎ রাতে সূর্য নাড়ীকে চালনা করা আর দিনে চন্দ্রনাড়ীকে চালনা করা। এই রীতি অনুসারে শিষ্য রাতকে দিন বলছে অর্থাৎ সূর্য নাড়ী তখন চলছে আর দিনকে রাত বলছে অর্থাৎ চন্দ্র নাড়ী তখন

চলছে। সাধারণ মানুষ এর তাৎপর্য বুঝতে পারবে না। এখানে অবশ্য গুরুদেব শিষ্যের কথার তাৎপর্য সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন এবং সাধন মার্গে উন্নত শিষ্যও গুরুদেবের কথা বুঝে নিল।

হিরণ্য ঃ মহারাজ, আপনি 'ময়না রাম রাম কহো' নামে যে দৃষ্টান্তমূলক গল্প আমাদের শুনিয়েছেন তা ঠিক এই রকম। সাধু মহাত্মা ময়নাকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে যে উপদেশ দিয়েছেন তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে নি, শুধু ময়নাই তা বুঝে নিয়েছিল।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ ভাই, ইঙ্গিতের দ্বারাই সদ্‌গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে থাকেন, প্রকৃত অধিকারী শিষ্য তা বুঝে নিয়ে উপদেশ অনুসারে কাজ করতে সমর্থ হয়। এ সম্পর্কে আর একটি উদাহরণস্বরূপ গল্প আছে, তা শোন ঃ—

এক শিষ্য গুরুদেবের আশ্রমে একটি গাছ রোপন করল। নিজ হাতে প্রতিদিন সে গাছে জল দিতে লাগল। গাছে যখন ভাল ভাল পাতা এল, তখন তার আনন্দের সীমা রইল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন একটা গরু এসে গাছটি খেয়ে ফেলল। তাই দেখে শিষ্যের খুব রাগ হল। সে তখন একটি লাঠি তুলে নিয়ে গরুটিকে দু-চার ঘা দেবে বলে তার পিছন পিছন ছুটতে লাগল। এমন সময় গুরুদেব শিষ্যের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন ঃ 'মারো মারো মারো'।

গুরুদেবের কথা কানে যেতেই শিষ্য হাত থেকে লাঠি খানা ফেলে দিয়ে গুরুদেবের কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করল। অন্য যে সব লোক সেখানে বসে ছিল, তারা তখন শিষ্যকে বলতে লাগল, "এ তোমার কেমন গুরু ভক্তি? তুমি নিজেই যখন গরুটিকে মারবে বলে ছুটছিলে, আর, গুরুদেবও যখন বললেন 'মারো মারো মারো', ঠিক তখনই তুমি গুরুদেবের কথা না শুনে লাঠি ফেলে দিয়ে এখানে এসে বসলে! কেন তুমি গুরুর আদেশ অমান্য করলে?" তখন শিষ্য বলল, "ভাই, আমি তো গুরুদেবের আদেশ অমান্য করিনি। গুরুদেব যাকে মারতে আদেশ করলেন তাকেই তো আমি মেরেছি। গুরুদেব তো গরুকে মারতে বলেননি। গরুকে তো আমি নিজেই মারতে যাচ্ছিলাম। তবে আবার কেন তিনি বলতে যাবেন 'গরুকে মারো'? গুরুদেব ইঙ্গিতে এই উপদেশ দিলেন — তোমার ভিতরে যে ক্রোধ জেগেছে তাকে তুমি মারো। নইলে গরুর খাদ্য গরুতে খাবে এতে বলবার কী আছে? গরুর কোন জ্ঞান নেই। তাকে মেরে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। আর গরুকে মারলেই কী গাছটা আবার ফিরে পাওয়া যাবে?

গুরুদেব ইঙ্গিতে যে উপদেশ দিলেন তা শিষ্যই বুঝে নিলেন। সাধারণ মানুষেরা

তা বুঝতে পারল না, তারা বুঝালো — গুরুদেব শিষ্যের উদ্দেশ্যে [illegible] বারবার কথাই বলছেন।

হিরণ্যবাবু এই সৎসঙ্গ শুনে খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন এবং প্রসন্নচিত্তে নিজের নিজের আনন্দভাব শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের নিকট বিনীত ভাবে প্রকাশ করতে লাগলেন। তখন শ্রীশ্রী গুরুমহারাজ বললেন —

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা হিরণ্য, তুমি তো একজন উত্তম অধিকারী। তোমার শ্রবণের আগ্রহ লক্ষ্য করে আজ যে স্বরশাস্ত্রের বিষয় কিছুটা বর্ণনা করেছি, এ তো বাছা, বক্তৃতা করার আর লেকচার দেবার বিষয় নয়। তবে আজ আমার হৃদয়ের দুয়ার খুলে গেছে, তাই অন্তরের কথা বাইরে বেরিয়ে গেছে। দেখো, একটা বড় বাড়ির মধ্যে কত ঘর থাকে। কোনটি রান্নাঘর, কোনটি পায়খানা, কোনটি রত্নভাণ্ডার আবার কোন্টি বৈঠকখানা ইত্যাদি থাকে। তেমনি এই মনুষ্য দেহে অনেক প্রকোষ্ঠ আছে। কখনও বৈঠকখানার দরজা খোলা আছে, কখন ঠাকুর ঘরের দরজা খোলা আছে, কখনও রান্নাঘরের, আবার কখনও রত্ন ভাণ্ডারের কপাট খোলা রয়েছে। আজকে আমার হৃদয়ের রত্ন ভাণ্ডারের দরজা খুলে গেছে। এই জন্য যারা সাধু মহাত্মাদের সঙ্গে সব সময় সঙ্গ লাভ করে তারা তাঁদের মাঝে মাঝেই উন্মুক্ত হৃদয়ের রত্ন ভাণ্ডার থেকে মণিমাণিক্য সংগ্রহ করে ধন্য হয়।

এতক্ষণ ধরে মাষ্টার মশাই কোন কথা বলেননি। এবার তিনি বললেন —

মাষ্টার ঃ বহুদিন ধরে আমার চিত্ত আপনার কৃপা প্রার্থনা করে আসছে, আজ আমাকে কৃপা করতেই হবে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বাছা, আমি তো এখানে সদাব্রত খুলে রেখেছি। যে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাকেই দিয়ে দিচ্ছি। তবে সময়ের অপেক্ষা করতে হয়। চাষী যখন ধনি রোপন করে তখন সে আকাশের দিকে লক্ষ্য রাখে। বৃষ্টি আসন্ন বুঝলে তবেই সে বীজ বপন করে। সব সময় সে তো বীজ বপন করে না। তেমনি এখানেও দেশ কাল আর পাত্র দেখতে হয়। তুমি তো উত্তম পাত্র আছ, সজ্জন মানুষ, দেশ অর্থাৎ যেখানে দীক্ষা নেবে সেটাও উপযুক্ত স্থান, এখন কালের জন্য কিছুদিন তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

মাষ্টার ঃ না মহারাজ, আপনাকে কৃপা করতেই হবে। বহুদিন ধরে দীক্ষা নেবার জন্য পিপাসিত হয়ে আছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ পিপাসা বাড়তে দাও। পিপাসার্ত হওয়াই ভাল, যার পিপাসা

জাগেনি, তাকে মিছরির সরবত দিলেও তা তার মিষ্টি লাগবে না। সে বলবে, চাইনে তোমার সরবত, ওতে আমার প্রয়োজন নেই। আবার পিপাসার সময় গরম জল এনে দাও, তাতেই তার মিষ্টি লাগবে। বলবে - দাও দাও, আরও দাও। তাই পিপাসা বাড়তে দেওয়াই ভালো।

মাষ্টার ঃ মহারাজ, আপনি আমাকে 'উত্তম পাত্র' বলেছেন। আমি তো একজন সংসারী লোক তাহলে আপনি আমাকে কেন 'উত্তম পাত্র' বলেছেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ আপনি তো উত্তম পাত্রই, আপনি একজন বিদ্বান ব্যক্তি। দীক্ষা হওয়ার তাৎপর্য আপনার সহজবোধ্য হবে। পাত্র উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত দীক্ষা দেওয়া নিষেধ। কাঙালকে একটা মণি দিয়ে দেখো, সে বলবে, এ কাঁচ নিয়ে আমি কী করব, ওতে আমার দরকার নেই, আমাকে বরং দুটি ভাত দিলে আমি খেয়ে বাঁচি। এবার কোনো জহুরীর কাছে মণিটা নিয়ে যাও তো দেখি। অমনি সে বলে উঠবে, আরে আরে, এর দাম যে লাখ দু'লাখ টাকা। শাক তরকারি যে বেচছে, তার কাছে গিয়ে মণির বদলে কিছু তরকারি চাও তো। সে কিছুতেই দেবে না। বলবে, এ কাঁচ দিয়ে তরকারি মেলে না, পয়সা ফেলো, জিনিস নাও। দেখছো তো, মণির মর্ম তার জানা নেই। মণির কদর বুঝবার অধিকার তার নেই। যে প্রকৃত অধিকারী হবে, সে চট্ করে মণি চিনতে পেরে আগ্রহ করে তা নিয়ে নেবে। এ সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ একটি গল্প আছে —

এক ভিখিরি লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে করে বেড়াত। কিন্তু কিছুই তার কপালে জুটতো না, কেবল লোকের কাছে গলাধাক্কা খেতো। পিপাসা আর ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে যখন প্রাণ যায় যায়, তখন এক মহাপুরুষের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। মহাপুরুষের স্বভাবই দয়ালুতা। ভিখিরির দুঃখের কথা শুনে ওই মহাপুরুষের বড় দয়া হল। তিনি বললেন ঃ "আহা! তোমার এত কষ্ট। ভিক্ষের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছো, ভিক্ষে মিলছে না আর ধাক্কা খাচ্ছো। তোমার দুর্দশা দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। দেখো বাছা, দেশের রাজা হলেন আমার শিষ্য। আমি একখানা চিঠি লিখে তোমার হাতে দিচ্ছি, তুমি ওই চিঠিখানি নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করো, তাহলে অনেক ভিক্ষা মিলবে।" এই বলে তিনি তাকে চিঠি লিখে দিলেন, ভিখিরিও সেই চিঠিখানি নিয়ে রাজসভাতে গেল।

রাজার গুরুদেব চিঠি দিয়েছেন তাই দারোয়ানরা ভিখিরীকে রাজবাড়িতে ঢুকতে বাধা দিল না। ভিখিরি তখন সোজা রাজসভায় ঢুকে রাজার হাতে চিঠিখানি দিল।

রাজা দেখলেন — স্বয়ং গুরুদেব চিঠি লিখেছেন, এ তো আর সামান্য কিছু দিয়ে বিদেয় করা চলে না। তাই তিনি মন্ত্রীকে বললেন, "একটি ভাল জমিদারী ঠিক করে এর নামে দলিলপত্র লিখে দাও।" দলিল তৈরি হল। রাজা তখন ভিখিরিকে বললেন, "এই জমিদারী তোমাকে দিলাম, এই নাও তার দলিল।" এই বলে রাজা তার হাতে দলিলখানি তুলে দিলেন।

ভিখিরি তখন রাজার সামনেই দলিলখানি ছিঁড়ে দিয়ে বলল, "আমি একজন ভিখিরি, খিদেতে আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে, কোথায় আমাকে দুটি খেতে দেবেন, তা না করে আপনি আমার হাতে একখানা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে পরিহাস করছেন?"

তাহলে দেখো, রাজা ভিখিরিকে জায়গির দিয়ে দিল, কিন্তু ভিখিরি তার মর্ম বুঝতে পারল না। এই কারণে প্রকৃত অধিকারী না হতে পারলে বস্তু লাভ করলেও তার মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত অধিকারী হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বস্তু দেয়া যায় না।

দেখো, পিতা তার ধন রত্ন যা আছে, তা সব পুত্রের জন্য রেখে দেয়। পুত্র যতদিন বালক অবস্থায় থাকে পিতা তার সিন্ধুকের চাবি তার নিজের কাছেই রেখে দেয়। পুত্র চাবি চাইলেও পিতা কখনই তাকে চাবি দেয় না। পুত্রকে বলে দেয় — চাবি নিয়ে তুমি কী করবে? কোথায় চাবি ফেলে দেবে তার ঠিক নেই, ফলে ধনরত্ন সব নষ্ট হয়ে যাবে। ওই পুত্র যখন জোয়ান হল, তখন সে না চাইলেও পিতা তাকে সিন্ধুকের তালাচাবি সব দিয়ে দিল। পিতা বলল, "আমি কেন এসব ধনরত্ন বয়ে বেড়াবো? পুত্রের জিনিস পুত্র সামলাবে। এখন আমার কোন কাজ নেই। আমার ছুটি হয়ে গেছে।"

তাহলে দেখো, যে জিনিস বাল্য অবস্থায় পিতা পুত্রকে দিল না, সেই পুত্র যখন অধিকারী হল, তখন পিতা তাকে সেই জিনিস অর্থাৎ সিন্ধুকের চাবি নিজে থেকেই দিয়ে দিল। কিন্তু পুত্র যখন অধিকারী হয়নি। তখন তার হাতে চাবি দেওয়া হয়নি। কারণ — পিতা জানতেন যে সিন্দুকের চাবিটি পুত্রকে দিলে সে তা রাখতে পারবে না, হারিয়ে ফেলবে।

হিরণ্যবাবু ও মাষ্টারমশাইকে গুরুমহারাজ বললেন, "আপনাদের ভোজনের সময় হয়ে গেছে" তখন তাঁরা বললেন, "মহারাজ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যদিয়ে এতক্ষণ ধরে আমরা যে সুধা আজ পাণ করেছি, তাতে আমাদের ক্ষুধা পিপাসা মিটে গেছে। মহারাজ যবে থেকে আমরা এই আশ্রমে আসছি, সেদিন থেকেই এখানে প্রবেশ

করলেই আমাদের ভিতরের ভাব অন্যরকম হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ কোন কোন লোক আমাদের আশ্রম সম্পর্কে নিন্দে করে থাকে। তাহলে আশ্রমে এলে তোমাদের কেন এরকম শুদ্ধ ভাবের উদয় হয়?

হিরণ্য ঃ মহারাজ, আপনি অজাতশত্রু, আপনার আর আপনার আশ্রমের কেউ নিন্দে করে না, এরকম নিন্দুক লোক এখনও পর্যন্ত আমাদের নজরে আসেনি। তবে যে ব্যক্তি নিন্দুক হবে, মূর্খ হবে, তার কথা আলাদা।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ ভাই, মূর্খ আদমী এক অশুভ গৃহের জন্যই হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে একটি দোহা আছে—

দাতা পঞ্চদশ রত্ন বিবেকী দশম নিধি।
জ্ঞানী পঞ্চম বেদ মূর্খ স দশম গ্রহ।।

—চোদ্দ রত্ন তো আছেই, দাতা তার সঙ্গে আর একটি অধিক রত্ন, এই কারণে দাতা হলেন পঞ্চদশ রত্ন। বিবেকী হল দশম নিধি। ন'টি নিধি তো আছেই তার সঙ্গে বিবেকী আর একটি অধিক নিধি। জ্ঞানী যিনি আছেন তিনি তার অনুভবকে বাইরে প্রকাশ করেন। বেদের থেকে অধিক জ্ঞান, জ্ঞানীর কাছে পাওয়া যায়। এই কারণে চতুর্বেদ তো আছেই। জ্ঞানী ব্যক্তি আর এক বেদস্বরূপ। তাই জ্ঞানীকে বলাহয় পঞ্চম বেদ। আর মূর্খ হল আর একটি গ্রহ বিশেষ। তাই মূর্খকে দশম গ্রহ বলা হয়।

এই কথা শুনে হিরণ্যবাবু খুব হেসে বললেন—হ্যাঁ মহারাজ, এ কথাই ঠিকই মূর্খ যে, সে দশম গ্রহই। মহারাজ, আপনি আমাকে আরও কিছু সাধন-তত্ত্ব কথা বলে দিন। কোন্ সময়ে একান্তে আপনার দর্শন পাওয়া যাবে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, তুমি যা পেয়েছো, তা নিয়েই তুমি সাধনা করে যাও। তা থেকে তুমি সব কিছু পেয়ে যাবে। ছোটাছুটি করলে বৃথাই ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাবে। এ ব্যাপারে উদাহরণ স্বরূপ একটি প্রচলিত গল্প আছে ঃ—

এক মুমুক্ষু গঙ্গার ধারে এসে শুনতে পেল মাঝি সবাইকে ডাকছে ঃ "পারে যাবে গো পারে যাবে?" মাঝির ডাক শুনে সে ভাবল, আসিও তো পারে যেতে চাই। আমি তো দিনরাত ভগবানকে স্মরণ করে বলি, হে হরি, আমাকে পার করে দাও। আজ বুঝি সেই সুযোগ এসে গেছে। মাঝি যখন পারে নিয়ে যেতে চাইছে, তখন এদের সঙ্গেই পারে যাই না কেন? এই ভেবে সে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল, "ভাই, তোমরা কোথায় যাবে?" মাঝি বলল, "পারে যাবে"। লোকটি তখন মাঝিকে বলল, "আমিও তোমাদের সঙ্গে পারে যাব।" মাঝি বলল, 'চলে আসুন'।

যাত্রীদের সঙ্গে এই লোকটিও পারে গিয়ে নামল, কিন্তু এখানে এসেও সে দেখল অনেক লোক ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সে জিজ্ঞাসা করল, "ভাই, তোমরা কোথায় যাবে?" তারাও বলল, "পারে যাব।" লোকটি তখন বলল, "আমাকেও তাহলে তোমাদের সঙ্গে পারে নিয়ে চলো।" এই বলে সে আবার নৌকোয় চেপে তাদের সঙ্গে ওপার থেকে এপারে এসে পৌঁছল। এই ভাবে কয়েকবার এপার এপার করবার পর তার চিন্তা হল — পার তবে কোন্‌টি? সে দেখতে পেল গঙ্গার ধারে এক সাধু বসে আছেন। তার মনে হল — উনি হয়তো পারের সন্ধান দিতে পারবেন। তাই সে সাধুর কাছে গিয়ে বলল, "বাবা, পার কোথায় আমাকে বলে দেবেন? আমি পারে যেতে চাই, কিন্তু পার খুঁজে পাচ্ছিলেন। এপারে আসছি, শুনে লোকে বলছে পারে যাব। ওপারে যাচ্ছি, সেখানেও লোকে বলছে পারে যাব। পার যে কোন্‌টি কিছুই আমি ঠিক করতে পারছি না। একবার এপার থেকে ওপার যাচ্ছি আবার ওপার থেকে এপারে আসছি। কেবল ছুটোছুটিই সার হচ্ছে, পার আর মিলছে না।" লোকটির কথা শুনে সাধু তাকে এই দোঁহাটি শোনাল ঃ —

পার কহ্‌তে হ্যায় ওয়ারকো,
ওয়ার কহ্‌তে হ্যায় পার।
পকড়্‌ কিনারা বৈঠ্‌ রহো,
এহি পার এহি ওয়ার (ওপার)।।

দেখো ভাই হিরণ্য, তোমার প্রতিও আমার এটিই উপদেশ — তুমি ছুটোছুটি কোরো না। যে কোন একটি পারের কিনারা ধরে বসে পড়ো, সব কিছু পেয়ে যাবে, নাহলে বৃথাই ধাক্কা খাবে। এ সম্পর্কে আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

এক সাধুর কাছে দুজন লোক গিয়ে বলল — "বাবা আমাদের গ্রামে কোনো কুয়ো নেই, জলের অভাবে পিপাসায় আমাদের বড়ো কষ্ট পেতে হয়। এই কষ্ট যাতে দূর হয় তার কোনো উপায় আমাদের বলে দিন।" সাধু বললেন, "ভাই, তোমরা একটু পরিশ্রম করলেই তো তোমাদের জল কষ্ট দূর হতে পারে। তোমরা নিজের নিজের গ্রামে একটা করে কুয়ো খুঁড়ে নাও। তাহলে ইচ্ছে মতো জল পেতে পারবে, পিপাসাও মিটবে, জলের অভাবে তোমাদের আর অশান্তি ভোগ করতে হবে না। এই কথা শুনে লোক দুটি চলে গেল।

কিছুদিন পর তারা আবার সেই সাধুর কাছে এলে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কি গো, তোমাদের কুয়ো খোঁড়া হল? জল মিলল?" শুনে একজন বলল, "হ্যাঁ

বাবা, আপনার আশীর্বাদে খুব ভালো কুয়ো খোঁড়া হয়েছে। এখন আমরা নিজেদের ইচ্ছে মতো যখন খুশি তখন জল পাচ্ছি।" আর একজন বলল, "বাবা, আমার কুয়োতে এখনও জল বেরুল না।" শুনে সাধু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কেমন কথা? তুমি এতদিন ধরে মাটি খুড়লে, এখনও জল বেরুল না? তুমি কেমন করে খুঁড়েছ আমাকে একটু বলতো?" তখন সে বলল, "আমি এক জায়গায় তো বেশি খুঁড়িনি। সমস্ত জমিতে নানা জায়গায় খানিকটা করে মাটি খুঁড়ে দেখলাম কোথাও জল মিলল না।" তখন সাধু তাকে বললেন, "আরে, এ তুমি করেছ কী! একটু ধৈর্য্য ধরে এক জায়গাতেই মাটি খুঁড়ে দেখবে তো। সব জায়গায় যদি তুমি একটু একটু করে মাটি খুঁড়ে যাও, তাহলে তোমার সারাজীবন কেটে গেলেও কোনো দিন জল পাবে না, পিপাসারও শান্তি হবে না।"

দেখো ভাই, হিরণ্য, আমারও উপদেশ, এই — যে জিনিস তুমি পেয়েছ, নিষ্ঠার সঙ্গে সেইটিই সাধন করে চলো, জল বেরিয়ে আসবে, শান্তি মিলবে। নতুবা সারা জীবন কেটে গেলেও তৃষ্ণার বারি মিলবে না, শান্তিও লাভ হবে না।

হিরণ্যবাবুও মাষ্টারমশাই এই দিনের সৎসঙ্গ শুনে খুব প্রসন্ন হয়ে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজকে প্রণাম করলেন।

অষ্টাদশ পর্ব

স্থান ঃ ধ্যান কুঠীর রোয়াক ঃ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ মাস, সময় ঃ সকাল
প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর শ্রী নলিনী নাথ ব্রহ্ম, পি.আর.এস.
ও
শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ
[পূর্বজন্মের সংস্কারের প্রভাব ঃ সংস্কার বড়ো না সঙ্গ বড়ো, তার মীমাংসা ঃ মানুষের জীবনে সঙ্গের প্রভাব ঃ 'ক্ষুদ্র স্রোত মহৎ স্রোত মে মিলাও ঃ পঞ্চকোষ ঃ 'যোগ ঃ কর্মসু কৌশলম্‌']

নলিনীবাবু ও তাঁর পুত্র এসে শ্রীশ্রী গুরুমহারাজকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই নলিনী, আমার একটা প্রশ্ন আছে। সেই প্রশ্নের মীমাংসা তোমাকে করে দিতে হবে। প্রশ্নটা হল — জগৎ সংসারে এমন কী জিনিস আছে যা কারোর কোন কাজে লাগে না?

নলিনী ঃ না মহারাজ, সব জিনিসই কোন না কোন কাজে লাগে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এক কথায় তুমি তো তোমার রায় দিয়ে দিলে, এ কী রকম কথা, একটু ভেবেচিন্তে বল।

নলিনীবাবুর সাত বছরের পুত্র সেখানে উপস্থিত রয়েছে, তাকে তো কিছু জিজ্ঞেস করা হয় নি। সে নিজে থেকেই প্রশ্নটির উত্তর দিল — কাঁটা কারোর কিছু কাজে লাগে না, আর মানুষের বড় অপকারী জিনিস। এ কথা শুনে মহারাজ খুব হাসতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন — "দেখো, এই বালকের কী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! আমার প্রশ্ন বুঝে ভেবে ভেবে একটা উত্তরও খাঁড়া করে দিল। আর কেনই বা হবে না, ও তো নলিনীর পুত্র, তাই তো অবশ্যই বুদ্ধিমান হবে। কথায় আছে —

বাপ্‌কা বেটা আউর সিপাহীকা ঘোড়া,
কুছ ভি নেহি, তব্‌ ভি থোড়া থোড়া।

নলিনী একজন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাঁর পুত্র কেন বোকা হবে?"

তখন গুরুমহারাজ ওই বালককে বলতে লাগলেন — দেখো, কাঁটাও খুব উপকারী জিনিস। ধ্যানকুঠীরের আশে পাশে নতুন সব গাছ লাগানো হয়েছে, ওই সব গাছ কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে।

তখন ওই বালককে বোঝাবার জন্য গুরু মহারাজ তাকে গাছ ঘেরার কাঁটা দেখিয়ে বললেন, "দেখো, এই কাঁটা দিয়ে গাছকে বাঁচাবার জন্য কেমন সুন্দর বেড়া বানানো হয়েছে। এই কাঁটা দিয়ে বেড়া বানানো না হলে গরু ছাগল এসে গাছ খেয়ে ফেলবে। তাহলে বোঝ — কাঁটাও আমাদের কত উপকারে আসে।"

গুরু মহারাজ নলিনীবাবুকে ফের জিজ্ঞেস করলেন —

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো, কোন বালককে দেখা যায় বেশ বুদ্ধিমান, আবার কোন বালককে দেখা যায় খুব বোকা। এর কারণ কী? শিশুর পূর্ব জন্মের সংস্কার অনুযায়ী এ রকম হয়ে থাকে। শিশু অবস্থায় বুদ্ধির পরিমার্জনা হয় না। শিশু বড় হলে অবশ্য বাইরের সঙ্গ করে তার বুদ্ধি কিছুটা পরিমার্জিত হয়। এ সম্পর্কে একটা গল্প শোন—

এক রাণী গর্ভাবস্থায় নিজের মহলের বারান্দায় বসে সময় কাটাতেন। সেই বারান্দার সামনে একটা মাঠ ছিল। সেই মাঠ সংলগ্ন পুকুরে ধোপারা বহুক্ষণ ধরে কাপড় চোপড় কাচত আর রাণী তাই চেয়ে চেয়ে দেখতেন। যথাসময়ে রাণীর একটি পুত্র সন্তান হল। ওই পুত্র ক্রমশ বড় হয়ে উঠল। কিন্তু রাণীর মনে বড় ক্ষোভ হল, কারণ পুত্রটির রাজোচিত স্বভাব না হয়ে ধোপার স্বভাব পেল, কাপড় চোপড় দেখলেই সে সেগুলি টেনে নিয়ে কাচতে শুরু করে দেয়, বারণ করলেও শোনে না।

একদিন রাজা রাণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা রাণী, আমাদের ছেলের এমন ধোপার স্বভাব হল কেন বলতে পারো?" রাণী তখন বললেন, "আমি যখন

গর্ভবতী ছিলাম, তখন বারান্দা থেকে আমার দৃষ্টি অনেক সময় ধোপাদের উপর পড়তো, দেখতাম ওই ধোপারা প্রায় সময় কাপড় কেচে চলেছে, আমার গর্ভের সন্তানের উপর ধোপাদের সংস্কারের ছাপ পড়েছে বলেই হয়তো আমাদের ছেলের এই অবস্থা হয়েছে।"

তাহলে দেখো ভাই, সংস্কার কত প্রবল যে, গর্ভেও রাজপুত্রের মধ্যে ধোপার সংস্কার সংক্রামিত — হয়েছে।

নলিনী ঃ মহারাজ, পূর্ব জন্মের সংস্কার তো আছেই, সঙ্গের প্রভাবে এই জন্মেই কিছু কিছু সংস্কারের ছাপ পড়ে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ ভাই, এ ব্যাপারেও উদাহরণ হিসেবে একটি গল্প আছে। এক রাজা তাঁর রাণীর সঙ্গে নিজেদের মহলে বসে রয়েছেন। সামনে একটি পুকুর। এক রাখাল সেখানে গরুর পাল নিয়ে জল খাওয়াতে এল। তাঁরা দেখলেন — গরুদের সঙ্গে রাখালও গরুর মতোই মুখ বাড়িয়ে জল খেতে লাগল। তাই দেখে রাজা আশ্চর্য হয়ে রাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ব্যাপার কী বলো তো? এই রাখাল মানুষ হয়েও পশুর মতো মুখ বাড়িয়ে জল খাচ্ছে, এর কারণ কী?

"তোখান তাশীর হ্যায় কিম্বা সহবৎ অসর হ্যায়"

তোখান তাশীর হ্যায় অর্থাৎ রাখালের জন্মের কি কিছু দোষ আছে, না সহবৎ অসর হ্যায় অর্থাৎ এর উপর সঙ্গের কোন প্রভাব পড়েছে?

রাণী বললেন ঃ রাজা সাহেব, 'তোখান তাশীর' তো নয়, এ সহবৎ অসর' অর্থাৎ সঙ্গেরই ফল।

রাজা বললেন ঃ কিছুতেই নয়, এ তোখান তাশীরই বটে অর্থাৎ রাখালের জন্ম দোষেই এ রকম স্বভাব হয়েছে।

এই নিয়ে রাজা-রাণীর মধ্যে খুব বচসা লেগে গেল। শেষে রাজা এত রেগে গেলেন যে রাণীকে তিনি রাজধানী থেকে বিদায় করে দিলেন। রাজার মেজাজ রাণী ভালোই জানতেন। বুঝলেন, বলে কিছু লাভ হবে না। অগত্যা রাণী বহুদূরে এক বনের মধ্যে তিনি আশ্রয় নিলেন। বনে গিয়ে সেখানে রাণী একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করালেন, তারপর সেই রাখালকে খুঁজে বের করে নিজের কাছে এনে তাকে ছেলের মতো প্রতিপালন করতে লাগলেন। সেইসঙ্গে তিনি রাখালের জন্য এক পণ্ডিত রেখে তাকে ভালো করে লেখাপড়া শেখালেন। এই ভাবে রাণীর স্নেহে ধীরে ধীরে রাখাল তার আগেকার জীবনের কথা ভুলে গেল আর রাণীকেই তার

নিজের মা বলে জানল।

একদিন রাণী রাখালকে বললেন, 'এখন থেকে রোজ তুমি একবার করে রাজসভায় যাবে, সেখানে কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বোলো না; শুধু রাজার খবরাখবর আর সেখানকার হালচাল যা কিছু দেখবে শুনবে সব আমাকে এসে বলবে। রাণী ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তাই রোজই এইভাবে ছেলের কাছ থেকে তিনি রাজার খবর সংগ্রহ করতে লাগলেন। রাজা খুব ভালো ঘোড় সওয়ার ছিলেন। রাণীও তার রাখাল ছেলেকে একটি তেজী ঘোড়া কিনে দিয়ে তাকেও মস্ত ঘোড় সওয়ার করে তুললেন। একদিন রাখাল ছেলে খবর দিল- রাজা কাল ঘোড়ায় চড়ে শিকার করতে যাবেন। শুনে রাণী বললেন ভালোই হল। তুমিও কাল শিকার করতে বেরিয়ে পড়ো। তোমার ঘোড়ার পিঠে দুজনের মতো খাবার জিনিস নিয়ে যেয়ো আর সেই সঙ্গে দুখানা আসন, দুখানা থালা, দুটি গেলাস, এমন কি দু'খিলি পানও সঙ্গে নিয়ে যাবে। রাজা যখন ঘোড়া ছুটিয়ে যাবেন তুমিও তখন রাজার ঠিক পিছন পিছনেই থাকবে। তারপর যে কোন উপায়েই হোক রাজাকে খুশি করে তাঁকে আমার ঘরে নিয়ে আসতে হবে। ওই রাজাই হচ্ছেন তোমার পিতা। রাণীর কাছে এই কথা শুনে সেই রাখাল ছেলের দ্বিগুণ উৎসাহ দেখা দিল। মায়ের নির্দেশ মতো সে দুজনের উপযোগী জিনিসপত্র নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হয়ে গেল।

রাজা চলেছেন শিকারে, তাঁর পাত্র-মিত্র মন্ত্রী পারিষদবর্গ একে একে ঘোড়ায় চড়ে তাঁর সঙ্গে চলেছেন। শিকারীরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিলেন যে যার সামনে কোন জন্তু জানোয়ার এসে পড়বে, তিনিই ঘোড়া ছোটাবেন তার দিকে। এইভাবে যেতে যেতে হঠাৎ রাজার সামনে একটি হরিণ এসে পড়ল। রাজাও অমনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন আর তার পিছু পিছু রাখাল বালকও ঘোড়া ছোটাল, এই ভাবে ছুটতে ছুটতে অনেক দূর জঙ্গলের ভিতর চলে গেলেন রাজা, কিন্তু হরিণের দেখা মিলল না। এদিকে পাত্র-মিত্ররাও যে কোথায় পিছিয়ে পড়ে রইলেন তারও কোন হদিশ পাওয়া গেল না।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় রাজা খুব কাতর হয়ে পড়েছেন। তাই দেখে রাখাল বলল,— মহারাজ, আপনি এখানে ঘোড়া থেকে নামুন, আমি আপনার জন্য জল নিয়ে আসছি। কাছে একটা কুয়ো ছিল, রাখাল সেই কুয়ো থেকে জল তুলে আনল, তারপর রাজার ও নিজের ঘোড়া দুটোকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে সে খাবার যোগাড় করতে লেগে গেল। রাখালের কাছে দুজনের খাবার মতো সব জিনিসই ছিল। রাখাল তখন এক

এক করে সব জিনিস বের করে এক টুকু রাজাকে দিয়ে বাকিটা নিজের জন্য রাখল। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে রাজা আহার করলেন। তিনি খুব খুশি হয়ে ভাবতে লাগলেন — ছেলেটি কেমন হুঁশিয়ার, জঙ্গলে এসেও ছেলেটি সব জিনিস কেমন গুছিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছে আমারও কী সেবা - যত্নটাই না করল! রাজা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কার ছেলে? রাখাল বলল আমি মায়ের ছেলে, এই বনের মধ্যেই আমাদের বাড়ি; সেখানেই আমি ও আমার মা বাস করি। রাজা তখন বললেন, "চলো, তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়িতে যাই।" রাজা ছিলেন অপুত্রক, তাই তাঁর ইচ্ছা হল — এই ছেলেটির মায়ের কাছ থেকে একে চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে এনে রেখে দেবেন। এমন বুদ্ধিমান ছেলের পক্ষে কি জঙ্গলে পড়ে থাকা সাজে?

রাখাল তখন রাজাকে নিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। রাণী দেখলেন, সত্যিই তাহলে রাজা এসেছেন তাঁর কাছে। তিনি তখন স্বহস্তে নানা রকম অন্নব্যঞ্জন রেঁধে ছেলেকে ও রাজাকে বসিয়ে স্বয়ং পরিবেশন করে খাওয়ালেন। রাজার চরিত্রের একটি সদ্‌গুণ ছিল। তিনি পরস্ত্রীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না, কিন্তু পরিবেশন করার সময় রাণীর পায়ের একটি তিলের উপর নজর পড়ল। হঠাৎ রাজার মনে পড়ে গেল তাঁর রাণীর কথা — তার পায়েও তো এমনি একটি তিল ছিল। রাজার স্থির বিশ্বাস জন্মাল — ইনিই তাঁর স্বামী। রাজা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন — 'এ ছেলেটি কে তুমি কোথায় পেলে? একে আমায় দিয়ে দাও, এ বড়ো বুদ্ধিমান, এ আমার রাজসভায় থাকবে।' এইবার রাণী হেসে ফেললেন, কিন্তু ক্ষোভের সঙ্গে রাজাকে বললেন, "এই সেই রাখাল বালক যে গরুর মতো মুখ বাড়িয়ে পুকুর থেকে জল খেত। এখন দেখছেন তো ও কেমন চালাক — চতুর হয়েছে। কিন্তু কেমন করে হল? সেই 'সহবৎ অসরসে হুয়া'। আপনি বলেছিসেন, ওর জন্মের দোষ আছে, 'তোখান তাশীর হ্যায়'। আর আমি বলেছিলাম 'সহবৎ অসর' অর্থাৎ সঙ্গের দোষ ঘটেছে। যখন গরুর সঙ্গে থাকত তখন তাদেরই মতো আচরণ করত — মুখ ডুবিয়ে জলপান করত আর এখন সহবৎ বা সঙ্গের ফলে দেখুন ওর কী রকম উন্নতি হয়েছে।'

দেখো ভাই নলিনী, সঙ্গের কীরকম দৃষ্টান্ত এখানে দেয়া হল। সঙ্গ সম্পর্কে এক দোহা আছে—

সঙ্গৎসে গুণ উপজায়, সঙ্গৎ সে গুণ যায়।
বাঁশ ফাঁস মিশরী এক তৌল বিকায়।।

মন থেকেই গুণ জন্মায়, আবার মন থেকেই তা চলে যায়। বাঁশের কঞ্চির টুক্‌রো বা সুতোর টুক্‌রো মিছরির মধ্যে ঢুকে মিছরির সমান দরে বিকিয়ে যায়। তাহলে দেখো সঙ্গের কেমন প্রভাব। আবার দুধের সঙ্গে জল মেশালে সেই জলও দুধের দামে বিক্রি হয়। জলের তো কোন দাম নেই, কিন্তু দুধের সঙ্গে সে মিশে গিয়েছে বলে তারও দাম দুধের মতো বেড়ে গিয়েছে।

নলিনী ঃ মহারাজ, আমি তো সঙ্গের ফল হাতে হাতে দেখতে পাচ্ছি, তবে জন্ম-সংস্কার যে আছে তা আবার বিচার বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ পূর্বজন্মের সংস্কার যে মিথ্যে নয়, তার দৃষ্টান্ত সংসারে কত দেখতে পাওয়া যায়। দেখো, কোন এক ধনী ব্যক্তি গরীব কাঙালের ছেলেকে পোষ্য পুত্র নিল। তার ফলে বিনা চেষ্টায় গরীবের ছেলেটি বিরাট ধনী হয়ে গেল। আর কত লোক অর্থ উপার্জনের জন্য সারাজীবন চেষ্টা চালিয়েও অর্থ মেলে না। পড়াশুনায় কোনো ছেলের মোটেই মন বসে না। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তার লেখাপড়া হল না। আবার এমন ছেলেও দেখা যে ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনার দিকে তার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। আর বড়ো হয়ে সে একজন বিদ্বান বুদ্ধিমান বলে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে—

"পূর্বদত্ত সূয়া বিদ্যা,
পূর্বদত্ত সূয়া ধনম্,
পূর্বদত্ত সূয়া ভার্যা
অগ্রে ধাবন্তি ধাবন্তি—

—পূর্ব জন্মের সংস্কার অনুসারেই বিদ্যা, ধন আর ভার্যা আগে আগে ধাবমান হয়। বিনা চেষ্টাতেই এগুলি মিলে যায়। তার জন্যে বিশেষ কোন চেষ্টা করতে হয় না। শুধু পূর্বজন্মের সংস্কার বশে মনোহারিণী স্ত্রী, বিদ্যা ধন সবই মিলে যায়। তবে সবাই-এর ক্ষেত্রে তা হয় না। যার পূর্বজন্মের কিছু সংস্কার থাকে তারই এগুলি মিলে যায়। মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অনেক সময় পূর্ব জন্মের সংস্কারের চিহ্ন পর্যন্ত থাকে, তা দেখে তার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বলা যায়। এ সম্পর্কে একটি গল্প আছে— গ্রামের একটি গরীব লোক ভিক্ষে করে দিন কাটায়। সে ভাবল-একবার যদি শহরে যেতে পারি তাহলে সেখানে ভাল ভিক্ষে মিলবে, খাওয়ার এত কষ্ট থাকবে না। এই মনে করে সে শহরের দিকে পা বাড়াল। শহরে ঢুকতে যাবে এমন সময় রাত হয়ে গেল আর ঠিক তখনই শহরে ঢুকবার দরজাও বন্ধ হয়ে গেল। বেচারা কী

আর করে, ঐ রাতে কোথায় যা যায়, তাই সে দরজার বাইরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এমন সময় এক সাধু সেই দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন — একটি লোক পায়ের উপর পা তুলে ঘুমোচ্ছে। সেই সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন লোকটার পায়ের তলায় রাজা হওয়ার একটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সাধু ভাবলেন, লোকটার পায়ের তলায় তো রাজচিহ্ন দেখছি, তবে কেন রাজা না হয়ে রাস্তায় এভাবে শুয়ে আছে? তখন তাঁর খেয়াল হল যে পায়ের উপর পা তুলে শোওয়া তো কাঙালের লক্ষণ। অমনি তিনি তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে তিনবার লোকটার পায়ে টোকা মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা পা নামিয়ে নিল আর তখনই শহরে ঢুকবার দরজাও খুলে গেল। তখন শোনাগেল যে সেই দেশের বাদশা রাত্রিবেলা মারা গিয়েছেন আর দৈববাণী হয়েছেযে শহরের দরজার বাইরে যে শুয়ে রয়েছে, সে-ই হল বাদশা হওয়ার উপযুক্ত লোক, তাকেই সিংহাসনে বসাতে হবে। তখন মন্ত্রী এসে লোকটিকে বাদশার প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। সাধুর লাঠির তিনটি ঘায়ে লোকটির পায়ের ওপর পা তুলে শোওয়ার দোষ সেরে গেল। তাই নতুন বাদশার নাম হল ত্রিমটালিঙ্গ। ভাই নলিনী, এই ত্রিমটালিঙ্গ বাদশা তো কিছুই চেষ্টা করেনি, তবু সে বাদশা হয়ে গেল। এর কারণ, হল — লোকটির পূর্বজন্মের শুভ সংস্কার এবং তার চিহ্ন পায়ের তলায় রেখার মধ্যে ছিল।

এই কথাবার্তা যখন হচ্ছিল তখন ভুলুয়া বাবা নামে এক সাধু সেখানে বসেছিলেন। তিনি বললেন—

ভুলুয়া ঃ মহারাজ, আমি আপনার কপালে সম্রাট হওয়ার চিহ্ন দেখছি। আমার মনে মনে হাসি পাচ্ছে এই ভেবে মহারাজ, আপনি সংসার আশ্রম ত্যাগ করে চলে এলেন, অথচ আপনাকে সম্রাট হতে হয়েছে। আপনি সন্ন্যাসী হয়ে আপনি সন্ন্যাসীদের সম্রাট হয়েছেন, সন্ন্যাসীদের 'শিরোমুকুট' হয়েছেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ কেন ভাই, তুমি আমাকে সম্রাট বানিয়ে ফেলছো? আমি তো মহারাজা অথচ তুমি আমাকে রাজা বানিয়ে ফেলেছো। আমার পদকে নামিয়ে দিয়েছো। ভাই, আমি তো রাজা নই, আমি মহারাজা। দেখো ভাই, সন্তোষই পরম লাভ। যার কবজায় সন্তোষরূপী রাজ্য থাকে, তার কাছে লৌকিক রাজত্বও তুচ্ছ। "তৃষ্ণা ক্ষয়ং স্বর্গপদং কিমস্তি" যার বিষয় — তৃষ্ণা ক্ষয় হয়ে যায়, তার কাছে স্বর্গপদও কিছুই নয়।

যৎ লাভ পরং লাভম্
যৎ জ্ঞানং পরং জ্ঞানম্

যৎ সুখং পরং সুখম্
যৎ ধামং পরং ধামম্।

অর্থাৎ যে বস্তু লাভ করলে জগৎ সংসারে আর কিছুই লাভ করার থাকে না, যে জ্ঞান লাভ করলে আর কিছুই জ্ঞান লাভ করার থাকে না, যে সুখ লাভ করলে আর কিছু সুখ চাইবার থাকে না, যে ধাম প্রাপ্ত হলে আর কোন ধাম চাইতে হয় না—সেই পরম লাভ, পরম জ্ঞান, পরম সুখ ও পরম ধামের কাছে অন্য সব লৌকিক প্রাপ্তি একেবারেই তুচ্ছ। দেখো ভাই, তুমি আমাকে লৌকিক রাজত্বের রাজা বানিয়ে ফেলেছো কেন আর কেনই বা আমাকে মহারাজা থেকে রাজা করে আমার পদকে নিচু করেছ?

ভুলুয়া ঃ মহারাজ, আপনি জীবন্ত শংকর। আপনার পদ কখনই কম হবে না। আপনার শ্রীমূর্তিখানি যার একবার নয়নগোচর হয়েছে, সেই ব্যক্তি মনে মনে বুঝে নেবেন যে এই মূর্তিখানি সাক্ষাৎ শংকর মূর্তি।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ একেবারে নিশ্চুপ হয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে রইলেন আর যত নরনারী সেই সময় উপস্থিত ছিল তারা সকলে শ্রীগুরু মহারাজের সেই 'যোগীশ্বর' মূর্তি দর্শন করে আনন্দে ডুবতে লাগলেন। আমিও তখন সেখানে ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে মনে উদয় হল যে আমার মনের গতি এখন কোথায়? দেখি যে মনকে স্থির করতে পুজোর সময় কত যত্ন, কত চেষ্টা করতে হয়, কত জপাদি দ্বারা মনের গতি ঠিক করতে হয়, কোথায় মন যে সময় সময় চলে যায় তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। কিন্তু এখন শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের কৃপায় তাঁরই প্রভাবে। নির্বাচিত স্থানে দীপ শিখার মতো মন একেবারে স্থির হয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ চোখ খুললেন, তখন আমি প্রশ্ন করলাম—

বাবা, পুজো, জপ ও ঈশ্বরের ভজনা করতে বসে মনকে স্থির করবার জন্য কত চেষ্টা করি, কিন্তু মন কিছুতেই স্থির হতে চায় না, মন যে কোথায় চলে যায় তার আর পাত্তা পাওয়া যায় না। কিন্তু আপনার সামনে আজ আমার মনের গতি একেবারে স্থির হয়ে গেছে। তারজন্যে আমাকে কোন চেষ্টাই করতে হল না। তবু মন কেমন স্থির হয়ে গেল। বাবা, এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, এর কারণ হল — গুরুজন কখনো আপন হৃদয়কে খালি রাখেন না, তিনি তাঁর ইষ্টের মধ্যে সর্বদা তাঁর মনকে ডুবিয়ে রাখেন। সেই গুরুজনের মনের মধ্যে যদি কোন ভক্ত তার মনকে ডুবিয়ে দিতে পারে, তবে গুরুজনের মনের

গতির সঙ্গে সঙ্গে তারও মনের গতিও ঊর্ধ্বগামী হতে থাকবে। এই বিষয়ে একটা উদাহরণ হল — "ক্ষুদ্র স্রোতকে মহৎ স্রোতমে মিলাও।" অর্থাৎ ক্ষুদ্র স্রোতকে মহৎ স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে দাও। কীভাবে মেলাবে? যেমন নদ-নদী সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়। নদ-নদী দেখলেই বোঝা যায় তাদের মনের বাসনা কী। তাদের একান্ত বাসনা সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হওয়া। কত মরু, কত পাহাড় পর্বত লঙ্ঘন করে সব শেষে একদিন সমুদ্রে গিয়ে মিলবে, এই হল নদ-নদীর একমাত্র ধ্যান-ধারণা, তাদের গতি দেখলেই সে কথা বোঝা যায়।

যে নদীর জল বেশি আর স্রোতও তীব্র তার আপন শক্তিতেই অভীষ্ট লাভ হতে পারে অর্থাৎ বাসনার পূরণের জন্য সে সমুদ্রে গিয়ে মিশতে পারে। তবে যে নদীর জল অল্প, স্রোত ক্ষীণ, তার পক্ষে সমুদ্রে পৌঁছন কঠিন। তার ক্ষুদ্র ধারা হয়তো পথে খর মরু বালুকাতেই শুকিয়ে রুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র নদী যদি বুদ্ধিমান হয়, তবে সে তার ক্ষুদ্র ধারাকে কোন বড় নদীর স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। বড় নদীতে জল বেশি থাকায় সে তো আর শুকোবে না, ছোট নদীও তাই বড় নদীর সঙ্গে সমুদ্র লাভ করবে। এছাড়া সমুদ্রকে লাভ করার আর অন্য কোন উপায় তার নেই। নদীর বেলায় যেমন, মানুষের বেলাতেও সেই একই ব্যাপার। মানুষেরও একান্ত বাসনা পরমাত্মারূপ সেই মহাসমুদ্রকে লাভ করা। সেই অভীষ্ট লাভ হলে তবেই তার শান্তি মিলবে।

তবে কথা হল — যে যে ব্যক্তি অভ্যাস ও বৈরাগ্য বলে বলীয়ান, সেই সেই ব্যক্তি অতি সহজেই তার অভীষ্টদেব পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। কিন্তু যার সাধনা ক্ষীণ তার পক্ষে পরমাত্মারূপ সমুদ্রকে পাওয়া খুব কঠিন। তেমন লোক বিষয় বাসনা রূপ মরুভূমিতে পড়ে শুকিয়ে মরে, ভগবান লাভের কামনা তার পূর্ণ হয় না। তবে কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি যদি কোনো অভ্যাস বান ও বৈরাগ্যবান গুরুজনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারে, তবে তার সাধনা ক্ষীণ হওয়া সত্ত্বেও সে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারে। তাতেই তার বাসনা পূর্ণ হয়ে যায়, তার পরম শান্তি মেলে। মহৎ শক্তির সঙ্গে ক্ষুদ্র শক্তি মিলতে পারলে তার কত সুবিধা হয় তা দৃষ্টান্ত দিয়ে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি —

কোনো জাহাজ তার গন্তব্য স্থানে শীঘ্রই পৌঁছে যেতে পারে, কিন্তু নৌকো তা পাবে না। তবে ঐ ক্ষুদ্র নৌকোকে মজবুত কাছি দিয়ে যদি কোনো জাহাজের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে ওই জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে নৌকোও বিনা চেষ্টাতে

তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাবে। তেমনি ভাবে তোমরা সু-চতুরভক্ত কোনো মহৎজন বা গুরুজনের চরণ-কমলের সঙ্গে আপনার মনরূপী ক্ষুদ্র নৌকোখানিকে যদি ভক্তি কাছি দিয়ে বেঁধে ফেলতে পারে, তাহলে সেই ভক্তও গুরুজনের শক্তিতে ভব সমুদ্র বিনা চেষ্টায় পারহয়ে যেতে পারে। তবে ভক্তি কাছিটি মজবুত ও বন্ধনটি শক্ত হওয়া চাই অর্থাৎ ভক্তি ও বিশ্বাস নির্মল ও পরিশুদ্ধ হওয়া চাই। অহেতুকী অনন্যা ভক্তির দরকার। নইলে বাঁধন ছিঁড়ে যেতে পারে।

দেখো বাছা সরলা, নদী আর জাহাজের উদাহরণ দিয়ে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম, মনের গতিকে যদি ঊর্ধ্বমুখী করে তুলতে চাও, তবে গুরুজন ও মহৎজনের সঙ্গে চিত্ত মিলিয়ে দাও।

আমি ঃ মহারাজ, কী উপায়ে চিত্তকে মেলাতে হবে, এর ক্রম কী হবে, তাও বলে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এর ক্রম বলে কিছু নেই। কেবল গুরুজনের চরণ-কমলে ভক্তি হলেই আপনা থেকেই তাঁদের চিত্তের সঙ্গে তোমার চিত্ত মিলে যাবে। প্রথমে অন্নময়কোষ, দ্বিতীয় প্রাণময় কোষ, তৃতীয় মনোময় কোষ, চতুর্থ- বিজ্ঞানময় কোষ, আর পঞ্চম আনন্দকোষ। অন্নময় কোষ হল এই স্থূল শরীর, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ হল সূক্ষ্ম শরীর, আর আনন্দময় কোষ হল কারণ-শরীর। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ — এই তিনটি যখন মিলে যায়, তখন গুরুজনের যে আনন্দ অর্থাৎ আত্মানন্দ, তার ভাগ মিলতে থাকে। দেখো বাছা, মনের যা গতি, তা হল নিম্নমুখী। মনের স্বভাব হল জলের মতো। নিচু জমি পেলে জল সেই দিকেই বয়ে যাবে, তখন তার নাম হয় ধারা। কোন কৌশল করে যদি ঐ জলের গতি উপর দিকে উঠানো যায়, তাহলে তার নাম হবে ফোয়ারা।

'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্' কর্মের কৌশলই যোগ, কৌশল করে কর্ম করতে পারলে যা অসাধ্য, তাও সুসাধ্য হয়ে ওঠে। এই জলের গতি দিয়েই মনের গতি বুঝে নিতে হবে। মনের গতি স্বভাবতই নিম্নদিকে, যেমন ছেলেমেয়ের প্রতি মোহ জাগে, টাকা পয়সা বা পরিবারের প্রতি মোহ জন্মায়, এ মোহ আপনা আপনি জেগে ওঠে, জলের ধারার মতো এই মোহের স্রোতে মন একেবারে ভেসে যায়। তবে হুশিয়ার হতে পারলে ওই ধারাকে কৌশল করে উপরের দিকে তুলে ফোয়ারা বানিয়ে নেওয়া যায়। কীভাবে? যেমন পিতামাতা বা গুরুজনদের প্রতি মোহ জাগলে সেই মোহই ভক্তিতে পরিণত হয় আর গুরুজনদের প্রতি একবার এই ভক্তি জাগলেই মনের

গতি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যায়। একই মনোবৃত্তি পুত্র ইত্যাদিতে হলে হয় মোহ আর গুরুজনদের পতি হলে হয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা।

আমি তখন জোড় হাতে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করলাম, হে পিতা, হে গুরো আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, আপনার এই আশীর্বাদেই আমার মনের গতি ঊর্ধ্বগামী হয়ে যাবে। আমার সাধন বল ক্ষীণ, আমার এই ক্ষীণ স্রোত যাতে মহৎ স্রোতে মিলে যায়, আপনার শ্রীচরণ কমলে এই আমার প্রার্থনা। হে গুরো, আপনার আশীর্বাদ পেলেই আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ হবে। হে করুণাময়, আমি দরিদ্র, কাঙাল, আপনি নিজগুণে আমার উপর কৃপা করবেন।

উনবিংশ পর্ব

স্থান ঃ ধ্যান কুটীর রোয়াক ঃ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ মাস, সময় ঃ সকাল

রায়বাহাদুর প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ঃ সর্বত্র সর্বাবস্থায় পরমার্থ দৃষ্টি রাখতে হবে — তার জন্যে চাই বিচার ঃ ধর্মাধর্মের গতি সূক্ষ্ম ঃ পরোপকারায় পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্]

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ প্রাণগোপাল বাবুকে উপলক্ষ্য করে একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন —

"অন্তর্লক্ষ্যোবহির্দৃষ্টি নিমেষোনিমেষস্তথা।
সর্বার্থপরমার্থৌচ সর্বাবস্থাসু সর্বদা।।"

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এই শ্লোকটির তাৎপর্য কী? তাৎপর্য হল ঃ মানুষের দৃষ্টি যখন একেবারে অন্তর্মুখী হয়ে যায় তখন বহির্জগতে তার দৃষ্টি থাকলেও সে কিছুই চাক্ষুষ দেখতে পায় না। তার দৃষ্টি একেবারে অপলক হয়ে যায়। শ্লোকটির প্রথম লাইনের অর্থ না হয় বোঝা গেল। কিন্তু সর্বার্থ পরামার্থৌচ সর্বাবস্থাসু সর্বদা-এর তাৎপর্য কী?

প্রাঃ আমাদের এক বৈষ্ণব কবি এটির ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করেছেন, তিনি বলেছেন—

"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"

অর্থাৎ যেখানে যেখানে তোমার নেত্র পড়বে, সেখানেই তোমার ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের স্ফুরণ অর্থাৎ তাঁর প্রকাশ দেখতে থাকো। কোন স্থানে বৃথা দৃষ্টি করবে না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ ভাই, কথাটি ঠিক, তবে এরকম ভাব কী কারোর হয়, কী হয় না?

প্রাঃ হ্যাঁ, মহারাজ, আমাদের পুরাণে তো এ রকম ভাবের দৃষ্টান্ত আছে —

ধ্রুব বনের ভেতর যখন জপতপ করতে থাকে, তখন তার মধ্যে ইষ্ট - স্ফুরণ হয়েছিল। যে সব হিংস্র জীবজন্তু যেমন বাঘ, সাপ ইত্যাদি ধ্রুবের সামনে এসে পড়ল, ধ্রুব তাদের ভগবান হরি মনে করে বলতে লাগল, —কোথায় আমার পদ্মপলাশলোচন হরি, আমার কাছে তাড়াতাড়ি চলে এসো, তোমাকে পেলে আমার তপস্যা সার্থক হবে। এই কথা বলতে বলতে ধ্রুব হিংস্র জানোয়ারদের পা ধরতে গেল। মহারাজ, আপনি দেখুন, ধ্রুবের মনের গতি কেমন হয়ে গেছে।

আমাদের বৈষ্ণব কবিও এর আর এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন —

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যখন মথুরাতে চলে গেলেন, তখন রাধারাণীর মনের গতি কেমন যেন হয়ে গেল। সামনে সে এক তমাল বৃক্ষ দেখে তাকেই কৃষ্ণ ভগবান মনে করে দু বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করলো। কঠিন বৃক্ষের সঙ্গে আলিঙ্গন করে রাধারাণীর শরীরে খুব কষ্ট হল। তখন রাধারাণী তার সখিকে সম্বোধন করে বলতে লাগল, "দেখো দেখো সখি, মথুরা নগরী কিরূপ খারাপ স্থান, যেখানে কিছুদিন হল কৃষ্ণ গিয়েছেন। তাঁর নবীন কোমল অঙ্গ এখন কত কঠিন হয়ে গেছে।" রাধারাণীর এমন মনোবৃত্তি হয়ে গেল যে, তিনি বৃক্ষের মধ্যে কৃষ্ণ ভগবানের স্ফুরণ দেখতে পেলেন—

"স্থাবর জঙ্গম না দেখে, দেখে তাঁর মূর্ত্তি,
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি।"

মহারাজ আমাদের বৈষ্ণব কবি তো এরকম শ্লোকই লিখে দিয়ে গেছেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, ভক্তিমার্গে তো এরকম হয়ে থাকে। কিন্তু বেদান্তের বিচার দৃষ্টিতেও এ ভাব আনা যায়।

"সর্বার্থপরমার্থৌচ সর্বাবস্থাসু সর্ব্বদা"

অর্থাৎ জগতে যা কিছু আছে, তা সবই পরমার্থ-রই রূপ। কারোর পুত্র হঠাৎ মারা গেল। কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করল যে, একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটি তার বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশু পুত্র কন্যা সবাইকে ছেড়ে চলে গেল, আহারাদি না পেয়ে

এরা সব দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে গেল। এতে কী পরমার্থ হল?

তখন বিচার করতে হবে — হে পরমাত্মা, তুমি মঙ্গলময়। তোমার রাজ্যে অমঙ্গল বলে কিছু নেই। উপার্জনক্ষম একমাত্র পুত্র মারা গেল। এ থেকে চিন্তা করে করে মঙ্গল ভাব বের করে নিতে হবে। আচ্ছা, ঐ পুত্র যদি কঠিন ব্যাধিতে আর রোগ যন্ত্রনায় বিছানায় পড়ে থাকতো, তাহলে কী হোত? ওর নিদারুণ রোগ যন্ত্রনা দেখে আত্মীয়স্বজন অনেক দুঃখ কষ্ট পেত। এখন পরমাত্মাদেব ওকে রোগ মুক্ত করে দিয়েছে, তাতে ওর শান্তি মিলেছে। এইভাবে 'মঙ্গল' খুঁজে বের করে নিতে হবে।

ভাই, প্রাণগোপাল, সর্বত্র পরমার্থ দৃষ্টি হলে চুরি ডাকাতি খুন ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে পরমার্থ খুঁজে নিতে হবে। চুরির মধ্যে পরমার্থ কি কিছুই নেই? প্রথমতঃ দেখো, চোরের কতখানি দৃঢ়তা ও একাগ্রতা থাকা দরকার। ধরা পড়লে জীবন সংশয় হতে পারে, জেলখানায় গিয়ে পচতে হবে। অপমান কলঙ্ক ইত্যাদি ভোগ করতে হবে, এসব কথা তখন তার মনে আসে না। তার মনে তখন একাগ্র হয়ে যায়। তখন তার একমাত্র চিন্তা—কীভাবে আমি চুরি করব যাতে ধরা না পড়ি। চোর চুরি করে যা পায়। তা দিয়ে সে কী করে? নিজে তো দশবিশ সের খেতে পারে না, দশবিশখানা কাপড়ও পরতে পারে না। এসব সে চুরি করে আনে, আর আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি কাউকে না কাউকে দিয়ে দেয়। এতে তার নিজের কী স্বার্থ সিদ্ধি হল? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে যা ধন সংগ্রহ করল, তা সে পরকে বিলিয়ে দিল। এই যে নিঃস্বার্থপরতা এটাই তো পরমার্থেরই দৃষ্টান্ত।

আমি (সরলাবালা) ঃ সব বিষয়ের ক্ষেত্রে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরামার্থে নিয়ে যেতে পারা যায়। কিন্তু খুনকে কীভাবে পরমার্থে নিয়ে যাওয়া যাবে, এতে বিচার বিবেচনা কীভাবে করতে হবে? আপনি তো পরম দয়ালু। একটা বাচ্ছা ছেলে পিঁপড়ে মারলে আপনি দুঃখ পান। ওই বাচ্ছাদেরও আপনি উপদেশ দিয়ে থাকেন — 'পিঁপড়ে মারবে না'।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ বাচ্ছা, পিঁপড়ে মারলেও জীব হত্যাজনিত পাপ হয়। হত্যা, শত্রুতা আর ঋণ বদলা না নিয়ে মেটে না। এই জন্মেই হোক আর অন্য কোন জন্মেই হোক, তার শোধ হবেই হবে। দেখো রাস্তায় চলতে চলতে দুজন লোকের সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেল। দুজনেই তোমার অপরিচিত। তাদের একজনকে দেখে তোমার মন প্রফুল্ল হল, তাকে ভালবাসতে ইচ্ছে হল, অথচ আর একজনকে দেখামাত্রই তোমার মন অসুস্থ হয়ে বিরক্তিতে ভরে উঠল। এর কারণ কি? এটি

পূর্বজন্মের শত্রুতা, শত্রুতা ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে? এ জন্মে তো আগে তাদের দেখোনি, তাদের সঙ্গে পরিচয়ও হয়নি।

ঋণের ক্ষেত্রেও তাই, কাউকে টাকা দেবার কোন কারণ নেই, তবু অকারণে তাকে টাকা দিতে হয়। পূর্বজন্মের ঋণ ছিল, তাই ওভাবে সেই ঋণ শোধ হয়ে গেল। হত্যার ব্যাপারেও সেই একই কথা। ইচ্ছে নেই, তবু কারুর হাত দিয়ে খুন হয়ে গেল। পূর্বজন্মে কেউ তাকে খুন করেছিল, তাই এ জন্মে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার হাত দিয়ে খুনের বদলা নিতে হল।

প্রাঃ আগে কে হত্যা করেছে, তা বুঝব কেমন করে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এটা নিশ্চয় করে বলা মুশকিল। বীজ আগে না গাছ আগে তা কি বলা যায়? গাছ থেকে বীজ হচ্ছে, আবার বীজ থেকে গাছ হচ্ছে। তাই কে আগে, কে পরে, তা কী করে বলা যাবে?

আমি ঃ মহারাজ, অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি হত্যা হয় তা হলে এই হত্যায় পাপ হয় কি?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাচ্ছা, চিত্তভাব যদি শুদ্ধ থাকে তাহলে ওই শুদ্ধ শরীরকৃত হত্যার পাপ হয় না। এ রকম একটা বিচারের দায়িত্ব আমার কাছে এসেছিল, ওই উদাহরণের মধ্যে তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।

আমি এক সময় চুনী নদীর তীরে আসন পেতে নিজ সাধন ভজনের মধ্যে রইছি। সেই সময় এক ব্রাহ্মণ রমনী তিনটি শিশুপুত্র সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এসে একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে বললাম, "মা, তুমি কাঁদছ কেন?" তখন সেই রমনী বলল, "আপনি আমার পিতা। আপনি আমার পতি দেবতাকে বাঁচান। আমার পতি অতি দরিদ্র একজন নিরীহ ব্রাহ্মণ। ওনার কিছু ধান জমি ছিল, ওই জমির পাশে একজন মুসলমানেরও ধান জমি ছিল। কিন্তু ওই জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমার পতি দেবতার সঙ্গে মুসলমানের কিছু বচসা হল। মুসলমানটি সহজেই ক্রুদ্ধ হয়ে দু-এক কথার পর আমার পতি তখন আত্মরক্ষার্থে তার গায়ে হাত তুলল, তাতেই ওই মুসলমানটি মারা গেল। আমার পতির তাকে হত্যার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার উপর খুনের দায় এসে পড়ল। আমার পতি এখন জেল হাজতে রয়েছে। সামনের সপ্তায় ওই মামলার রায় বেরুবে। সবাই বলছে — ওনার ফাঁসী হবে। আমার স্বামীর যদি ফাঁসী হয় তাহলে ওনার সাথে আমি আর আমাদের তিন শিশুপুত্র অনাহারে মারা যাবো।

আপনার প্রিয় শিষ্য ম্যাজিস্ট্রেট রামচন্দ্র বসু মশাই-এর হাতে এই মামলার বিচার হবে। বাবা, রামচরণ বাবু আপনার একজন ভক্ত এবং আপনার আজ্ঞাবহ। আপনি বলে দিলে রামচরণবাবু আমার পতিদেবতাকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন। আমি তখন বললাম, "মা, আমি তোমার সব কথা বুঝে গিয়েছি। তুমি আর এখানে থেকো না, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাও। তুমি যে আমার কাছে এসেছিলে একথা বলবে না। তোমার পতি যদি নিরপরাধী হয়, হত্যা করবার মতলব যদি তার না থাকে তাহলে পরমাত্মাদেবের কৃপায় তোমার পতির ফাঁসী রদ হয়ে যাবে। এ কথা শুনে ওই রমনী আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল। এরপর একদিন রামবাবু এসে আমাকে প্রণাম করল। আমি হাসতে লাগলাম, তারপর তাকে বললাম, "তোমার কাছে একটি মামলার কথা তুলে ধরছি, তোমাকে এর মীমাংসা করে দিতে হবে।"

এক গাধা আর এক গরু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। রাস্তাটি একটু সংকীর্ণ। দুজনে যেতে যেতে পরস্পরের গায়ে ধাক্কা লাগলো। গাধার ধাক্কায় গরুর পায়ে কিছুটা আঘাত লাগলো। গরুটি হালকাভাবে মাথাটি ঘোরাল, গরুর ধারালো শিং-এর আঘাতে গাধার পেট ফেঁসে গিয়ে মারা গেল। গরুর কিন্তু গাধাকে মারার কোন মতলব ছিল না। কিন্তু এমনই তার ভাগ্য খারাপ যে হালকা ভাবে লাগা শিং-এর আঘাতে গাধাটি মারা গেল। এখন গরুটির কিরূপ বিচার হবে? তার কি ফাঁসী হবে? অথবা ফাঁসী থেকে রক্ষা পাবে? গরুটির যদি ফাঁসী হয়, তাহলে ওর শিশু বাছুরটিও মাতৃদুগ্ধের অভাবে মারা যাবে।

বাবু, ভেবে চিন্তে বল — এই গরুটির কীভাবে বিচার হবে? তখন রামবাবু হাসতে লাগলেন, তারপর বললেন, "মহারাজ, গরুটির যখন হত্যা করবার ইচ্ছে ছিল না, অনিচ্ছায় হয়ে গেছে, তখন গরুটির গাধাকে হত্যা করার পাপ হবে না, সুতরাং যে কোন রীতি অনুযায়ী গরুটিকে রক্ষা করাই আমার বিচার অনুসারে সঠিক।" তখন আমি বললাম, "বাবু, তোমার কাছে এ রকম একটা মামলা বিচারাধীন চলছে। যে কোন রীতি অনুযায়ী নিরীহ ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতে হবে।" এই ইঙ্গিত দিয়ে আমি যখন কথা বললাম, তখন রামবাবু অবাক হয়ে আমাকে বলল, "মহারাজ, আপনি কী করে এই মামলার বিষয় জানতে পারলেন?" আমি বললাম, — "ব্রাহ্মণ, পত্নী আমার কাছে এসেছিল। কারুর কাছে সে খবর পেয়েছে বাবুর যে গুরুদেব তাঁকে ধরলে তিনি নিরীহ ব্রাহ্মণকে রক্ষা করতে পারলেন।" রামচরণবাবু তখন বললেন, "ব্রাহ্মণ যদি নিরীহ ব্যক্তি হন, আর তার যদি হত্যা করবার মতলব না থাকে, হঠাৎ

অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা হয়ে গেছে—এই ভাবে মামলা চালাতে পারলে ফাঁসী রদ হয়ে যাবে ব্রাহ্মণের, অবশ্য তার কিছু সাজা হবে, তবে প্রাণ বেঁচে যাবে।"

তাহলে দেখো, এই উদাহরণ থেকে বুঝতে পারলে — যার ভাব শুদ্ধ তার হাত দিয়ে এ রকম হত্যার কাজ হলেও তার জন্যে তার পাপ হয় না।

প্রাঃ মহারাজ, ওই ব্রাহ্মণের জীবহত্যা কী অধর্ম নয়?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ধর্মাধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। কোন্‌টি ধর্ম, কোন্‌টি অধর্ম তা ধরতে পারা খুব কঠিন। গাধার জন্যে গাভী বধ হয়ে যাবে — এটা ভাল নয়। গাধাও পশু, গাভীও পশু। তবে গাভী হল মাতা, মাতাকে রক্ষা করাই ধর্ম। তেমনি বদমেজাজী মুসলমানের জন্য একজন নিরীহ ব্রাহ্মণের ফাঁসী দেওয়া — এটা অধর্ম। তাকে রক্ষা করাই ধর্ম। এখানে একটা আশঙ্কার কথা আছে। রাজার এমনই আইন — যে হত্যা করবে, তাকেই ফাঁসী দিতে হবে। কিন্তু এখানে বিচার আছে। ব্রাহ্মণ, গরু আর নারী এই তিন অবধ্য। এদের বধ করা চলবে না। আবার এদের বধ করলেই যে অধর্ম হবে তা-ও নয়। একজনকে বধ করলে যদি দশ জন রক্ষা পায় তাহলে সেই বধ হল যথার্থ ধর্ম। আর একজনকে রক্ষা করবার জন্যে যদি দশ জনকে নাশ করতে হয়, তবে তা হবে অধর্ম। মোটমুটিভাবে চুরি, নারী ও মিথ্যা ভাষণ — এই তিনটি বর্জন করাই ধর্ম। এই তিনটি বর্জন করলেই সব অধর্ম চলে যাবে। অধর্ম থেকে যত পাপ হয়, তা চুরি, নারী ও মিথ্যা কথা থেকেই হয়ে থাকে। অষ্টাদশ পুরাণে ভগবান ব্যাসদের পাপ ও পুণ্যের এভাবে বিচার করেছেন — পরোপকারই হল পুণ্যের কারণ আর পরপীড়নই হল যত পাপের মূল। শারীরিক, মানসিক ও বাচিক — এই তিনটির যে কোন উপায়ে পরকে কষ্ট দেবে না। শারীরিকভাবেও কারুর তুমি উপকার করলে, ফের মনে মনে তার কিছু অমঙ্গল চিন্তা করলে তাহলে শারীরিকভাবে তার যা উপকার করলে সেটা ভস্মে ঘি ঢালার মতো হল। অথবা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে অপর কারুর উপকার করলে কিন্তু তাকে এমন দুর্বাক্য প্রয়োগ করলে যে, শারীরিক ও মানসিকভাবে তার যা উপকার করেছিলে তা সব নষ্ট হয়ে গেল। যেমন এক মন দুধের মধ্যে এক ফোঁটা গো-মূত্র পড়ে যাবার মতো সব দুধটাই নষ্ট হয়ে গেল। অথবা কথাবার্তা তুমি খুব মিষ্টি করে বললে কিন্তু ব্যবহার খুব খারাপ করলে — এ রকম করলে চলবে না। এজন্য বলা হয়েছে — শারীরিক মানসিক এবং বাচিক — এই তিনটির সাহায্যে অপরের উপকার করতে হবে। তাই তো ভগবান ব্যাসদেব বলেছেন—

"পরোপকার ঃ পুণ্যায়, পাপায় পরপীড়নম্‌" এই বচন বা বাক্য সর্ববাদী সর্বসম্মত। হিন্দু, মুসলমান, খৃশ্চান — সব ধর্মের লোকই — এই শ্লোক মেনে চলে। হ্যাঁ সব লোকই বলবে — পরোপকার করলে পুণ্য হয়, আর পরকে দুঃখ দিলে পাপ হয়। এই বাক্যে কারোর কোন শঙ্কা নেই। যে ব্যক্তি ধর্মাত্মা হয় সে কোন একটি ধর্ম বৃত্তি বা সদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করে নেয়। একটি আয়ত্ব হলে অপরগুলি আপনা থেকেই তখন আয়ত্ব হয়ে যায়। এ সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ একটি গল্প বলছি —

এক রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন বড়ই ধর্মপ্রাণ। তাঁর রাজধানীতে একটা বড় বাজার বসত। তবে সেই বাজারে কেনা-বেচা ক্রমশঃ কমে যেতে লাগল। তখন যত ব্যবসায়ী ছিল তারা সবাই মিলে রাজাকে একটি দরখাস্ত দিল। দরখাস্তে লেখা হল — হুজুর, বাজারে জিনিসপত্র তেমন বিক্রি হচ্ছে না, তাতে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে। তাই বাজারে কেনা-বেচা যাতে বেশী হয় তার উপায় বলে দিন। রাজা তখন ব্যবসায়ীদের বললেন, "তোমরা ভালো ভালো জিনিস নিয়ে বাজারে বসো। সারাদিনের কেনাবেচার পর তোমাদের যে সব জিনিস বিক্রি হবে না, সন্ধ্যেবেলা সেগুলো সব আমি কিনে নেব।" রাজার কথা মতো সেইভাবেই বাজার চলতে লাগল। দুদিনেই বাজার আবার জমজমাট হয়ে উঠল।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন ছিল রাজার শত্রু। একদিন সে অলক্ষ্মীর একটা সুন্দর মূর্তি গড়িয়ে বাজারে এসে বসল। লোকে দেখে আর বলে ঃ "বাঃ, ভারী সুন্দর মূর্তি তো, এ কোন্‌ দেবীর মূর্তি।" খদ্দেররা তখন ভয়ে ভয়ে অলক্ষ্মীকে দূর থেকে প্রণাম করে বলতে লাগল, "ওরে বাবা, অলক্ষ্মীকে কে সাধ করে ঘরে নিয়ে যাবে? তোমার ওই মূর্তি কেনা দূরে থাক, আমরা কেউ আর তোমার দোকানের ছায়াও মাড়াব না।"

সন্ধ্যোর সময় ওই ব্যবসায়ী রাজসভায় গিয়ে রাজাকে বলল, "মহারাজ, আমার এই দেবীমূর্তি আজ বিক্রি হয় নি, এ-মূর্তি আপনি রেখে দিন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "এটি কোন্‌ দেবীর মূর্তি?" ব্যবসায়ী বলল, "অলক্ষ্মী মায়ের মূর্তি।" ব্যবসায়ীর কথা শুনে পাত্রমিত্র সভাসদ সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা রাজাকে বলল, "কিছুতেই আপনি এই মূর্তি কিনবেন না, এ যে অলক্ষ্মী। রাজা বললেন, "আমি সত্যভঙ্গ করতে পারি না। ওদের আমি কথা দিয়েছি, যে ওদের যে সব জিনিস বিক্রি না হবে, তা আমি সন্ধ্যেবেলা কিনে নেব। অলক্ষ্মী হলেও তা আমাকে নিতেই হবে।" পাত্রমিত্র থেকে আরম্ভ করে সবাই রাজাকে অনুনয় করে বলল, "মহারাজ, একে ঘরে রাখলে আপনার রাজলক্ষ্মী চলে যাবেন। একে আপনি নেবেন না।" তখন রাজা আবার বললেন, "রাজলক্ষ্মী যদি চলে যান, আমার রাজ্য যদি চলে যায় তাও ভাল, তবু

আমি সত্য থেকে ভ্রষ্ট হব না।" রাজা তখন ব্যবসায়ীকে দাম মিটিয়ে দিয়ে অলক্ষ্মীকে নিজের পুজোর ঘরে নিয়ে এসে রাখলেন। রাজা রোজ শেষরাতে উঠে পুজোয় বসতেন। তিনি পুজোয় বসেছেন এমন সময় দেখতে পেলেন — এক অলৌকিক দেবীমূর্তি কাঁদতে কাঁদতে পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। রাজা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, এই শেষরাতে এই অলৌকিক দেবীমূর্তি কোথা থেকে এখানে এলেন, তিনি কাঁদছেনই বা কেন আর যাচ্ছেনই বা কোথায়? রাজা ছিলেন জিতেন্দ্রিয়, তাই তিনি দেবীর মুখের পানে চাইলেন না। পায়ের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন — "মা তুমি কে? তুমি কাঁদছ কেন? কোথায় যাচ্ছ তুমি?" অতি মধুর অথচ করুন কণ্ঠে দেবী বললেন ঃ "আমি তোমার রাজলক্ষ্মী, অলক্ষ্মী আমার সতিন। তুমি তাকে এনে আমার পাশে বসিয়েছ, তাই আমি আর এখানে থাকব না। আমি চলে যাচ্ছি। তবে আমি চলে গেলে তোমার রাজ্যে ঘোর অকল্যাণ দেখা দেবে। তাই বলছি — আমাকে যদি চাও, তাহলে অলক্ষ্মীকে এখনই বিদায় করো।" রাজা বললেন, "মাগো, আমি তোমার ছেলে, ছেলেকে কী তুমি মিথ্যের আশ্রয় নিতে বলছ? আমি সত্যবাদী, সত্যকে আমি কী করে ছাড়ব? তুমি যদি আমার কাছে থাকতে চাও, থাকো, যদি তুমি আমাকে ত্যাগ করে চলে যেতে চাও, তাই যেয়ো, আমি কিছুতেই সত্যকে ত্যাগ করব না।" রাজলক্ষ্মী তখন ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রাজা এবার দেখলেন যে এক অপরূপ সুন্দরী আর একটি স্ত্রীমূর্তি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছেন। রাজা তাঁকেও জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে?" তিনি বললেন, "আমি তোমার ভাগ্যলক্ষ্মী, আমি রাজলক্ষ্মীর ছোট বোন। দিদি যখন তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তখন আমিও চললাম।" কিছুক্ষণ পর রাজার নজরে পড়ল এক অনিন্দ্যকান্তি পুরুষও ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। অবাক হয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে?" পুরুষটি বললেন, "আমি ধর্ম। আমার মা রাজলক্ষ্মী যখন বিদায় নিয়েছেন, তখন আমিও তোমার ঘরে থাকব না।" এইভাবে নীতি, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি যত সদ্‌বৃত্তি ছিল সবাই একে একে মূর্তি ধারণ করে রাজার সামনে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সকলের শেষে এক পুরুষ মূর্তি খুব সঙ্কোচে চোরের মতো চুপি চুপি রাজার পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছে, দেখে রাজা তাকেও জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি?" সে বলল, "আমি সত্য।" অমনি রাজা তার হাত দুখানি শক্ত করে চেপে ধরে বললেন, "তুমি যাচ্ছ কোথায়? তোমার জন্য আমি

সব ছেড়েছি, তবু তোমাকে ছাড়িনি। আর তুমি কি না চুপি চুপি চলে যেতে চাইছো! এখান থেকে তোমার যাওয়া কিছুতেই চলবে না, আমার ঘরে, অচল হয়ে তোমাকে থাকতে হবে।" সত্য খুব লজ্জা পেলেন, তারপর বললেন, "মহারাজ, আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব সবাই চলে গেল, একলা আমি কী করে এখানে থাকি?" রাজা বললেন, "সে সব আমি জানি না, শুধু এটুকু জানি যে তোমাকে আমি এখান থেকে যেতে দিতে পারব না, আর সেই অধিকার আমার আছে।" তখন, সত্য আর কী করেন, রাজার ঘরেই তিনি রয়ে গেলেন।

সত্যকে ছেড়ে নীতিও আর থাকতে পারে না, তাই নীতিকে আবার ফিরে আসতে হল। নীতি ফিরে এল বলে দয়া ক্ষমা প্রভৃতি এরাও ফিরে এল। এদের ছেড়ে ধর্মই বা থাকে কী করে? তাই ধর্মকেও ফিরে আসতে হল। ছেলেদের ছেড়ে মা-মাসীদেরও দূরে থাকা সম্ভব নয়, তাই রাজলক্ষ্মী ও ভাগ্যলক্ষ্মীও আবার রাজার ঘরে এসে গেল। একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করে সমস্ত সৎবৃত্তি তখন রাজার আয়ত্তে এসে গেল। এইভাবে ধর্মের ক্ষেত্রে যেকোন একটি সদ্‌বৃত্তিকে নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রাখতে পারলে অন্যান্য সদ্‌বৃত্তিও আয়ত্তে এসে যায়।

তোমাদের পুরাণে দাতা কর্ণের উপাখ্যানও ঠিক এ রকম। দাতা কর্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল — আমার কাছে এসে যে যা দান চাইবে — আমার প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু আমি তাকে সেই দান প্রদান করবো। দেখো, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কর্ণের দান বৃত্তি পরীক্ষা করবার জন্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বেশে এলেন এবং তার কাছে এই দান চাইলেন — তুমি আর তোমার রাণী ভানুমতি দুজনে মিলে তোমাদের যে শিশু পুত্র বৃষকেতু আছে, তাকে নিজ হাতে কেটে তার কোমল মাংস আমাকে খাওয়াও। তাহলে দেখো, কী ভীষণ পরীক্ষার মধ্যে কর্ণ পড়ল। যদি রাজারাণীর দুজনের প্রাণ ব্রাহ্মণ চাইত, তাহলেও ব্যাপারটা সহজ হতো। এ রকম কখনও হয়েছে, — নিজ শিশুপুত্র এক অবোধ বালক কিছুই জানে না — তাকে কেটে দিলে তবে ব্রাহ্মণ সেই মাংস ভোজন করবে! এ রকম ভাষা শুনলেই হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। দেখো, কর্ণ নিজের দান পূর্ণ করলেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ভিক্ষা হিসাবে নিজ পুত্রকে কাটলেন। তাহলে কী দেখা গেল? কর্ণ পুত্রের প্রাণ ফিরে পেলেন। আর ভগবানও সন্তুষ্ট হলেন। কর্ণ-পুত্রের নতুন জীবন লাভ হল। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কর্ণের দানের বাহাদুরী দেখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। দান ধর্মকে কর্ণ আয়ত্ত করে নিয়ে ছিল। এতেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে কর্ণ সন্তুষ্ট করতে সমর্থ হল। দেখো ভাই প্রাণ গোপাল, ধর্মের যে কোন একটি বৃত্তি ধরে রাখতে পারলে তাতেই সব কিছু এসে যাবে। কেউ দানকে কেউ দয়াকে, কেউ সত্যকে,

কেউ কমাকে, কেউ পরোপকারকে নে করেই হোক একটা সদ্‌বৃত্তিকে ধরে রাখতে হবে। তবেই ব্যাসদেবের যে দুটি বাক্য আছে —"পরোপকারঃ পুণ্যায়, পাপায় পরপীড়নম্" — এ দুটি বাক্যও সর্ববাদী সম্মত ও সিদ্ধ বাক্য।

"সর্বত্র পরমার্থ দৃষ্টি ঃ সর্বাবস্থাসু সর্বদা।"

অর্থাৎ সব অবস্থায়, সর্বদা এবং সর্বত্র যেন তোমার পরমার্থ দৃষ্টি প্রসারিত থাকে। তা হলেই অনায়াসে তোমার সেই অবস্থা লাভ হবে।

দেখো, এই একটা সৎসঙ্গের মধ্যে কত সৎসঙ্গ হয়ে গেল। এই শ্লোকটি হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করে নেবে।

বিংশ পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম, রান্নাবাটীর দালান ঃ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ,
জ্যৈষ্ঠ মাস, সময় ঃ সকাল
পাথুরিয়াঘাটার জমিদার শ্রী দেবী প্রসন্ন ঘোষ
ও
শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই তিনটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি ঃ এই তিন-এর মধ্যে সমন্বয়, একে অন্যের সহায়ক]

"সহস্র চণ্ডী" যজ্ঞ আশ্রমে হয়েছিল এবং সেই পুণ্যময় যজ্ঞ দর্শন করতে বহু শিষ্যমণ্ডলী ও ভক্তগণ সেই সময় আশ্রমে একত্রিত হয়েছিলেন। কলকাতার জোড়াবাগানের কিশোর জমিদার শ্রীদেবী প্রসন্ন ঘোষ এসেছিলেন। দেবী প্রসন্ন শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের এক বিশেষ প্রীতির পাত্র। দেবী প্রসন্নের সঙ্গে শ্রীগুরুমহারাজ সৎসঙ্গ করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাল, ওহে দেবী, তুমি বলতো — কর্ম ভক্তি, জ্ঞান — এই তিনটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি?

দেবী ঃ মহারাজ, কর্মই শ্রেষ্ঠ।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, তুমি ঝট্ করে বলে দিলে কর্ম শ্রেষ্ঠ। তুমি এই বিষয়ে ভাল করে চিন্তা ভাবনা করে তবেই বলবে। বিষয়টি ঝট্ করে বলার মতো নয়। যখন কোন কথা তুমি বলবে, তখন তুমি তা আগে নিজে ভাল করে বুঝে তারপর বলবে। যতক্ষণ না তুমি কোন কথা অপরকে বলছো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কথা তোমার হাতের মুঠোয় রয়েছে। কিন্তু তুমি যদি এক দফায় ঝট্ করে কথা বলে ফেল তাহলে

সেই কথা তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে আর থাকবে না, অন্যের হাতে চলে যাবে। সেই জন্য ঝট্ করে কোন কথা বলবে না, অনেক চিন্তা করে তবেই কথা বলবে। তুমি বললে — কর্ম শ্রেষ্ঠ। এই রায় তুমি দিয়ে দিলে। শোন, তোমার এই রায় ঠিক নয়। তোমার এই রায় বাতিল হয়ে যাবে। তুমি বললে — আগে কর্ম। আমি বলছি — আগে জ্ঞান। এই কর্ম করলে এই ফল — এই জ্ঞান' যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেন তুমি কর্ম করবে? কর্ম করতে তোমার প্রবৃত্তি হবে না।

দেবী ঃ মহারাজ, কর্মফল জ্ঞান আমি ছেড়ে দেবো কর্ম করা আমার কর্তব্য এই বোধে আমি কর্ম করে যাবো।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো দেবী, তাতেও তোমার হার (পরাজয়) হবে। কর্তব্য জ্ঞানকেও তো জ্ঞান বলতেই হবে। দেখো ভাই, এখানে জ্ঞানই প্রধান রূপে এসে যাচ্ছে, তুমি চিন্তা করে বল।

দেবী ঃ হ্যাঁ, মহারাজ, জ্ঞানই সবার আগে।

তখন গুরু মহারাজ হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন—

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ নয়, তুমি যখন জ্ঞানের পক্ষ নিয়ে নিয়েছ, আমি তখন ভক্তির পক্ষ নিয়ে নিয়েছি। তুমি জ্ঞানের পক্ষে কথা বলেছো, আমি এখন ভক্তির পক্ষ নিয়ে কথা বলবো, আমি বলছি —ভক্তি শ্রেষ্ঠ, ভক্তি না হলে জ্ঞান হবে না। তোমাকে দুটি ফল দেয়া হল — একটি রসযুক্ত অপরটি রসশূন্য। তুমি কোন্ ফলটি গ্রহণ করবে? জ্ঞান হল ফল আর তার রস হল ভক্তি। ভাই দেবী, তুমি বলতো, যে ফলে রস নেই, সেই ফল কেমন হবে?

দেবী ঃ ওই ফল শুকনো হবে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ সাবাস, তুমি ভাল উত্তর দিয়েছো। ওই শুকনো ফল কার ভাল লাগবে?

দেবী ঃ ওই শুকনো ফল কারোরই ভাল লাগবে না। এ রকম ফল কেউ চায় না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেবী, শুকনো ফল তো লোকে ফেলে দেয়, কেন না এতে কোন কাজ হয় না। ভক্তিশূন্য, জ্ঞানের এরকম হাল হয়ে থাকে, তাই ভক্তিশূন্য জ্ঞানের কোন আবশ্যকতা নেই। ওই জ্ঞান ফেলে দেবার যোগ্য।

প্রফেসর নলিনীবাবু সেখানে বসে ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে শ্রীগুরু মহারাজ বলতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই নলিনী, তুমি তে দেবীর শিক্ষক মশাই। তোমার ছাত্র

যে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয়, তার উত্তর তোমাকে দিতে হবে। তুমি বল—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি — এই তিনটির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? জ্ঞানবাদী বলবে — জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান না হলে কর্ম করার প্রবৃত্তি কী করে হবে? এই কর্ম করলে এই ফল মিলবে। কর্মের ফলাফল যদি না চাও, কর্তব্য বোধে যদি কর্ম কর, সেখানেও জ্ঞানের বিষয় এসে যাবে। কর্তব্যজ্ঞানও তো এক রকম জ্ঞান। জ্ঞান না হলে কর্মও হবে না। কর্মবাদী যারা তারা বলবে — কর্মই প্রধান। কর্ম না করলে চিত্তশুদ্ধি হবে না। আর চিত্ত শুদ্ধি না হলে জ্ঞান হবে না। ভক্তিবাদী বলবে — ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। ভক্তি না হলে জ্ঞান শুকনো হয়ে যাবে। শ্রদ্ধা ভক্তি না হলে কর্মও সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে না। সকল কর্মের সকল জ্ঞানের শুরুতেই শ্রদ্ধা ভক্তি একান্ত প্রয়োজন। ফের জ্ঞানবাদী বলবে—জ্ঞান না হলে ভক্তি টিক্‌বে কী করে? ইনি আমার প্রভু, আমি তার দাস। প্রভু জ্ঞান যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ ভক্তি খাড়া হয়ে থাকতে পারবে না। দেখো ভাই নলিনী, — জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির মধ্যে লড়াই লেগেছে, তুমি কোন্ পক্ষ সমর্থন করবে?

ন ঃ মহারাজ, এখানে তিনজন যোদ্ধা আর তিনজনই সমযোদ্ধা। কাউকে ছোট বড় বলা যাবে না।

এটর্নি বাবু সরোজেন্দ্র কুমার দত্ত (হাটখোলা নিবাসী) ওখানে বসে ছিলেন। তিনি বললেন —

সরোজ ঃ মহারাজ, আমার মনে হয়েছে — এরা তিনজন সমযোদ্ধা তো বটেই, তবে অধিকারী ভেদে ছোট বড় মানতেই হবে। কর্মের অধিকারীর পক্ষে কর্ম, জ্ঞানের অধিকারীর পক্ষে জ্ঞান আর ভক্তির অধিকারীর পক্ষে ভক্তিই প্রধান।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ সাবাস! সাবাস! তুমি তো একজন এটর্নি। এই ব্যাপারে তুমি ভাল পথ বের করেছো, এরপর আর কিছু বলার নেই। তোমার এই সিদ্ধান্তই ঠিক যে ব্যক্তি যে বিষয়ের অধিকারী তারপক্ষে সেটাই শ্রেষ্ঠ মার্গ। তবে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম -এই তিনের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্য হল কর্মপরমার্থ লাভ করা। এই তিনটি হল এক একটি রাস্তা। যার যে রাস্তায় চলতে সুবিধা হবে, সে সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে যাবে। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি একই সূত্রে বাঁধা। একটির সাধন হলে আর দুটির সাধন আপনা থেকেই হয়ে যাবে। এমন তো নয় যে কর্ম নিয়ে থাকলে জ্ঞান বা ভক্তি লাভ হবে না। কিংবা ভক্ত কখনো জ্ঞানী বা কর্মী হতে পারবে না, আবার এমনও নয় যে, জ্ঞানীর পক্ষে ভক্ত বা কর্মী হওয়া চলবে না। জ্ঞান, ভক্তি আর কর্ম

এই তিনটি পথ হল একে অন্যের সহায়ক ও পরিপূরক।

দেখো বাছা দেবী, তুমি তো বুদ্ধিমান ছেলে। তুমি দর্শন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করছ। আমার এখানে এলে মাঝে মাঝে আমি তোমার পরীক্ষা নেব। দেখো, পঠন পাঠন ব্যাপারে কত পরীক্ষা তোমাকে দিতে হচ্ছে, পরমার্থ বিষয়েও তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। এখানে যা যা সৎসঙ্গ তুমি শুনলে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মরণ মনন করবে। তা করতে করতে তোমার অনুভূতি এসে যাবে। অনুভূতি না হলে শুধু ভাষা জ্ঞানে কিছু লাভ হবে না। ভাষা ভাব রাজ্যে নিয়ে যায়, তা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে —এটাই ঠিক।

একবিংশ পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম, ধ্যান কুঠীর রোয়াক ঃ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ,
জ্যৈষ্ঠ মাস, সময় ঃ সকাল
কলিকাতার ডাক্তারবাবু গিরীশ চন্দ্র ঘোষ
ও
শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[অদ্বৈতে মিষ্টতা নেই — মিষ্টতা আছে দ্বৈতে ঃ দ্বৈতবাদ সিদ্ধ করা সহজ — অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ করাতেই যত কেরামতি ঃ ইষ্টদেব বা দেবীর উদ্দেশ্যে গীত সংগীত শ্রুতি মধুর হয় — সাধককে উচ্চ মার্গে নিয়ে যায়।]

ডাক্তারবাবু তাঁর ছোট ছোট পুত্রকন্যাদের নিয়ে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজকে দর্শন করতে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ "ভাই গিরীশ, তুমি তো মিলিটারীর সিপাই। তুমি যমরাজের সঙ্গে লড়াই করে থাক। যমরাজ বলছে, এই রোগীকে আমি নিয়ে যাব। তুমি বলছ — আমি এই রোগীকে নিয়ে যেতে দেব না। তাহলে দেখো, যমরাজের সঙ্গে তোমার লড়াই লেগেই থাকে। তুমি হলে যমরাজের সঙ্গে লড়াই করণেওয়ালা।"

গিরীশবাবু মহারাজের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন না, তবে তাঁর একজন ভক্ত ছিলেন। গিরীশবাবুর কিশোর পুত্র প্রশান্তচন্দ্র গুরু মহারাজের দীক্ষিত শিষ্য। তিনি সেখানে বসেছিলেন, গুরুদেবকে তিনি বললেন — 'গুরুমহারাজ, আপনাকে আমি একটা ভজন গান শোনাব। এটাই আমি মনে মনে সংকল্প করেছি।' গুরু মহারাজ গান বাজনা পছন্দ করতেন না। তবু ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য তিনি শুনতে রাজি

হলেন এবং বললেন, "বেশ বাছা, তোমার ইচ্ছে হয়েছে — আমাকে ভজন শোনাবে, তাহলে শোনাও।" প্রশান্ত চন্দ্র বেশ ভাল সুকণ্ঠী ছিলেন, আর সুর তাল মেনে আপন ইষ্টদেবের ভজন শোনাতে লাগলেন। সেই সময় প্রশান্ত চন্দ্র এমন ভাব সংযুক্ত গীত গাইতে লাগলেন যে, ওই গান শুনে সব লোক একদম মুগ্ধ হয়ে গেল।

কীর্ত্তন

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ,
জলদ সুন্দর কম্বু কন্দর নিন্দি সিন্দুর ভঙ্গ
(কিসে গণি) সে সিন্ধুলীলা কিসে গনি।
শ্যাম সুন্দরের আগে সিন্ধুলীলা কিসে গনি
প্রেম আকুল, গোপ আকুল, প্রেম আকুল, গোপ আকুল,
নয়ন ঝুরে তোমার লাগি নয়ন ঝুরে
ধারা ঝরে নয়নের বারি তোমার লাগিয়া ঝুরে।
প্রেম আকুল গোপ গোকুল কুলজ কামিনীকান্ত
কুসুম রঞ্জন মঞ্জু মঞ্জুল, কুঞ্জ মন্দিরে শান্ত,
(দেখে এলাম) রাধে, এই এখনই দেখে এলাম
কুঞ্জ দ্বারে তোমার কান্তে এই এখনই দেখে এলাম,
কুলজকামিনীকান্ত কুলজকামিনীকান্ত,
বসে আছে রাধে, পথ চেয়ে বসে আছে,
কুঞ্জদ্বারে তোমার লাগি পথ চেয়ে বসে আছে
কুঞ্জ লোচন কলুষমোচন, কুঞ্জলোচন কলুষমোচন।
দুটির কিসে বা তুলনা দিব।
কুঞ্জ লোচন, কলুষমোচন, শ্রবণ রোচন ভাষ
অমল কোমল চরণ কিশলয় নিলয় গোবিন্দ দাস
সুধা ঝরে, তাপিত হৃদয় জুড়ায় ঝরে
শ্রীগোবিন্দের বাণী নয় তো, সদা যেন সুধা ঝরে
অমল কমল চরণ কিশলয়
অমল কমল চরণ কিশলয়।
কোমল অতি, নবনীত জিনি শ্যামের চরণ দুটি কোমল অতি
রাতুল চরণ, দিও অন্তিমে রাতুল চরণ

দিও হে দিও, অন্তিমে রাতুল চরণ,
ওগো ভবপারে যাবার সময় দিও হে রাতুল চরণ,
শ্রীগোবিন্দ দাসে, গোবিন্দ দিও হে রাতুল চরণ।।

সেখানে যারা বসেছিল, এই গান শোনার পর তাদের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। গুরুমহারাজের চোখেও জল এসে গেল। আমাদের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে গুরু মহারাজ বাংলা ভাষা বুঝতে পারেন না। তাই আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, "বাবা, আপনি তো বাংলা ভাষা ভাল বুঝতে পারেন না, তাহলে আপনার চোখে জল এল কী করে ? তখন গুরু মহারাজ বললেন, বাংলা গান একেবারে বুঝিনে তা নয়, কিছু কিছু বুঝি। আর এখানে একটা কথা আছে। ভাবগ্রাহী জনার্দন। ভাষা বুঝতে পারা কোন কাজ নয়। ভাব গ্রহণ করতে পারলেই সব কিছু হয়ে যায়। ভগবান আর কিছুই গ্রহণ করেন না। তিনি ভক্তের ভাব গ্রহণ করে থাকেন। প্রশান্ত চন্দ্র যে ভাব নিয়ে আমাকে এই গান শোনাল, সেই ভাবকে বুঝতে পারাই আসল ব্যাপার। তখন গুরু মহারাজ প্রশান্ত চন্দ্রকে বললেন — "বাচ্ছা প্রশান্ত, তুমি এখনও পর্যন্ত বালকই আছ। তুমি যে ভজন আমাকে শোনালে, ওই গানের ভাব তোমার হৃদয়ঙ্গম হোক — এটিই তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ।" সেখানে প্রাণগোপাল বাবু বসে ছিলেন। গুরুমহারাজ তাঁকে প্রশ্ন করলেন — ভাই প্রাণগোপাল, বলতো — এই গীত শোনার পর কেন আমার চোখে জল এসে গেল! আগে তো এরকমভাবে আমার চোখে জল কখনও আসেনি। এখন আমার চোখের জল রোধ করতে পারলাম না। তাহলে কী তোমাদের সঙ্গে সঙ্গ করেই আমার এ রকম হল?

প্রাণগোপাল ঃ এতদিন ধরে আপনি কঠোর চিত্তের মহাত্মা ছিলেন। এখন আপনি স্নিগ্ধ চিত্তের মহাত্মা হয়েছেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এ কথা বলার তাৎপর্য কী?

প্রাণ গোপাল ঃ আপনি একজন পরম যোগী। আপনি তো পরমাত্মাদেবের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গেছেন অর্থাৎ সোহম্ হয়ে গেছেন। এতদিন ধরে আপনি অদ্বৈত ছিলেন। আমরা আপনাকে দ্বৈতে নিয়ে এসেছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ অদ্বৈতে তো কিছু মিষ্টতা নেই। কিন্তু দ্বৈতে এসে গেলে মিষ্টতা, স্নিগ্ধতা সবই এসে যায়। চিনি হয়ে গেলে কি মিষ্টতা , স্নিগ্ধতা বোঝা যাবে? চিনি খেলে তবেই তার মিষ্টতা, স্নিগ্ধতা বুঝতে পারা যাবে।

এই কথা বলে গুরু মহারাজ খুব হেসে বললেন —

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, এ সম্পর্কে একটা গল্প উদাহরণ দিয়ে বলছি ঃ — একজন সাধু আর এক ছিলেন পণ্ডিত। সাধু হলেন অদ্বৈতবাদী আর পণ্ডিতটি দ্বৈতবাদী। পণ্ডিত একদিন মনে মনে ভাবলেন যে, তিনি সাধুটির কাছে যাবেন ও তাঁর অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করে দিয়ে আসবেন। এই ভেবে তিনি সাধুর কাছে গিয়ে বললেন "আমি দ্বৈতভাব সিদ্ধ করব ও আপনার অদ্বৈতবাদকে আমি খণ্ডন করে দেব।" সাধু শুনে বললেন, বেশ তো, তুমি বোসো, আমিও আমার অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ করে দেব।"

দুজনে বসে আছেন, এমন সময় সেখানে দিয়ে এক ধোপা যাচ্ছিল। সাধু তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?" ধোপা বলল, "সাধু বাবা, আমি ধোপা।" সাধু বললেন, "না তুমি ধোপা নও, তুমি ব্রহ্ম।" শুনে সে বেচারী বলল, "বাবা, কেন আমাকে এমন কথা বলছেন, অমি ব্রহ্ম নই, আমি সামান্য ধোপা মাত্র।" সাধু তাকে বললেন, "তোমাকে দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না, তুমি যেতে পারো।"

একটু পরে একজন নাপিত যাচ্ছিল সেই পথে। তাকেও সাধু ডাকলেন এবং প্রশ্ন করলেন — 'তুমি কে? সে বলল, "আমি নাপিত।" সাধু বললেন, "আরে না, না, তুমি নাপিত নও, তুমি তো ব্রহ্ম।" নাপিত শুনে বলল, "আমার সঙ্গে এমন পরিহাস করছেন কেন বাবা? আমি ব্রহ্ম নই, আমি নাপিত মাত্র।" সাধু তাকেও তখন বিদায় দিলেন।

এতক্ষণ পণ্ডিত চুপ করে বসেছিলেন। এবার পণ্ডিত সাধুটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "সাধুজী, এবার আমার দিকে একটু খেয়াল করুন। আমি এসেছি দ্বৈতবাদকে সিদ্ধ করব বলে, আর আপনি সিদ্ধ করবেন অদ্বৈতবাদকে।" তখন সাধু বললেন, "হে পণ্ডিত, দ্বৈত করা কী এমন কঠিন কাজ? দেখো, সামান্য ধোপা নাপিতও তো তা সিদ্ধ করে দিয়ে গেল তোমার সামনেই। এমন নগন্য লোকও যখন দ্বৈত সিদ্ধ করে দিতে পারে, তখন তুমি আর কী সিদ্ধ করবে? অদ্বৈত সিদ্ধ করাতেই হল যত কেরামতি।"

এই গল্পটি শুনে প্রাণগোপালবাবু হাসতে লাগলেন, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজও হাসতে লাগলেন, এই হাসির তাৎপর্য কী তা আমরা বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, প্রাণগোপাল, তুমি বলতো প্রশান্তচন্দ্রের ভজন গান আজ কেন এত শ্রুতিমধুর হল? সব লোক এই গান শুনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে।

প্রাণগোপাল ঃ মহারাজ, এ সম্পর্কে একটা গল্প আছে - তা আপনাকে আমি শোনাচ্ছি, তাতে আপনার প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে।

তানসেন নামে এক সাধক ছিলেন। তাঁর সাধনা করতে করতে তানসেন সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। এক জঙ্গলের মধ্যে তানসেনের গুরুদেব বাস করতেন। তানসেন গুরুদেবের সেবা করতেন আর সময় সময় আপন মনে ভজন গাইতেন। জঙ্গলের পাশে একটি নদী ছিল। একদিন ওই নদীতে নৌকো করে আকবর বাদশা যাচ্ছিলেন। দূর থেকে বাদশা তানসেনের ভজন গান শুনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাদশা মাঝিকে বলে নৌকো পারে ভিড়িয়ে দিয়ে তা থেকে নেমে পড়লেন এবং তারপর গান অনুসরণ করতে করতে একেবারে তানসেনের কাছে এসে পৌঁছলেন। যতক্ষণ ধরে তানসেন গান গাইতে লাগলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আকবর বাদশা মুগ্ধ হয়ে তাঁর গান শুনতে লাগলেন। এক সময় তানসেন গান বন্ধ করলেন। তখন বাদশা তানসেনকে জিজ্ঞেস করলেন, "মশাই আপনার গান শুনে আমি একদম মুগ্ধ হয়ে গেছি। আপনি আমার সঙ্গে আমার রাজধানী দিল্লিতে চলুন। সেখানে আপনাকে সভাসদ করে রেখে দেবো।" ফকির তানসেন এই কথা শুনে খুবই দুঃখিত হল। তানসেন তখন বাদশাকে সঙ্গে করে গুরুর কাছে নিয়ে গিয়ে বাদশার আবেদন গুরুর কাছে পেশ করল। গুরু তো সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁর কাছে ভূত ভবিষ্যতের কথা অজানা নয়। তিনি বললেন, "বৎস তানসেন, তুমি দুঃখ কোরো না। তুমি বাদশার সঙ্গে যাও। তোমার ভাগ্যে ফকির বৃত্তি নেই। তোমাকে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করতে হবে। বাদশার সঙ্গে গেলে তোমার আহার বিহারের কোন কষ্ট থাকবে না।"

গুরু মহারাজ যখন এরকম আদেশ করলেন তখন তানসেন আর কী করবে — দুঃখ-ভরা মন নিয়ে তো আকবর বাদশার সঙ্গে গেলেন। বাদশা তানসেনকে খুব সমাদর করে নিজের সভাসদ করে নিলেন। আর তার কাছ গিয়ে মাঝে মাঝেই ভজন গান শুনতে লাগলেন। কিছুদিন এভাবেই চলতে লাগল। একদিন বাদশা তানসেনকে বললেন, "তুমি জঙ্গলের মধ্যে যে ভজন গান গেয়েছিলে ওই গান শুনে আমি একদম মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ওই রকম সংগীত আমাকে তুমি শোনাচ্ছ না কেন, তানসেন তখন বললেন, "ওই রকম সংগীত আমি এখন আর গাইতে পারব না।" বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, "কেন, এর কারণ কী?" তানসেন বললেন, "হুজুর, আপনি যদি আমাকে অভয় দেন তাহলে এর কারণ বলতে পারি।" বাদশা বললেন, "তানসেন, আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি তুমি আমাকে সব কিছু বল।" তখন তানসেন বললেন, "জঙ্গলের মধ্যে সেদিন আমি পরমেশ্বরকে গান

শুনিয়েছিলাম। এখন তো আর জগদীশ্বরকে গান শোনাচ্ছি না, শোনাচ্ছি দিল্লিশ্বরকে। জগদীশ্বর যখন আমার গান শুনতেন তখন গানটিও খুব মধুর হোত। এখন আর ওই রকম সংগীত কণ্ঠ দিয়ে বেরুবে না। এখন আমার গানের শ্রোতা দিল্লিশ্বর বাদশা।"

মহারাজ, আজ প্রশান্ত চন্দ্রের ভজন গান শ্রুতি মধুর হওয়ার কারণ — প্রশান্ত চন্দ্র আজ ভজন গানটি স্বয়ং ইষ্ট দেবতাকে শুনিয়েছে। আপনিই ইষ্টদেবতা, আপনার কাছে সে আজ হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিয়েছে। এই কারণে তার ভজন গান জঙ্গলের মধ্যে তানসেনের গানের মতো এত মধুর হয়েছে। মহারাজ, সংগীত সাধারণ বস্তু নয়। সংগীত চতুর্বেদের মধ্যে অবস্থান করছে। সামবেদ কী? সামবেদ সংগীত ছাড়া আর কিছু নয়। ভগবান গীতা শাস্ত্রের মধ্যে বলেছেন — চতুর্বেদের মধ্যে আমি সামবেদ।

মহারাজ, সুরের সঙ্গে সঙ্গীতের এমনই অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক যে ওই সঙ্গীত সাধককে একেবারে সমাধি রাজ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম। অর্থাৎ ভজন সাধককে এমন একটা উচ্চ মার্গে নিয়ে যায় যে সাধকের সিদ্ধি লাভ হয়। তবে ওই সংগীত যদি নিম্নস্তরে চলে যায় তাহলে গায়কের অধোগতি হয়।

সব শুনে গুরুমহারাজ বললেন — ভাই, শব্দ তো ব্রহ্ম। তবে এই শব্দের প্রয়োগকারীকে ভালো হতে হবে।

দ্বাবিংশ পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ আশ্রম ঃ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, জ্যৈষ্ঠ মাস, সময় ঃ সকাল
উকিল, বাবু রাখাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ও
শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[তীব্র মুক্তির আকাঙ্খা জাগলে সদ্‌গুরুর দর্শন মেলে ঃ সাধারণ মানুষ বন্ধনেই সুখ পায় — তা ভ্রান্ত ঃ হিংসার ভালোর দিক]

রাখালচন্দ্র ঃ গুরু মহারাজ, আমার পুত্র বিজনচন্দ্রের স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। তাই তার বিয়ে দেবার তোড় জোড় চলছে, কিন্তু ও বিয়ে করতে চাইছে না। এ বিষয়ে আপনার কী মত তা আপনি প্রকাশ করুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, আমার প্রিয় শিষ্য ম্যাজিস্ট্রেট রামচরণ বাবুর যখন পেনসন

হয়ে গেল সে তখন আমার কাছে এসে বলল — মহারাজ, আমার তো পেনসন হয়ে গেল, কিন্তু আমার ফের নতুন এক চাকরি পাওয়া গেছে। দ্বারভাঙ্গা মহারাজ আমাকে ম্যানেজারির পদ গ্রহণ করবার জন্যে বলছেন। এখনও পর্যন্ত আমি তাকে স্বীকৃতি জানাইনি। এতে আপনার অনুমতি আছে কী? তখন আমি রামচরণবাবুকে বললাম — ভাই, একটা গল্প তোমাকে উদাহরণ হিসেবে শোনাচ্ছি, তাতেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।

এক রাজা ছিল আর তার এক রাণী ছিল। এক জহুরী রাজার কাছে মাঝে মাঝে আসত। একদিন ওই জহুরী একদিন রাণীর নজরে পড়ে গেল। জহুরীর চেহারা ছিল ভারী সুন্দর। তার রূপ দেখে রাণী একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। তখন তাঁর চিন্তা হল — কেমন করে জহুরীর সঙ্গে দেখা করা যায়। তখন রাণী তার দাসীকে জহুরীর কাছে পাঠালেন, দাসী জহুরীকে বলল, "রাণীমা হীরে কিনতে চান, তবে তিনি নিজে চোখে না দেখে কিছু কিনবেন না। আপনি কখন যেতে পারবেন বলুন, আমি এসে আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু অন্দরমহলে তো কোন পুরুষ ঢুকতে পারে না, তাই আপনাকে আমার সঙ্গে লুকিয়ে যেতে হবে। জহুরী দিনক্ষণ সব ঠিক করে দিল। তার কথা মতো দাসী এসে একদিন সকলের অগোচরে জহুরীকে অন্দর মহলে রাণীর কাছে নিয়ে এল। দু-চার কথার পরই রাণীর মনের খবর জানতে জহুরীর আর বাকি রইল না। এমন সময় অসময়ে অন্দর মহলে রাজার পায়ের শব্দ শোনা গেল। রাণী দেখলেন সর্বনাশ, জহুরীকে আমি এখন কোথায় লুকিয়ে রাখি? দাসী তখন জহুরীকে বলল "আরে করছ কী? রাজা যে এক্ষুনি তোমাকে খুন করে ফেলবেন। পায়খানার গর্ত দিয়ে শিগগির নেমে পড়ো। কাল সকালে মেথর যখন পায়খানা পরিষ্কার করতে আসবে, তখন কোন রকমে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো। এছাড়া বাঁচবার আর কোন উপায় নেই।"

প্রাণের দায়ে জহুরীকে তখন তাই করতে হল। এদিকে রাজা অসময়ে অন্দর মহলে এসেছিলেন পায়খানায় যাবেন বলে। নিচে গামলার মধ্যে জহুরী বসে রয়েছে, রাজার বিষ্ঠা তার সর্বাঙ্গে পড়তে লাগল। মুখ বুঁজে সহ্য করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় রইল না। সারারাত জহুরীর ওই অবস্থায় কাটল। সকাল বেলা মেথর এল পায়খানা পরিষ্কার করতে। দরজা খুলে জহুরীকে দেখেই সে চীৎকার করতে যাচ্ছে এমন সময় জহুরী তাকে অনুনয় করে বলল, "ভাই, দোহাই তোমার, চেঁচিও না। আমার এই দুরবস্থা থেকে কোন রকমে তুমি আমাকে উদ্ধার করে দাও। আমি তোমাকে

অনেক পুরস্কার দেব।" মেথর তখন একটা ঝুড়িতে জহুরীকে বসিয়ে তাকে একেবারে গঙ্গার ধারে এনে নামিয়ে দিল। জহুরীও গঙ্গায় ভালো করে স্নান করে নিল, তারপর ঘরে ফিরে মেথরকে বকশিস দিয়ে বিদায় করল। এরপর একদিন জহুরী নিজের দোকানে বসে আছে। এমন সময় রাণীর সেই দাসী আবার তার কাছে এসে বলল, "রাণীমা আপনাকে ডেকেছেন, চলুন।" এরপর জহুরীর কি রাণীর কাছে যাওয়া উচিত হবে? রামবাবু আপনি বলুন। তখন রামবাবু বললেন, "না মহারাজ, জহুরীর পক্ষে আবার যাওয়া উচিত হবে না। এত দুর্দশা ভোগের পর আবার তার রাণীর কাছে যাওয়ার প্রবৃত্তি কী করে হবে?"

বাবু, আপনার প্রশ্নের উত্তর হয়েছে তো?

এই উদাহরণের তাৎপর্য হল :—

জহুরী হল জীব, রাজা হল জ্ঞান, রাণী হল অবিদ্যা, দাসী হল মায়া। মায়ার প্রলোভনে ভুলে জীব অবিদ্যার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয় আর তার ফলে মোহে অন্ধ হয়ে সে নানা অশান্তির মধ্যে হাবু ডুবু খেতে থাকে। গল্পের রাজা জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞানের উদয়ে জীবের সেই মোহ দূর হয় আর তখনই সে অবিদ্যার আবর্জনা থেকে মুক্তি পেতে চায়। মুক্তির বাসনা জাগলে সদ্‌গুরুর দর্শন মেলে। গল্পে মেথররূপে সদ্‌গুরু দেখা দিয়েছেন। তিনিই তখন জীবের হাত ধরে তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যান। দেখো ভাই রাখালবাবু, তোমার পুত্র বিজন তো এক দফায় অবিদ্যার সঙ্গ চুকিয়ে ফেলেছে। ও যখন আর অবিদ্যার ফাঁদে পড়তে চাইছে না, তাহলে তুমি জোর করে অবিদ্যার দিকে ঠেলে দিয়ে তাকে ফাঁসাতে চাইছ কেন? তোমার পুত্রকে পরমাত্মাদেব যখন ধুয়ে ধুয়ে সাফ করে দিয়েছেন, তখন আবার তাকে ময়লা মাটি দিয়ে লেপটানো ঠিক নয়। বহু ভাগ্য করে ও নিজের ময়লা দূর করে তা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

প্রাণ গোপালবাবু সেখানে বসেছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরু : ভাই প্রাণগোপাল, লোকে জেনে শুনেও এই বিয়ের ফাঁদে পড়ে, এর কারণ কী?

প্রাণ গোপাল : মহারাজ, আমাদের এ রকম অভ্যাস হয়ে গেছে যে আমরা বন্ধনেই সুখ আছে বলে মেনে নিই। কোন কোন পাখীকে দেখা যায় — খাঁচাতে থাকা তার অভ্যাস হয়ে গেছে। খাঁচা খুলে দিলেও সে উড়ে যায় না, খাঁচার ভিতরেই চলে যায়। ওই পাখীর অভ্যাস মতোই আমাদেরও এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে আমাদের বন্ধন খুলে দিলেও ফের আমরা বন্ধনেই পড়তে চাই।

শ্রীশ্রীগুরু : এ তো বড় আশ্চর্যের কথা। বন্ধনে সুখ আছে বলে মেনে নিচ্ছে। দেখো, কোন মানুষ দুঃখ চায় না, সবাই সুখ চায়। আচ্ছা বলতো — জগতে এমন কোন্ বস্তু আছে যার ওপর কারুর হিংসা আসে না?

প্রাণগোপাল : মহারাজ, যার অন্তঃকরণ —অনেক উঁচু তার কারুর প্রতি হিংসা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ সব বস্তুকেই হিংসার চোখে দেখে। তারা ধন জন, যশ, মান, পুত্র, মিত্র সব বস্তুর ওপর ঈর্ষা করে থাকে।

শ্রীশ্রীগুরু : ভালো, আমাকে তুমি বল যে, সংসারে এমন কোন্ বস্তু আছে যাতে কোন্ লোকের হিংসা হয় না।

প্রাণগোপাল : মহারাজ, আপনি বলুন।

শ্রীশ্রীগুরু : ভাই, দুঃখকে কেউ হিংসা করে না। কারুর মনে এমন হয় না—ওর এত দুঃখ, হে ভগবান আমারও যেন এরকম দুঃখ হয়। এ রকম কারুর মনে হয় কি? কখনও এমন হয় না। হিংসা বড় খারাপ জিনিস। তবে ধর্মকে হিংসা করা ভাল। ধর্ম-হিংসা মানুষকে উন্নতির সোপানে নিয়ে যায়। ওই ব্যক্তি ধর্মাত্মা, কত কত কাজ উনি ধর্মের জন্য করে থাকেন আমিও ওর মতো হব। অথবা বিদ্যাকে হিংসা করাও ভাল। আহা! ওই ব্যক্তি কত লেখাপড়া করেছে। আমি ওনার মতো হতে চাই।

বিজনবাবুকে গুরুমহারাজ আবার বললেন — দেখো ভাই বিজন, তোমাকে জোর করে ফাঁসাতে চাইছে। সাবধানে থাকো। ফেঁসে যেও না।

ত্রয়োবিংশ পর্ব

স্থান : করণীবাদ আশ্রম, ধ্যান কুঠীর রোয়াক : ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ,
আষাঢ় মাস, সময় : সকাল
ব্যবসায়ী শ্রীমান অমরেন্দ্র কুমার বসু (দাশু)
ও
শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ
[কে বড়ো — প্রারব্ধ না পুরুষকার]

অমরেন্দ্র : মহারাজ, পুরুষকার বড়ো না প্রারব্ধ বড়ো?

শ্রীশ্রীগুরু : ভাই, এই প্রশ্নের উপর কত কত সৎসঙ্গ হয়ে গেছে। বহুকাল আগে জজ সাহেব চন্দ্রমাধব ঘোষ একদিন এখানে আমার কাছে এসেছিলেন। উনি আমাকে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন — কে বড়ো? পুরুষকার, না প্রারব্ধ? আমি তাঁকে একটি

গল্প শুনিয়ে দিয়ে তারপর আমি তাকে বললাম — আপনি জজসাহেব, আপনার কাছে একটি মামলা উপস্থাপনা করছি, আপনি এই মামলার এমন ভাবে মীমাংসা করে দিন যাতে এর উপর আর আপীল করা চলবে না।

পাহাড়ের উপর এক অন্ধ আর এক পঙ্গু বাস করত। অন্ধ চোখে দেখে না, পঙ্গু চলতে পারে না। একবার গ্রীষ্মকালে সেই পাহাড়ে দাবানল জ্বলে উঠল, গাছে গাছে আগুন লেগে সেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আগুনের তাপ গায়ে লাগতেই অন্ধ বুঝতে পারল পাহাড়ে আগুন লেগেছে। তখন সে পঙ্গুকে বলল ঃ "আমি তো চোখে দেখতে পাইনে, তবে চলতে পারি। আমি তোমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে থাকি। তোমার চোখ আছে, তুমি আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পথ বলে দিয়ো।" এই ঠিক করে অন্ধের কাঁধে পঙ্গু চড়ে বসল, অন্ধ হাঁটতে লাগল আর পঙ্গু তাকে পথ বলে দিতে লাগল। এইভাবে তারা দাবানলের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বাইরে এসে পৌঁছল।

বাইরে এসে কিন্তু, দুজনের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। অন্ধ পঙ্গুকে বলছে —"তোমাকে আমি কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম, তাই তুমি প্রাণে বেঁচে গেলে, নইলে তোমাকে আজ আগুনে পুড়ে মরতে হত। আর পঙ্গু বলছে —"তোমাকে যদি বলে না দিতাম তাহলে তুমি আগুন থেকে বেরুতে কী করে? আমি পথ বলে দিয়েছি বলেই তো তোমার প্রাণ বাঁচল।" এই নিয়ে দুজনের মধ্যে ঘোর তর্ক বেঁধে গেল। অন্ধ বলল, আমি তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছি, তাই আমি হলাম বড়ো।" পঙ্গুও বলে, না, আমার জন্যেই তুমি প্রাণে বেঁচেছ, আমি তোমার চাইতে বড়ো।"

এখন ওই অন্ধ ও পঙ্গুর মামলাটি আমি জজ সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে বললাম, "আপনি তো বিচারক আপনি চিন্তা করে বিচার করে দিন—অন্ধ বড়ো না পঙ্গু বড়ো।" তখন চন্দ্রমাধববাবু অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে রায় দিলন, "অন্ধই বড়ো।" আমি তাঁকে বললাম — "আপনার বিচার তো ঠিক হল না বাবু। এ মামলার আপীল কোন লোককে যদি বলা যায়, হয় তোমার চোখ নষ্ট হবে, না হয় তোমার পা নষ্ট হবে, তুমি কোন্‌টা চাও। চোখ দেবে না পা দেবে? সে নিশ্চিত বলবে, আমার চোখ থাক, পা নষ্ট হোক। দেখুন বাবু, এতেই বোঝা যায় —চোখই হল সর্ব অঙ্গের সেরা। যার চোখ নেই সে নিকৃষ্ট, ছোটো, চক্ষুষ্মান মানুষই শ্রেষ্ঠ, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলে মানা উচিত।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো দাশু, এখন তুমি নিজেই ভেবে বলো পুরুষকার বড়ো,

না প্রারব্ধ বড়ো। প্রারব্ধ তো অন্ধ পুরুষকারের চোখ আছে,

"প্রারব্ধং কাপুরুষং বদন্তি"

অর্থাৎ প্রারব্ধবাদীরা কাপুরুষ হয়ে যায়। পুরো প্রারব্ধের উপর নির্ভর করে কোন লোক বসে থাকতে পারে না।

পায়ে কাঁটা ফুটেছে, সেই কাঁটা কী করে বের করতে হবে? এ কথা কেউ বলবে না, প্রারব্ধবশতঃ কাঁটা ফুটেছে, প্রারব্ধের দ্বারাই কাঁটা বের হয়ে যাবে। কারুর অসুখ হয়েছে, তাকে ডাক্তার দেখানো হল, ওষুধ খাওয়ানো হল। একথা কেউ বলবে না — প্রারব্ধের জন্য অসুখ হয়েছে, প্রারব্ধ বলেই অসুখ সেরে যাবে।

খিদে পেয়েছে —এ কথা কেউ বলবে না যে খিদে মেটাবার জন্যে কোন চেষ্টা করবো না। প্রারব্ধ বলেই আমার মুখে খাবার এসে যাবে। যদি অন্য কেউ তার মুখে অন্ন তুলে দেয়, তখন তো তাকে চিবোতে হবে, গিলতে হবে। এ রকম চেষ্টা তো তাকে করতে হবে। প্রারব্ধের উপর নির্ভর করে বসে থাকে কে?

পূর্ণ জ্ঞানী বসে থাকে, আর পঙ্গু বসে থাকে যার কিছু করবার সামর্থ নেই। শিশু যখন জন্মায় তখন তার কিছু জ্ঞান থাকে না, কিছু করবার সামর্থ থাকে না। তবুও শিশু একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকে না। সেও নিজের হাত পা চালনা করে থাকে, কখন হেলে কখন দোলে। নিশ্চেষ্ট প্রারব্ধবাদী তো দেখতে পাওয়া যায় না, পূর্ণ জ্ঞানীকেও আহার করতে হয়। যদি নিজে থেকে আহারের চেষ্টা না করে তাহলে অন্য কেউ তার মুখে অন্ন দিয়ে দেয়। তখনও কিন্তু তাকে অন্ন চিবোতে হয়। গিলতেও হয়। স্থূল শরীর যতদিন থাকবে, ততদিন তাকে চেষ্টা করতেই হবে।

যোগবাশিষ্ঠ শাস্ত্রে বশিষ্ঠ ঋষি পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছেন। বশিষ্ঠ ভগবান চেষ্টা ও সংকল্প — এই দুটি শব্দের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। জগৎ সংসার বলে কিছু নেই, সব কিছু মনেরই সংকল্প। মন যখন না থাকে তখন তার কাছে সংসার বলে কিছু নেই। ভগবান বশিষ্ঠদেব পুরুষাকারকে কত বড়ো বলে মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, চেষ্টা দ্বারা মানুষ ভগবান পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

অমরেন্দ্র ঃ মহারাজ, তাহলে প্রারব্ধকে আপনি একেবারে উড়িয়ে দিতে চান?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, তাহলে প্রারব্ধকে আপনি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবে না, তবে প্রারব্ধের জন্যে যা করতে হবে, তা হল — কর্মকে তুমি পুরুষকারের উপর রাখ, আর কর্মের ফলাফলকে প্রারব্ধের উপর ছেড়ে দাও — তবেই শান্তি মিলবে। তা না হলে শান্তি পাওয়ার আর কোন উপায় নেই। কেউ কেউ প্রাণপাত পরিশ্রম

করেও সফল হয় না। তখন বলে, আমি চেষ্টা তো করেছি, এখন আমার অদৃষ্ট।

অমরেন্দ্র ঃ মহারাজ, প্রারব্ধকে যদি উড়িয়ে দেয়া না যায়, তাকে যদি মানতেই হয়, তাহলে পুরুষকারকে বড়ো বলে কেন মানবো? যদি প্রারব্ধকেই বড়ো বলা যায়, তাতে ক্ষতি কী?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, পিতার থেকে পুত্র কী কখন বড়ো হয়? প্রারব্ধের পিতা হল পুরুষকার। কীভাবে? যেমন পুরুষকার থেকেই প্রারব্ধের উৎপত্তি। প্রারব্ধ আলাদা কোন বস্তু নয়। পুরুষকার থেকেই প্রারব্ধের উদ্ভব হয়েছে। এই কারণে পুরুষকার হল পিতা, আর প্রারব্ধ হল তার পুত্র।

এখানে প্রাণগোপালবাবু ছিলেন। তাঁকে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন —

শ্রীশ্রীগুরু ঃ কী ভাই প্রাণগোপাল, পুরুষকারকে বড়ো বলা যায় তো?

প্রাণগোপাল ঃ মহারাজ, দুজনের মধ্যে কে বড়ো, কে ছোট তা বলা মুস্কিল। কখন দেখা যায় প্রারব্ধকে দাবিয়ে দিয়ে পুরুষকার প্রাধান্য লাভ করেছে, আবার কখন দেখা যায়, পুরুষাকারকে দাবিয়ে দিয়ে প্রারব্ধ প্রাধান্য লাভ করেছে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে উভয়েই বড়ো। এ ব্যাপারে প্রচলিত একটা বাক্য আছে —

"কোভি লা পর্ গাড়ী, কোভি গাড়ী পর্ লা।"

এ কথার তাৎপর্য কী? তাৎপর্য হল — যদি জলপথ কোন গাড়ী নিয়ে যাবার প্রয়োজন হয়, তখন গাড়ীকে নৌকোর উপর চড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়। আবার যখন কোন নৌকোকে স্থলপথে নিয়ে যেতে হয়,তখন গাড়ীর উপর নৌকোকে চড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত হল — নিজ নিজ স্থান ভেদে কে ছোট কে বড়ো, তা নির্ধারিত হয়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো দাশু, প্রাণগোপালের কথা আমি মেনে নিলাম।

তবে ভাই, তোমাদের বশিষ্ঠ ভগবান যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে পুরুষকারকেই বড়ো বলে মেনে নিয়েছেন। এতদূর পর্যন্ত তিনি বলেছেন যে, চেষ্টার দ্বারা মানুষের পক্ষে ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক লাভ তো তুচ্ছ কথা, সে স্বয়ং ভগবান হয়ে যেতে পারে। এখন আমার আর কিছু বলার নেই। এখন তো স্নান করার সময় হয়েছে। সৎসঙ্গ এখন বন্ধ থাক।